ইসলামে নানাবিধ অধিকার

ইসলামে নানাবিধ অধিকার
ও সমকালীন প্রসঙ্গ

ইসলামে নানাবিধ অধিকার
ও
সমকালীন প্রসঙ্গ

ড. আবিদুর রহমান তালুকদার
বিএ. (অনার্স), এমএ. (প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয়)
(আরবি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)
এমএ. (ইসলামিক স্টাডিজ, সাদার্ন ইউনিভার্সিটি)
কামিল (প্রথম শ্রেণি), দাওরায়ে হাদিস (মুমতায)
পিএইচডি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বই	**: ইসলামে নানাবিধ অধিকার ও সমকালীন প্রসঙ্গ**
লেখক	: ড. আবিদুর রহমান তালুকদার
প্রকাশকাল	: ১ রামাদান, ১৪৪৬ হি. ১ মার্চ, ২০২৫ খ্রি.
প্রকাশনা	: *সিরাতে মুসতাকিম একাডেমি*, তালুকদার মনযিল, পূর্ব জুলধা, ফকিরনীর হাট, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম
প্রাপিস্থান	আল-মানার লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম আয-যিহান পাবলিকেশন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম আশরাফিয়া লাইব্রেরি, পটিয়া, চট্টগ্রাম
স্বত্ব	: লেখক
মূল্য	: ৬০০ (টাকা) মাত্র

উৎসর্গ

পর্বতসম হৃদয়ের অধিকারী বাবা মরহুম আলহাজ মাওলানা আলী আহমদকে (রহ.), যিনি প্রতিনিয়ত সন্তানদের ঈমানি সমৃদ্ধি ও দীনি উৎকর্ষের স্বপ্ন লালন করতেন। আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন ও শেষরাতে অশ্রু ঝরাতেন।

তাঁর মাগফেরাত ও জান্নাতের আ'লা মাকামের দোয়া করি রাহমানুর রাহিম এর আলিশান দরবারে।



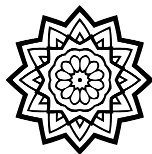
ভূমিকা

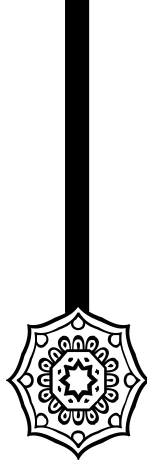
অধিকার শব্দটি সভ্য সমাজের একটি মুখরোচক বুলি ও জনপ্রিয় স্লোগান। মানবাধিকার বা Human Rights পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত সোনালী অধ্যায়। বিগত দুই শতকের চিন্তকমহলকে যে বিষয়টি সর্বাধিক আলোড়িত করেছে তা হলো সৃষ্টির অধিকার বা মানবাধিকার। আধুনিক বিশ্বের মনন-বিশ্বাসে এ ধারণাটির প্রথম রেখাপত্তন করেন ফরাসি দার্শনিক রুশো (Rousseau)। খেলাফত ব্যবস্থা বিলুপ্তির পর পৃথিবীতে ইসলামি মূল্যবোধশূন্য ও ন্যায়বিচারহীন একটি বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হয়। এর মাধ্যমেই উদ্ভব ঘটে বঞ্চিত মানবতার ধারাবাহিক বিড়ম্বনার। শহরের পিচঢালা সড়ক থেকে অজোপাড়া গাঁয়ের মেঠোপথে শুরু হয় অধিকারবঞ্চিত গণমানুষের পদযাত্রা। এমন এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পোড়া ঘায়ে নুনের ছিঁটা দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে জাতিসংঘ নামক একটি অবিচারের আখড়া। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ৩০ দফা দাবিসম্বলিত মানবাধিকার সনদ ঘোষণা করে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক এ বিশ্বসংস্থা। অথচ আজ থেকে চৌদ্দ'শো বছর পূর্বে মানুষের মৌলিক অধিকারের বাস্তব রূপায়ন করেন বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জাতিসংঘের এ মানবাধিকার সনদ পশ্চিমা বিশ্বের এমন একটি ক্ষুরধার হাতিয়ার, যা দ্বারা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হয় ইসলামি শরি'য়া। বক্ষমাণ গ্রন্থে ঐশী বিধানের আলোকে অধিকার সম্পর্কীয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত স্থান পেয়েছে। এটি বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে বিবিধ শিরোনামে প্রকাশিত বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধসমূহের সামষ্টিক রূপ। মানবাধিকার বিষয়ের সহজলভ্য পসরায় এই গ্রন্থের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠ্য কি? এ প্রশ্নের সাদামাটা জবাব হলো, মানবাধিকারের অস্পষ্ট অথচ প্রয়োজনীয় কিছু অপরূপ দিক এখানে উপস্থাপিত হয়েছে ভিন্ন আঙ্গিকে। ভিন্নধর্মী ও অনিন্দ্যসুন্দর কয়েকটি বিষয়ের অবতারণায় গ্রন্থটি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। জাতিসংঘ-ঘোষিত সনদে মানবাধিকার মূখ্য হলেও স্রষ্টার অধিকার চরমভাবে উপেক্ষিত। এ

গ্রন্থে স্রষ্টার অধিকার যুগপৎ মূখ্য ও প্রধান উপজীব্য হিসেবে সাব্যস্ত করে সৃষ্টির অধিকার জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
গবেষণাকর্মে নিয়োজিত ফেলো ও কৌতূহলী পাঠকের জন্য পুস্তকটি রেফারেন্সবুক হিসেবে গণ্য হতে পারে। অনুসন্ধিৎসু সাধারণ পাঠকের জন্য থাকবে নিত্য-নতুন উপাত্ত। বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধসমূহের গ্রন্থরূপ ধারণে অনেকের অবদান কৃতজ্ঞভরে স্বীকৃত। সর্বাগ্রে স্মরণীয় শাইখ হারুনুর রশিদ চৌধুরী, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. মোহাম্মদ মুসা, বন্ধুবর মাওলানা কারি আবদুর রহিম ও এনাম ভাই। বইয়ের সেটিংস, শব্দবিন্যাস ও বানান পর্যবেক্ষণে অবসর সময় ধন্য করেছে আমার জ্যেষ্ঠ ছেলে মুফতি উকাশা বিন আবিদ। প্রুফ সংশোধন ও ভাষাগত উৎকর্ষ সাধনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আমার জ্যেষ্ঠ কণ্যা আলেমা মারয়াম বিনতে আবিদ ও মেঝো ছেলে হুজাইফা বিন আবিদ। বানানগত বিভ্রাট, বুননগত অসঙ্গতি ও তথ্য-উপাত্তের বিচ্যুতির জন্য প্রজ্ঞাবান পাঠকের সুদৃষ্টি কামনা করি। সকলের অবদান আল্লাহর দরবারে গৃহীত হোক এবং বইটি পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করুক। আল্লাহর নিকট এই দু'আ করি।

আবিদুর রহমান তালুকদার
০১৮৮১ ৭১৪৯৮৩
০১৬২২ ৩৬৮১৩১
৩০ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি.
abidtalukdar89@gmail.com

সূচিপত্র





সৃষ্টির অধিকার, স্রষ্টার অধিকার ও মানবাধিকার

মহাবিশ্বের বস্তুনিচয়ের একচ্ছত্র অধিকার ও নিরঙ্কুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। বিশ্বজগতের কোনো বস্তুতে মাখলুকের বিন্দুমাত্র মালিকানাও নেই। কোনো বস্তুতে কারো চাহিদা ফুরিয়ে গেলে তার ধ্বংসসাধন ইসলামে অবৈধ। অপচয় করারও কোনো সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান হলো, তা অন্যের কল্যাণে ছেড়ে দেয়া। এ দৃষ্টিকোণে সর্বময় অধিকারের একমাত্র মালিক আল্লাহ। আল্লাহপ্রদত্ত অধিকারকেই আমরা মানবাধিকার বলতে পারি। সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তায় বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর অধিকারই প্রাধান্যযোগ্য ও অগ্রগণ্য। সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসীদের বিবেচনা ও বোধ-চিন্তায় আল্লাহর অধিকার বলতে কিছু নেই। তাদের দৃষ্টিতে মানবাধিকারই আসল কথা। যার ফলে মানব-রচিত আইনে স্রষ্টার অধিকারের বালাই নেই। তাদের যুক্তিতে শরি'য়া আইন মানবাধিকারের পরিপন্থি, বর্বর ও অবিচারপূর্ণ। স্রষ্টার অধিকার ও তার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"হে মানবমণ্ডলি! তোমাদের সে রব এর ইবাদত করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানাস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। আর আসমানকে করেছেন ছাদসদৃশ। তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণপূর্বক তোমাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ফল-মূল উৎপন্ন করেছেন। অতএব তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করো না।[১]

স্রষ্টার অধিকার প্রসঙ্গে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সহিহ বুখারি ও মুসলিম শরিফে মু'আজ ইব্‌ন জাবাল (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

عَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذ؛ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟». قلتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قالَ: «فإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ: أَنْ لا يُعَذبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا». فقلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَفلا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: «لا تُبَشِّرْهُمْ فيَتَّكِلوا».

মু'আজ বিন জাবাল (রাদি.) বলেন, আমি 'উফাইর' নামক গাধায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেছনে আরোহী ছিলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রশ্ন করেন, হে মু'আজ! তুমি কি জানো বান্দার উপর আল্লাহর কি হক? এবং আল্লাহর উপর বান্দার কি হক? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই এ বিষয়ে ভালো জানেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো, বান্দা তার ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো, যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে না, তাকে শাস্তি না দেয়া। আমি বললাম, এ সুসংবাদটি কি আমি সবার নিকট প্রচার করবো না? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাদের নিকট

[১] আল কুরআন, ২;২১-২২।

এ সংবাদ প্রচার করো না। কেননা এতেই তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়বে"।[১]

স্রষ্টার অধিকার ও আল্লাহর ইবাদতের প্রকৃতি ঠিক তেমন, যেমনটি ইবরাহিম (আ.) বলেছেন। 'আমার নামায, কুরবানি, জীবন ও মরণ বিশ্বজগতের একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। যার কোনো শরিক নেই। এ বিষয়েই আমি আজ্ঞাবহ'।[২]

চিরাচরিত নিয়মে গুটিকয়েক ও অনুষ্ঠানসর্বস্ব কয়েকটি ইবাদত পালনের নাম আল্লাহর ইবাদত নয়। শুধুমাত্র নামায, রোযা, হজ ও যাকাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর হক আদায় হয় না। এতে স্রষ্টার সামগ্রিক অধিকার সংরক্ষিত হয় না। দৈনন্দিন জীবনের সর্বাবস্থায় সৃষ্টিকর্তার বিধান মেনে চলার মাধ্যমেই আল্লাহর হক আদায় হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾

"নামায শেষে দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিকর করো। স্বস্তি অনুভব করার পর আবার নামায কায়েম করো। নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা মুমিনদের উপর ফরজ"।[৩]

স্রষ্টার অধিকার ও বান্দার অধিকার

স্রষ্টা হিসেবে বান্দার প্রতি আল্লাহ অতিশয় দয়ালু। মূলত সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহর একান্নবর্তী পরিবার। পরিবারভুক্ত সকল সদস্যদের লাভালাভ সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন। একাধারে সৃষ্টিকর্তা ও অভিভাবক হিসেবে পরিবারভুক্ত কোনো সদস্যের উপর কারো অন্যায় হস্তক্ষেপ আল্লাহ বরদাশত করেন না। এ বিবেচনায় মানবাধিকার সুরক্ষার দায়িত্ব সরাসরি আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। আল্লাহর ছায়াস্বরূপ খলিফাতুল মুসলিমিন এ দায়িত্ব পালনে প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করেন। কোনো ফাসেক-পাপাচারী তার প্রতিনিধিত্বের উপযোগী নয়। জালিম সম্প্রদায় আল্লাহর রহমতের উপযুক্ত হতে পারে না। স্রষ্টার অধিকারে অবহেলা করে যারা

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫/২০০৪), খ. ৪, পৃ. ২৯, হাদিস নং- ২৮৫৬।

[২] আল কুরআন, ৬:১৬২, ১৬৩।

[৩] আল কুরআন, ৪:১০৩।

মানবাধিকারের বুলি আওড়ায় মূলত তারা সাধারণ মানুষের সাথে ধোঁকাবাজিই করে ।

বান্দার সকল প্রকার কর্মযজ্ঞের একমাত্র নিয়ন্ত্রণকর্তা ও তত্ত্বাবধায়ক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তিনি মানবাধিকারেরও রক্ষাকর্তা। বান্দা ততটুকু অধিকার ভোগ করতে পারে, যতটুকু আল্লাহ তাকে দান করেন। মানুষের অধিকারে কারো অবৈধ হস্তক্ষেপ স্রষ্টার অধিকারে হস্তক্ষেপের শামিল। এ প্রসঙ্গে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّوَاوِينُ ثَلَاثَةٌ فَدِيوَانٌ لَا يَغْفِرُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا، وَدِيوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِ شَيْئًا، وَدِيوَانٌ لَا يَتْرُكُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا، فَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا فَالْإِشْرَاكُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨] وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِ شَيْئًا قَطُّ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا فَمَظَالِمُ الْعِبَادِ بَيْنَهُمُ الْقِصَاصُ لَا مَحَالَةَ،

"আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নিকট বান্দার আমলনামা তিন প্রকার। এক. বান্দার এ ধরনের কোনো কাজ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। দুই. এ প্রকারের আমলে আল্লাহ কোনো গুরুত্ব প্রদান করবেন না। তিন. এ প্রকারের কোনো কাজে আল্লাহ কোনো ছাড় দেবেন না। বান্দার যে কাজ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তা হলো, আল্লাহর সাথে শির্ক করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

বান্দার যে প্রকারের আমলে আল্লাহ কোনো গুরুত্ব প্রদান করবেন না তা হলো, আল্লাহর হক আদায়ের ক্ষেত্রে বান্দার অপারগতা। যে প্রকারের কাজে আল্লাহ কোনো ছাড় দেবেন না তা হলো, বান্দার পারস্পরিক জুলুম। এ বিষয়ে আল্লাহ বদলা নিয়ে ছাড়বেন"।[১]

---

[১] নিসাপুরি, হাকিম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ, আল মুসতাদরাক আলা আস সহিহাইন, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১১ হি.), খ. ৪, পৃ. ৬১৯, হাদিস নং- ৮৭১৭।

শরি'য়া আইন স্রষ্টার অধিকার ও মানবাধিকারের যুগপৎ সম্মিলন

ঐশী আইনে স্রষ্টার অধিকার ও বান্দার অধিকারের দুইটি দিক বিদ্যমান। কিছু আইনে আল্লাহর অধিকার প্রবল। কিছু আইনে মানবাধিকার প্রবল। যেসব শরি'য়া আইনে আল্লাহর অধিকার প্রবল সেখানে আইন বাস্তবায়নে কারো সুপারিশ বা হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। যেসব বিষয়ে মানবাধিকারের দিকটি প্রবল সেখানে মানুষের সুপারিশের সুযোগ রয়েছে। ইসলামি দণ্ডবিধি তিন প্রকার।

এক. হুদুদ (حدود): চুরি, ডাকাতি, ব্যাভিচার, সতি-সাধ্বী মুসলিম নারীর উপর ব্যাভিচারের অপবাদ ও মদ্যপানের শাস্তি। এ সকল ক্ষেত্রে শরি'য়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির বিধানকে 'হুদুদ' বলে। উপর্যুক্ত অপরাধসমূহ সংঘঠনের ক্ষেত্রে মানবাধিকারের চেয়ে আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপ হয় অধিক। যার ফলে এ অপরাধের শাস্তিও অতন্ত কঠোর ও নির্মম। এ অপরাধ ক্ষমা করার অধিকার কারো নেই। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা করার বিধান শরি'য়া আইনের সরাসরি লঙ্ঘন। ইসলামি দণ্ডবিধিতে মানবাধিকারের প্রতি লক্ষ রেখে মৃত্যুদণ্ডের বিকল্প হিসেবে রক্তমূল্য (دية) আদায়পূর্বক নিহত ব্যক্তির অধিকার সমুন্নত রাখা হয়েছে। চৌর্যবৃত্তির শাস্তির বিধানে বর্ণিত আছে, চোরাইকৃত মাল চুরি হবার পূর্বক্ষণে বান্দার অধিকার থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে চলে যায়। [১] এ ক্ষেত্রে চোর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আয়ত্বাধীন বস্তুই চুরি করে। চৌর্যবৃত্তির ক্ষেত্রে মানবাধিকারের চেয়ে স্রষ্টার অধিকার প্রবল বিধায় এ ধরনের অপরাধীকে ক্ষমা করার একচ্ছত্র অধিকার একমাত্র আল্লাহর। এখানে কারো সুপারিশ বা হস্তক্ষেপ চলতে পারে না। বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা করার বিধান চ্যালেঞ্জ করে আদালতে একটি রিট আবেদন দাখিল করা হয়েছে। এটি শরিয়া আইনের পক্ষে একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে ধন্যবাদার্হ। কুরাইশ এর মাখযুম গোত্রের জনৈক নারীর চুরির ঘটনা প্রমাণ করে আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপের পরিণাম কতো ভয়াবহ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي

---

[১] মোল্লা জিয়ুন, শাইখ আহমদ ইব্ন আবি সাঈদ, *আল তাফসিরাতুল আহমদিয়্যাহ*, (ভারত:মাকতাবাহ আল শিরকাহ, ১৯০৪ খ্রি.), পৃ. ২৩৫।

سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقالوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا،

"আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের জনৈক মহিলার চৌর্যবৃত্তির ঘটনা কুরাইশ অধিপতিদের বিচলিত করে তুলল। তারা বলতে লাগলো, এ বিষয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কে সুপারিশ করতে পারে? অনেকে বললো, এ দুঃসাহস একমাত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয়পাত্র (حب الرسول) উসামা বিন যাইদ'ই করতে পারে। উসামা (রাদি.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ বিষয়ে কথা বললেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে আমার নিকট সুপারিশ করতে পারো না। তিনি খুতবা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন, বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের এটিই প্রধান কারণ ছিলো যে, তাদের সমাজের সম্ভ্রান্ত কোনো লোক চুরি করলে তার উপর আইন প্রয়োগ করতো না। আর দুর্বল শ্রেণির ব্যক্তি হলে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করেতো। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ এর মেয়ে ফাতিমা চুরি করলেও আমি তার হাত কেটে দেবো"।[১]

দুই. ক্বিসাস: (قصاص) ক্বিসাস হলো অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তি বা হত্যার বদলে হত্যা। কোনো ব্যক্তির দৈহিক ক্ষতিসাধনের পরিবর্তে অপরাধীর নিকট থেকে সমপরিমাণ বদলা নেয়াকে শরি'য়তের পরিভাষায় 'ক্বিসাস' বলে। ইসলামের শাস্তি-বিধি 'ক্বিসাস' আল কুরআনে বর্ণিত একটি অকাট্য বিধান। হুদুদ ও ক্বিসাস এর মধ্যে পার্থক্য হলো, হুদুদ আল্লাহর অধিকার ও জানস্বার্থ বিবেচনায় কার্যকর করা হয়। এখানে মানবাধিকারের চেয়ে স্রষ্টার অধিকার প্রবল। কোনো মাখলুকের হস্তক্ষেপে 'হদ' অকার্যকর করার কোনো সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে 'ক্বিসাস' এর

---

[১] বুখারি: আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫/২০০৪), খ. ৪ পৃ. ১৭৫, হাদিস নং- ৩৪৭৫।

ক্ষেত্রে বান্দার অধিকার প্রবল। এটি আহত কিংবা নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের ইখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ইচ্ছা করলে অপরাধীর নিকট থেকে বদলা নিতে পারে। অথবা ক্ষমাও করে দিতে পারে। শরি'য়া আইনের এ পদ্ধতি কিছুটা কোমল ও সদয়।

মানবাধিকার ও স্রষ্টার অধিকারসম্বলিত ইসলামি দণ্ডবিধি অকাট্য ও অলঙ্ঘনীয় শাস্তির বিধান। যার উপর ঈমান আনা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরজে আইন। এটি সামাজিক নিরাপত্তা, বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা ও ইনসাফপূর্ণ বিচারব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যা মৌলিক মানবাধিকারের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। ইসলামের মৌলিক রুকনসমূহ ফরজ হবার ক্ষেত্রে আল কুরআনের বর্ণনাশৈলী বিভিন্ন আঙ্গিকের। সিয়াম, (রোযা) ক্বিসাস (দণ্ডবিধি) ও ক্বিতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) ইসলামি শরি'য়তের তিনটি অকাট্য বিধান। এ বিধানসমূহের ফরজ হওয়া সংক্রান্ত বর্ণনাশৈলী এক ও অভিন্ন। সিয়াম, (রোযা) ক্বিসাস (দণ্ডবিধি) ও ক্বিতাল ফরজ হওয়া সংক্রান্ত আয়াত তিনিটি আলোচনা করা হলো,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"হে ইমানদারগণ! তোমাদের উপর 'সিয়াম' ফরজ করা হয়েছে। যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর ফরজ করা হয়েছিলো। যাতে সংযম অবলম্বন করতে পারো"।[১]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"হে ইমানদারগণ! তোমাদের উপর নিহত ব্যক্তির হত্যার বদলাস্বরূপ 'কিসাস' ফরজ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন, কৃতদাসের পরিবর্তে কৃতদাস, নারীর পরিবর্তে নারী। নিহত ব্যক্তির পক্ষে হত্যাকারীকে মার্জনা করা হলে উত্তম পন্থার অনুসরণ করবে। হত্যাকারীও 'দিয়াত' আদায়ের ক্ষেত্রে সদাচরণ করবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে একটি সহজ পন্থা ও

[১] আল কুরআন, ২:১৮৩।

অনুগ্রহ। এতদসত্ত্বেও যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি”।[১]

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

“তোমাদের উপর ‘কিতাল’ ফরজ করা হয়েছে। এটি তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়। তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় অনেক কাজ প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তোমাদের নিকট অনেক পছন্দনীয় কাজ প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ যা জানেন তোমরা তা জানো না”।[২]

‘কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম’, (كتب عليكم الصيام) ‘কুতিবা আলাইকুমুল কিতাল’ (كتب عليكم القتال) ও ‘কুতিবা আলাইকুমুল কিসাস’ (كتب عليكم القصاص) অভিন্ন বর্ণনাভঙ্গি ধারা উপর্যুক্ত তিনটি বিধান ফরজ করা হয়েছে। রোযা (صيام) ফরজ হওয়ার বিধান অস্বীকার করলে যেভাবে ঈমানদার হতে পারে না। ইসলামি দণ্ডবিধি ‘ক্বিসাস’ ও সশস্ত্র যুদ্ধ ‘ক্বিতাল’কে বর্বর আইন বললেও ঈমান এর গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।

তিন. তা’যিরাত: আল্লাহ ও বান্দার অধিকার সংশ্লিষ্ট যে সব অপরাধের শাস্তি শরি‘য়ত কর্তৃক নির্ধারিত নয়, এ ধরনের শাস্তিকে তা’যিরাত বলে। স্থান, কাল, পাত্র ও অবস্থাভেদে এবং জনকল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে শাস্তি নির্ধারিত হয়। এ প্রকারের শাস্তি বিচারকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়। যা লঘু থেকে লঘুতর ও কঠোর থেকে কঠোরতর হতে পারে। অনেক সময় এ অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হতে পারে।

স্রষ্টার অধিকার ও মানবাধিকার বাস্তবায়নের অনুপম আদর্শ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন স্রষ্টার অধিকার ও মানবাধিকার বাস্তবায়নের অনুপম আদর্শ। তিনিই ছিলেন উভয় দিক সংরক্ষণের বাস্তব অথরিটি। দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনি উভয় দিক সংরক্ষণের প্রতি লক্ষ রাখতেন। এখানে কোনো প্রকার শিথিলতা প্রদর্শনের সুযোগ নেই। মা‘য়িয বিন

[১] আল কুরআন, ২;১৭৮

[২] আল কুরআন, ২;২১৬।

মালিক (রাদি.) ও গামিদ গোত্রের জনৈক মহিলার (রাদি.) ব্যাভিচারের স্বীকারোক্তি দেয়ার পর তাদের উপর দণ্ড প্রয়োগ না করার কৌশল উদ্ভাবন মানবাধিকার বাস্তবায়নের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বারবার স্বীকারোক্তি দ্বারা অপরাধ প্রমাণিত হবার পর দণ্ডের প্রয়োগ স্রষ্টার অধিকার বাস্তবায়নের অমোঘ প্রতিচ্ছবি। এ সংক্রান্ত সহিহ মুসলিম শরিফ এর বর্ণনাটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো,

جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: "وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: "فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟ " فَقَالَ: مِنَ الزِّنَى، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبِهِ جُنُونٌ؟ " فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: "أَشَرِبَ خَمْرًا؟ " فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَزَنَيْتَ؟ " فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ، قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ، قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ"، قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: "وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ" فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: "وَمَا ذَاكِ؟ " قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَ: "آنْتِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا: "حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ"، قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ

مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ"، فَقَالَ: "إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ"، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: فَرَجَمَهَا

“মা'য়িয বিন মালিক (রাদি.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি ফিরে যাও এবং আল্লাহর নিকট তাওবা ইসতেগফার করো। তিনি একটু দূরে গিয়ে আবার ফিরে আসলেন, বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট তাওবা করার নির্দেশনাটি পুনর্ব্যক্ত করেন, মা'য়িয (রাদি.) চতুর্থবারও একই স্বীকারোক্তি করেন। এবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমাকে কোন জিনিস থেকে পবিত্র করবো? তিনি জবাব দিলেন, ব্যাভিচারের পাপ থেকে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, তার মধ্যে কি কোনো উম্মাদনা আছে? তারা জবাব দিলেন, না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, সে কি মদ পান করেছে? একজন সাহাবি তাকে শুঁকে দেখলেন। কিন্তু তার মধ্যে মদের কোনো ঘ্রাণ পেলেন না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি 'যেনা' করেছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতপর তাকে প্রস্তরাঘাত করার নির্দেশ দেয়া হয় এবং তা বাস্তবায়িত হয়। মা'য়িয (রাদি.) এর ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দু'টি মতামত পাওয়া যায়। এক দল বলেন, লোকটি ধ্বংস হয়ে গেলো। অপরাধই তার ধ্বংসের প্রধান কারণ। আর একদল বলেন, মা'য়িয (রাদি.) এর চেয়ে উত্তম তাওবা কেউ করেনি। লোকটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আত্মসমর্পন করে বললো, আমার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, এ ঘটনার দুই কি তিন দিন অতিবাহিত হলো, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের এক সমাবেশে আগমন করলেন। তিনি সালাম দিয়ে বসে পড়লেন এবং বললেন, তোমরা মা'য়িয এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ মা'য়িযকে ক্ষমা করুক। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি এমন তাওবা করেছেন, যা সমস্ত উম্মাতের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হলে সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।

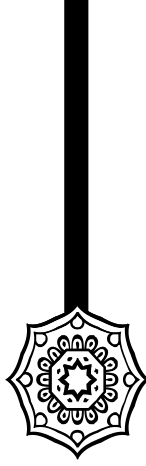
বর্ণনাকারী আরো বলেন, 'আযদ' এর শাখাগোত্র গামিদ বংশের একজন মহিলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ!

আমাকে পবিত্র করুন! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি ফিরে যাও এবং আল্লাহর নিকট তাওবা ইসতেগফার করো। মহিলাটি বললো, আপনি কি আমাকে মা'য়িয এর মতো ফিরিয়ে দিতে চান? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, তার কী হলো? মহিলাটি বললো যে, সে ব্যাভিচারের কারণে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে, তিনি বললেন, তুমি কি সত্যিই গর্ভবতী ? মহিলাটি বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সন্তান প্রসবের পরে এসো। বর্ণনাকারী বলেন, জনৈক আনসারী সাহাবি সন্তান প্রসব পর্যন্ত মহিলাটির তত্ত্বাবধান করলো। সন্তান প্রসবের পর মহিলাটি এসে তার অবস্থা জানালো, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একটি ছোট্ট শিশুকে দুধ পান থেকে বঞ্চিত রেখে তার মাকে প্রস্তরাঘাত করা যাবে না। আনসার এর একজন লোক শিশুটিকে দুধ পান করার দায়িত্ব নেয়ার পর মহিলাটিকে প্রস্তরাঘাত করা হয়"।[১]

উপর্যুক্ত হাদিসে বর্ণিত দু'টি ঘটনায় অপরাধের স্বীকারোক্তি প্রদানকারী দু'জন নারী-পুরুষের মানবাধিকার রক্ষার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেন মানবাধিকারের প্রবক্তা বিশ্বনবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। স্রষ্টার অধিকার বিসর্জন দিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর কোনো চেষ্টা-তদবির অপরাধীরাও করেনি। স্রষ্টার অধিকারে বিশ্বাসী দু'জন সাহাবি তারই অকাট্য বিধান পালনে নিজেদের সমর্পন করেন আইনের হাতে। তারা স্রষ্টার অধিকার রক্ষার্থে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে নিজেদের ধন্য করেন।



[১] মুসলিম, আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ. ৩, পৃ. ১৩২১, হাদিস নং ১৬৯৫।



স্বাধীনতা মানবজাতির আজন্ম অধিকার

স্বাধীনতা মানব জীবনে খোদাপ্রদত্ত একটি অযাচিত নেয়ামত। নির্দিষ্ট আয়তনের একটি মানচিত্র, সুগঠিত সামরিকশক্তি ও সার্বভৌমত্ব নির্দেশক পতাকা স্রষ্টার বিধি-নিষেধ পালনে একজন মুসলিমের জন্য সহায়ক শক্তি। মানবসৃষ্টির ধারাবাহিকতায় মুসলিম জাতি ঐতিহ্যগতভাবে একটি সম্ভ্রান্ত ও স্বাধীন জাতি। তবে পৃথিবীর অনেক শোষকগোষ্ঠী স্বাধীনচেতা এ জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে অবিরাম চেষ্টা চালায়। যুগে যুগে মুসলিম জাতি বজ্র-বিদ্রোহে লড়ে নিজেদের স্বাধীনতা ও স্বাধিকার ছিনিয়ে আনে। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকারবঞ্চিত মুসলিম জাতি মক্কার পৌত্তলিক শ্রেণির নিষ্পেষণে অতিষ্ঠ হয়ে মদিনায় হিজরত করে। তথায় নৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে বলিয়ান হয়ে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করে বিজয়ীবেশে। পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্রে নবগঠিত মুসলিম শক্তির আচানক উত্থান গোটা পৃথিবীকে স্বাধীনতার নবচেতনায় উজ্জীবিত করে। উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করে দলিত-মথিত ও অধিকারহারা প্রতিটি বনি আদমকে। তৎকালীন বিশ্বে জাহেলিয়্যাতপ্রভাবিত আরব সম্প্রদায় ও রোম-পারস্য নামক নিয়ন্ত্রকশক্তির ক্ষমতাচর্চা ছিল নিরঙ্কুশ। সমকালীন বিশ্বে অধিকারবঞ্চিত শোষিত

মানবতার আর্তনাদ সপ্তাকাশ ভেদ করে পৌঁছে যেত আল্লাহর আরশ অবধি।

স্বাধীনতা মানুষের সহজাত অধিকার

স্বাধীনতা ও একত্ববাদ মানব জীবনের একান্ত ঘনিষ্ট ও সহজাত অধ্যায়। দাসত্ব ও পরাধীনতা হলো মানবসৃষ্ট গোলামির জিঞ্জির। স্বভাবগত যাবতীয় বৈশিষ্ট্য, কল্যাণ ও অধিকার দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন মানবসত্ত্বা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾

"তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখো। এটিই আল্লাহর প্রকৃতির অমোঘ বিধান। যার উপর তিনি মানবজাতিকে সৃজন করেছেন"।[১]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ،

"প্রতিটি শিশু সহজাত নীতি-আদর্শ ও স্বভাব-চরিত্র নিয়ে জন্মলাভ করে। অথচ পিতা-মাতা তার সন্তানকে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরূপে গড়ে তোলে"।[২]

ইহকালীন ও পরকালীন সার্বিক কল্যাণই হলো মানব জীবনের প্রধান পাওনা। নবি-রসূলদের সমকালীন মানুষের প্রতি এ পয়গাম দিয়ে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। তাদের প্রধান মিশন ছিল মানুষকে কল্যাণের প্রতি অহ্বান করা।

"হে লোকসকল! তোমরা একথায় বিশ্বাস স্থাপন করো যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তবেই তোমরা কামিয়াব হবে"।

ইসলামে স্বাধীনতার ধারণা

কুরাইশ নেতাদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ সংখ্যালঘু মুসলিমগণ হিজরত করে আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলিমবান্ধব বাদশাহ নাজাশি কুরাইশ ও মুসলিমদের পাস্পরিক অবস্থান জানতে চাইলে জা'ফর বিন আবি তালিব (রাদি.)

---

[১] আল কুরআন, ৩০;৩০।

[২] আবু দাউদ, সুলায়মান বিন আশ'আস আল সাজিসতানি, *সুনানু আবি দাউদ*, (বৈরুতঃ মাকতাবাহ আল আসরিয়্যাহ, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, তা/বি.), খ. ১২, পৃ. ৩২৩, হাদিস নং-৪০৯১।

উভয় জাতির আদর্শগত অবস্থা বর্ণনা করেন এবং ইসলামে স্বাধীনতার ধারণা ও পরাধীনতার মানবীয় দর্শনের তুলনামূলক পার্থক্য তুলে ধরে বলেন,

أَيُّهَا الْمَلِكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ، وَصِدْقَهُ، وَأَمَانَتَهُ، وَعَفَافَهُ، " فَدَعَانَا إِلَى اللهِ لِنُوَحِّدَهُ، وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ

"মহামান্য বাদশাহ! আমরা ছিলাম জাহিলি সম্প্রদায়ভুক্ত। আমাদের আদর্শ ছিল মূর্তিপুজা করা, মৃত জন্তু ভক্ষণ করা, অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকা, নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, প্রতিবেশীর অধিকার হরণ করা ও সবলরা দুর্বলদের অত্যাচার করা। এ সকল নীতি ছিল প্রকৃত দাসত্ব ও পরাধীনতার পরিচায়ক। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের নিকট প্রেরণ করেন একজন রসূল। যার বংশপরিচয়, সততা ও ন্যয়নিষ্ঠতা ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর ইবাদত ও একত্ববাদের দাওয়াত দেন এবং পূর্বপুরুষদের অনুকরণে আমরা যে সকল মূর্তি ও পাথর পূজা করতাম, তা বর্জন করার আহ্বান জানান। তিনি সত্যবাদিতা, গচ্ছিত সম্পদ প্রাপকের নিকট ফেরৎ দেওয়া, আত্মীয়তার সুরক্ষা, প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ, অন্যায় ও গর্হিত কাজ পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেন। তিনি আমাদেরকে অশ্লীলতা, মিথ্যাচার, এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ ও সতি-সাধ্বী নারীদের অপবাদ প্রদান থেকে বারণ করেন। তিনি আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পনপূর্বক তার ইবাদতে কাউকে শরিক না করার নির্দেশ দেন। তিনি আরো নির্দেশ দেন, যেন আমরা সালাত, যাকাত ও সিয়াম আদায় করি"।[১]

---

[১] মুবারকপুরী, সফিউর রহমান, *আল রাহিকুল মাখতুম*, (বৈরুতঃ দারুল হেলাল, প্রথম সংস্করণ, তা/বি.), খ. ১, পৃ, ৮৪।

এককালে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত সম্প্রদায় ছিল বনি ইসরাইল। যুগের বিবর্তনে এ জাতি পরিণত হয় স্বৈরাচারী ফেরআউনের কিবতি সম্প্রদায়ের ক্রীতদাসে। মূসা (আ.) এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের দাসত্বমুক্তির ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করেন। কিন্তু অবিমৃষ্যকারী ও অবিবেচক এ জাতি আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে হঠকারী আচরণ দ্বারা মূসাকে (আ.) অতিষ্ঠ করে তোলে। স্বাধীনতার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতার আদায়ের পরিবর্তে কৃতঘ্নতার আশ্রয় নেয়। ফেরআউন ও কিবতি সম্প্রদায়ের পতনের পর স্বাধীন দেশের নির্মল বায়ূতে মূর্তিপুজারীদের বহুত্ববাদী কর্মকান্ডে পূর্বের নিরাকার একত্ববাদের শিক্ষা তারা ভুলে যায়। তারা মূসা (আ.) এর নিকট আবদার করে বলে,

﴿يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾

"হে মূসা! আমাদের জন্য পৌত্তলিকদের ন্যায় আকার-অবয়ববিশিষ্ট একটি 'ইলাহ' এর রূপ তৈরি করে দিন। উত্তরে মূসা (আ.) বলেন, বাস্তবেই তোমরা একটি মূর্খ জাতি"।[১]

তারা দীর্ঘদিনের লালিত একত্ববাদের শিক্ষা ও নিরাকারের দর্শন স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষনিকের সুখে মুহূর্তেই ভুলে যায়। অকৃতজ্ঞ এ জাতি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত ত্রাণকর্তা মূসাকে (আ.) উত্যক্ত করে বলে,

﴿أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾

"হে মূসা! তোমার আগমনের পূর্বে ফেরআউনের অত্যাচারে যেভাবে আমরা নানাভাবে নিপীড়নের শিকার ছিলাম, তোমার আগমনের পরও খোদায়ি বিধি-নিষেধের কঠোরতার কারণে আমরা কষ্ট ভোগ করছি"।[২]

আল্লাহর না-শুকরির কারণে সম্ভ্রান্ত ইহুদি সম্প্রদায় একটি ঐতিহ্যবিলুপ্ত জাতিতে পরিণত হয়। বিশ্বায়নের আধুনিক যুগে তারা পরিণত হয় স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকারবঞ্চিত একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে। তাদের উপর দুই জন জলিলুল কদর নবি ঈসা (আ.) ও দাউদ (আ.) এর ভাষায় অবতীর্ণ হয় পরমুখাপেক্ষিতা ও লাঞ্চনার চিরস্থায়ী অভিশম্পাত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

---

[১] আল কুরআন, ৭:১৩৮।
[২] আল কুরআন, ৭:১২৯।

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾

"দাউদ (আ.) ও ঈসা ইব্ন মারয়ম (আ.) এর ভাষায় বনি ইসরাইলের কাফেরদের উপর অভিশম্পাত নাযিল হয়। এটা এ কারনে যে, তারা আল্লাহর অবাধ্য ছিল এবং সীমালংঘন করতো"।[১]

নেয়ামতের শোকরগুজারিতে খোদাপ্রদত্ত নেয়ামত আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। না-শুকরির ফলাফল যে কত ভয়াবহ পৃথিবীতে তার জ্বলন্ত নযির ইহুদি জাতি। মুসলিম জাতি মক্কা বিজয়ের পর স্বাধীনতার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরুপ তার কালিমাকে বুলন্দ করার মিশন নিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তরে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকার করে। নিজেদের জান-মাল ও পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধি বিসর্জন দেয়। কষ্টার্জিত স্বাধীন ভূখণ্ড ও তীর্থভূমি মক্কা-মদিনা ত্যাগ করে অভিবাসী জীবনকে স্বাগত জানায়। বিশ্ব মানবতাকে মনুষ্যত্বের গোলামি থেকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে মুক্ত বিহঙ্গের মত ঘুরে বেড়ায় সমগ্র পৃথিবী। আবাদি-অনাবাদি, মরু-শ্যামল, উঁচু-নিচু, অধিত্যকা-উপত্যকা সর্বত্র আল্লাহর দীনের বিজয়ঝান্ডা উড্ডীন করে অর্ধ পৃথিবীকে মানবশৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে। বিদায় হজ্বের প্রাক্কালে সোয়া লক্ষ সাহাবির সেই দামালশ্রেণির মাত্র দশ হাজারের কবরের সন্ধান পাওয়া যায় আরব ভূখণ্ডে। বাকি লক্ষাধিক সাহাবি পুরো পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। দিগ্বিজয়ী এ জাতির প্রতীক উকবা ইব্ন নাফি' আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ বিজয়ের পর এক পর্যায়ে পৌঁছে যান আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে। মহাসাগরের লোনা পানিতে নিজের ঘোড়ার সম্মুখ পদযুগল স্নাত করে বলে,

﴿يَا رَبِّ لَوْلَا هٰذَا البَحْرُ لَمَضَيْتُ فِي الْبِلَادِ مُجَاهِداً فِيْ سَبِيْلِكَ. اَللّٰهُمَّ أَشْهَدُ أَنِّيْ قَدْ بَلَغْتُ الْمَجْهُوْدَ. وَلَوْلَا هٰذَا الْبَحْرُ لَمَضَيْتُ فِي الْبِلَادِ أُقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِكَ حَتّٰى لَا يَعْبُدُ أَحَدٌ دُوْنَكَ﴾

"প্রভু হে! যদি এ মহাসাগর প্রতিবন্ধক না হতো, তবে তোমার রাস্তায় জিহাদ অব্যাহত রাখতাম। হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকো। আমি প্রাণপণ চেষ্টা

---

[১] আল কুরআন, ৫;৭৮।

করেছি। যদি জানতাম এ মহাসাগরের ওপারে তোমার সৃজিত কোন ভূখণ্ড আছে, তোমার সৃষ্ট কোন জনগোষ্ঠী কিংবা জনবসতি আছে, তবে এ মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সেথায় তোমার হুকুমের বিরুদ্ধচারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যেতাম। যাতে একমাত্র তোমারই একত্ববাদ কায়েম হয়"।[১]

স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় কর্মসূচি

স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে মুসলিম জাতি কোন ভূখণ্ডের কর্তৃত্ব লাভ করার পর তাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো, আল্লাহর জমিনে তার বিধি-বিধান কায়েম করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

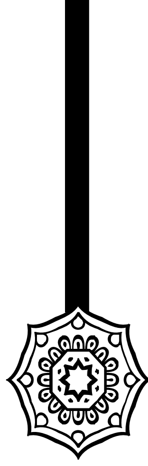
﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

"যাদেরকে আমি কোন ভূখন্ডের কর্তৃত্ব দান করেছি তাদের দায়িত্ব হল, সেখানে নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রধান করা। আর প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতেয়ারভুক্ত"।[২]

এর ব্যত্যয় ঘটলে খোদাপ্রদত্ত সে স্বাধীনতার সুরক্ষা হয় না। অনিবার্য হয়ে পড়ে খোদায়ি গজব। এক পর্যায়ে স্বজাতীয় নিপীড়কশ্রেণীর শোষণের শিকার হয় সার্বভৌম জনগোষ্ঠী। যার ফলে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার থেকেও বিচ্যুত হয়।



[১] সাল্লাবি আলি মুহাম্মদ, *আল দাওলাতুল উমাভিয়্যাহ*, (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৯ হি.), খ. ১, পৃ. ২৭৭।
[২] আল কুরআন, ২২ : ৪১।



বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বাধিকার

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অর্জিত হয় বঞ্চিত ও শোষিত জনতার বিজয়। এ যুদ্ধের পরিসর স্বল্প হলেও প্রেক্ষাপট সুদীর্ঘ। মানুষ জন্মগতভাবে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি। প্রতিটি মানবসন্তানকে আল্লাহ তা'য়ালা স্বাধীন সত্ত্বায় সৃজন করেছেন। বিশ্ব জগত সৃষ্টির সূচনা থেকে পৃথিবীর পূর্ব দিগন্তে উদিত হতো স্বাধীনতার সূর্য। আজ থেকে আড়াই'শ বছর পূর্বে উপমহাদেশের উদিত স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যায়। কায়েম হয় সাদা আদমিদের বিলেতি শাসন। তারা এ দেশের মানুষকে শাসনের চেয়েও বেশি করতো শোষণ। বিজাতীয়দের অবিচার ও বৈষম্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে এ দেশে আবারো উদিত হয় স্বাধীনতার অস্তমিত সূর্য। হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত উপমহাদেশের বহুধর্মীয় সমাজব্যবস্থায় নেতৃস্থানীয় মুসলমানেরা চিন্তা করলো, নিজেদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হলে ধর্ম-কর্মসহ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে আরো বেশি স্বাধীনতা ভোগ করা যেতো। শুরু হলো ঘাত-প্রতিঘাতের একটি নিয়মতান্ত্রিক ধারা। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের এক পর্যায়ে কায়েম হলো পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন-

সার্বভৌম রাষ্ট্র। মুসলিম অধ্যুষিত এ রাষ্ট্র ইসলামি আইনের অধীনে পরিচালিত হবে এ ছিল শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের ওয়াদা। কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ নির্বাচিত হয় সে দেশের প্রধান কার্যনির্বাহী। আন্দোলন ও সরকার গঠনে দ্বিতীয় সারিতে ছিলেন প্রাজ্ঞ-অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ। নেতৃত্বের তৃতীয় স্তরে থেকে আন্দোলনে আত্মত্যাগী ভূমিকা পালন করেন দেশের প্রথিতযশা আলিম-উলামা। স্বাধীনতা লাভের পর শাসকগোষ্ঠীকে ইসলামি আইনের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিশ্রতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ। জিন্নাহ উত্তর দিলেন 'পাকিস্তান আভি বাচপান মে হ্যায়' পাকিস্তান এখনো শৈশবকাল অতিক্রম করছে। আরো কিছুদিন পর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বললেন, 'ইয়ে তো এক সিয়াসি পলিসি থা' এই প্রতিশ্রুতি ছিল একটি রাজনৈতিক পলিসি। একটি স্বাধীন জাতির সঙ্গে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রতারণার শুরু এখান থেকেই।

এর পরের ইতিহাস আরো হৃদয়বিদারক; ভয়ানক ও মর্মস্পর্শী। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতৃবর্গ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে লাগলো। আমাদেরকে দেখাতে শুরু করলো ভিন্ন চোখে। দাঁড় করালো বৈষম্য ও বিভাজনের বুলন্দ প্রাচীর। বঞ্চিত করলো সকল প্রকার সুযোগ - সুবিধা থেকে। এমনকি নিজের মায়ের ভাষায় কথা বলার আধিকারও কেড়ে নিলো। উর্দুকেই চাপিয়ে দিলো পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। আল্লাহ মানুষকে মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। নবি-রসূলগণ মানুষকে স্বজাতির ভাষায় তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা নবি-প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡ﴾

"আমি সকল নবি-রসূলকে স্ব-জাতির ভাষায় প্রেরণ করেছি, যাতে স্পষ্টভাবে তাদের নিকট দীনের দাওয়াত পেশ করতে পারে"।[১]

দেশ ও জাতির এমন নাযুক পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মপ্রাণ মানুষ মনে করলো, এমন হলে তো দীনের প্রচার-প্রসারও থেমে যাবে। শুরু হলো মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম। ৫২ এর ভাষা আন্দোলন। এ দৃষ্টিকোণে ভাষা আন্দোলন

---

[১] আল কুরআন, ১৪;৪।

ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ দীনি আন্দোলন। পরের ইতিহাস সকলের জানা। গণতন্ত্রের লেবাস পরে ক্ষমতা লাভ করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে নির্বাচিত বিরোধী দলকে সরকার গঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করল। যা ছিল খোদ গণতন্ত্রের সঙ্গেই ফেরেববাজি। দেশের সর্বস্তরের মানুষ ফুঁসে উঠলো। সূচনা হলো জুলুম-অবিচারের এক নির্মম অধ্যায়ের। নির্যাতনের স্টীম রোলার চালানোর এক পর্যায়ে ঘোষিত হলো স্বাধীনতার ঘোষণা। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ।

মূলত ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর জুলুম-অবিচারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনতার সর্বাত্মক প্রতিরোধ। মুক্তি মানে নিষ্কৃতি, পরিত্রাণ ও রক্ষা পাওয়া। যুদ্ধ মানে সংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধ মানে বৈষম্যহীন জীবন ও সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অবিরাম সংগ্রাম। অধিকার আদায়ের দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি। সাদামাটা ভাষায় বলতে গেলে, পাকিস্তানিদের জুলুম-নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি ও মুক্তির নিমিত্তে পরিচালিত ৭১ সালের গণ-আন্দোলনই ছিল মুক্তিযুদ্ধ। মানবতার এই মুক্তির বাণীই ছিল ইসলামের মর্মবাণী। নবি-রসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্যও ছিল তাই। শ্রেণি-বৈষম্যের অবসান ও দুর্বলের উপর সবলের জুলুম থেকে নিষ্কিৃতির লক্ষ্যেই আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়াতে নবি-রসূল প্রেরণ করেছেন। সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাপূর্বক কর্ম ও বিশ্বাসের সর্বাঙ্গীন মুক্তিই হলো তাওহিদের মর্মবাণী। প্রথম নবি আদম (আ.) থেকে শেষ নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকলেই মানুষকে মুক্তির এ বাণী শুনিয়েছিলেন। প্রত্যেকেই গেয়ে গেছেন মানবতার জয়গান। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

"আমি প্রত্যেক জাতির নিকট একজন করে রসূল পাঠিয়েছি, যেন তারা আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয় এবং গাইরুল্লাহ তথা তাগুত এর অনুকরণ প্রত্যাখ্যান করে"।[১]

মানুষের গোলামি থেকে মানবতার মুক্তির জন্যে প্রয়োজনে তারা যুদ্ধ করেছেন। আমাদের নবি তাঁর জীবনে ২৭টি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে প্রমাণ করে গেছেন, তাঁর উম্মতকে মুক্তির জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। যুগে যুগে তাদেরকে যুদ্ধ করেই টিকে থাকতে হবে। তিনি বলে গেছেন, আল জিহাদু মাজিন ইলা

[১] আল কুরআন, ১৬;৩৬।

ইয়াওমিল কিয়ামাহ’। যুদ্ধ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। মুক্তিসংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। ইমাম আবু দাউদ আনাস (রাদি.) থেকে বর্ণনা করেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ثَلاَثَةٌ مِنْ أَصْلِ الإِيمَانِ : الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَلاَ تُخْرِجْهُ مِنَ الإِسْلاَمِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِيَ اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لاَ يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلاَ عَدْلُ عَادِلٍ، وَالإِيمَانُ بِالأَقْدَارِ

“তিনটি বিষয় মৌলিক ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এক. লা ইলাহা বলার পর কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা। কোনো গুনাহের কারণে আমরা তাকে অমুসলিম সাব্যস্ত করতে পারি না। আমলের কারণে ইসলাম থকে খারিজ বলেও মনে করি না। দুই. নবি হিসেবে আমার আগমনের পর থেকে দাজ্জালের মোকাবেলা পর্যন্ত আমার উম্মতের জন্য জিহাদ অব্যাহত থাকবে। কোনো জালিমের জুলুম ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের ন্যায়পরায়ণতার কারণে জিহাদ বাতিল হতে পারে না। ঈমানের তৃতীয় মৌলিক বিষয় হলো, তাকদিরের উপর বিশ্বাস স্থাপন।”[১]

আদম (আ.) এর যুগে সকল মানুষ একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে যুদ্ধ করতে হয়নি। তিনি তাওহিদের পাশাপাশি মানবতার উৎকর্ষতা ও সাম্যের বাণী প্রচার করে গেছেন। ঈসা, মুসা, দাউদ ও সোলাইমানসহ (আ.) অনেক নবি-রসূলকে জুলুম-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এজন্য অনেক নবি-রসুল নিজেদের জীবনের নজরানা দিয়েছেন। নবি-রসূলদের পরিচালিত এ মুক্তিযুদ্ধের প্রধান মন্ত্র ছিল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। যার মর্মার্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া সকল অপশক্তির আনুগত্য ত্যাগ করা, অন্যায়ের সামনে মাথা নত না করা। নিজের কর্ম, চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ঘোষণা করা। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ এর সারবত্তা হলো, শেষ নবির নীতি-আদর্শ পরিপন্থি মানবরচিত সকল মতবাদের অনুসরণ থেকে নিজের জীবন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতার বজ্রকঠোর ঘোষণা। মহানবি তাঁর রেসালতের সূচনাপর্বে সাফা পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করে আল্লাহর একত্ববাদ ও তার রিসালতের যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা ছিল

---

[১] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্‌ন আশ‘আস আল সাজিসতানি, *সুনানু আবি দাউদ*, (বৈরুত: আল মাকতাবা আল আসারিয়্যাহ, সম্পাদনা: মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আবদুল হামিদ, তা/বি.), খ. ৩, পৃ. ১৮, হাদিস নং-২৫৩২।

মুশরিকদের মূর্তিমান সকল দেব-দেবীর অস্থিত্বের উপর প্রচন্ড আঘাত। আল্লাহর একত্ববাদ ও মহানবির শাশ্বত আদর্শের মোকাবেলায় আবু লাহাব কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেছিল, 'তাববান লাকা, আ লিহাজা জামা'তানা'। 'ধ্বংস হোক তোমার! আমাদের এজন্য ডেকেছো?' মক্কার পৌত্তলিক সমাজ 'কালিমায়ে তাইয়িবা'র মর্মবাণী গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। এ বাণী কেবলমাত্র কা'বার অভ্যন্তরে সুরক্ষিত ৩৬০ টি মূর্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহই নয়; একটি নতুন জাতির উত্থানের চূড়ান্ত ঘোষণা। সকল প্রকার গোলামির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার এক নতুন সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস।

মানবতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির বাণী প্রচারের অপরাধে বিশ্বনবিকে মাতৃভূমি থেকে বিতাড়ন করা হয়। মদিনায় হিজরত করে তিনি নতুন পরিবেশে স্বাধীনতা ও মানবমুক্তির বাণী প্রচারের সার্থক চর্চায় নিমগ্ন হন। তথায় স্থাপন করেন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভিত্তি। যেখানে মালিকের হুকুম ছাড়া কোনো গোলামের হুকুম চলবে না। এক পর্যায়ে সমগ্র আরব অবগাহন করে মুক্তির সেই মোহনায়। এভাবেই বনি আদম ফিরে পায় স্বাধীনতার আসল স্বাদ ও সার্বভৌমত্বের প্রকৃত আমেজ। জাহিলি সমাজের বর্বরতা ও মানুষের গোলামির নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভ করে দুর্বল ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী। তারা একজন স্বাধীনতার ঘোষক ও প্রকৃত ত্রাণকর্তার সন্ধান পায়। নারীরা ফিরে পায় তাদের হৃত অধিকার। শ্রমজীবি পেশাজীবিসহ সর্বস্তরের মানুষ শামিল হয় মুক্তির মিছিলে। এক আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক আত্মসমর্পনপূর্বক বহুত্ববাদের গোলামির জিঞ্জির থেকে নিস্কৃতি লাভ করে।

মুক্তির এ আহ্বান আরব উপ-দ্বীপের গণ্ডি পেরিয়ে ইউরোপ-আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যা উমার (রাদি.) এর শাসনামলে অর্ধ পৃথিবী ছাড়িয়ে যায়। মদিনায় শান্তিপূর্ণ ও তাওহিদভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের বাইরের রাজা-বাদশাহদের নিকট শান্তির বাণী ও মুক্তির গ্যারান্টি দিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তৎকালীন পরাশক্তি রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতির নিকট প্রেরিত পত্রটি এখানে প্রণিধানযোগ্য।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى . أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلامِ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ،

"বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এ চিঠি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ এর পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরিত। সৎ পথের অনুসারীদের প্রতি রইলো শান্তিময় শুভেচ্ছা। অতঃপর, আমি আপনাকে ইসলামের পথে আহ্বান করছি। ইসলাম গ্রহণ করলে অপনার জন্য শান্তি ও মুক্তির নিশ্চয়তা আছে"।[১]

সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন স্বাধীনতার মর্ম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পুরোদমে উজ্জীবিত। বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত, পারস্য বিজয়ী সাহাবি সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রাদি.) তৎকালীন পরাশক্তি পারস্য সম্রাটের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। মুসলিম দলপতি রিব'য়ি ইব্ন আমির (রাদি.) পারস্য সেনাধ্যক্ষ রুস্তমের সামনে মুসলমানদের আত্মপরিচয়মূলক এ বাণী তুলে ধরতে কুণ্ঠিত হননি। 'তোমরা কারা এবং কেনো এসেছো? রুস্তমের এমন প্রশ্নের উত্তরে মুসলমানদের স্বাধীন জাতিসত্ত্বার মৌলিক পরিচয়টি তুলে ধরে বলেন,

اللهُ ابْتَعَثْنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سعَتِهَا، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، فَأَرْسَلَنَا بِدِينِهِ إِلَى خَلْقِهِ لِنَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ، فَمَنْ قَبِلَ ذَلِكَ قَبِلْنَا مِنْهُ وَرَجَعْنَا عَنْهُ، وَمَنْ أَبَى قَاتَلْنَاهُ أَبَدًا حَتَّى نَفْضِيَ إِلَى مَوْعُودِ اللهِ

"আমরা এমন এক জাতি আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর গোলামিতে অবগাহন করার জন্যে এবং ইহজগতের সংকীর্ণ ভূখণ্ড থেকে পরকালের বিস্তীর্ণ জগতে পরিভ্রমনের জন্য। বিভিন্ন ধর্ম ও মানবরচিত মতবাদের আড়ালে পরিচালিত জুলুমের নাগপাশ ছিন্ন করে ইসলামের প্রতিষ্ঠিত ন্যায়বিচারের দিকে আহ্বান করার জন্য। কেউ এই আহ্বানে সাড়া দিলে আমরা স্বদেশে ফিরে যাবো। আর যারা এই বাণী প্রত্যাখ্যান করবে তাদের সঙ্গে কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবো"।[২]

পৃথিবীর একটি সুপ্রিম পাওয়ারের গালে রিব'য়ি ইব আমির (রাদি.) এর এ উক্তি

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বৈরুতঃ দারু ইবনি কাসির, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৮, হাদিস নং- ৭।

[২] ইব্ন কাসির, আবুল ফিদা ইসমাইল বিন উমার, *আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া*, (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খ্রি.), খ.৭, পৃ. ৩৯।

ছিলো প্রথম চপেটাঘাত। যা সকল প্রকার জুলুমবাজ শাসক শ্রেণির অবিচারের মুখোশ উন্মোচন করে দেয় এবং মানবরচিত মতবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মিসর বিজয়ী সাহাবি আমর ইবনুল আ'স এর পুত্র আবদুল্লাহ'র কোনো এক অপরাধের প্রতিকারকল্পে উমার (রাদি.) বজ্রকঠোর ঘোষণায় মুসলমানদের এই আত্মপরিচয় ফুটে ওঠে। তিনি বলেন,

مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا؟

"তোমরা মানুষকে কখন থেকে গোলামে পরিণত করেছো? অথচ তাদের মায়েরা তো স্বাধীনস্বত্বা হিসেবেই তাদের জন্ম দিয়েছে"।[1]

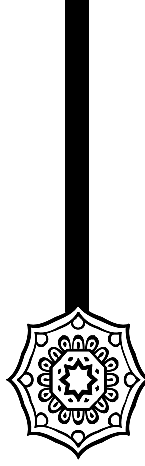
মূলত মুসলমান একটি স্বাধীনসত্ত্বা ও বিজয়ী জাতি। আরব বণিকদের মাধ্যমে উপমহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে বিজয়ের ক্রমবিকাশের সূচনা হয়। ইখতিয়ারুদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খালজি সর্বপ্রথম এ অঞ্চলে স্বাধীনতার মূল ঘোষণা বাস্তবায়ন করেন। জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করেন আল্লাহর বিধান। যার ফলে এ দেশের মুসলমানের শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত হয় স্বাধীনতার সৌরভ ও মুক্তির চেতনা। মুক্তির এ মন্ত্র বলেই বৃটিশ বেনিয়াদের এ দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। জন্মের পরপরই ভূমিষ্ঠ শিশুর কর্ণকূহরে ও হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্পন্দন জাগায় আযান-ইকামতের সুমধুর বাণী। দৈনিক পাঁচবার এ ধ্বনিতে মুখরিত হয় এ দেশের আকাশ-বাতাস। শীতল হয় আবহাওয়া-পরিবেশ-প্রতিবেশ। মুসলমানগণ এ বাণীর চর্চা করে শয়নে-স্বপনে ও সর্বক্ষণে।

নব্বই ভাগ মুসলমানের এ দেশে পাকিস্তানিদের বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার মূলে ছিল ইসলামের এ চেতনাবোধ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানে মুসলমানের হৃদয়ে সুপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উল্লম্পন। মনের গভীরে লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন। এ চেতনা পরিচর্যা পেয়েছে ইসলামি শিক্ষায় লালিত মুসলিম সমাজে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানে ইসলামি মূল্যবোধবিরোধী ধারালো কোনো অস্ত্র নয় যে, তা দিয়ে ইসলামকে ইচ্ছেমতো তুলোধুনো করতে হবে। আবার মুক্তিযুদ্ধ ইসলাম পরিপন্থি কোনো কর্মসূচিও নয় যে, তার বিরোধিতায় আদাজল খেয়ে নামতে হবে। পাকিস্তানিদের তল্পিবাহক এক শ্রেণির পা-চাটা গোলাম ছাড়া এ দেশের সর্বস্তরের মানুষের সর্বাত্মক সহযোগিতার মাধ্যমে উড্ডীন হয় আমাদের

[1] আবদুশ শাফি মুহাম্মদ আবদুল লতিফ, *আল সিরাতুন নাবাভিয়্যাহ ওয়া আল তারিখুল ইসলামি*, (কায়রো: দারুস সালাম, ১৪২৮ হি.), পৃ. ৪১০।

লাল-সবুজের এ পতাকা। মুক্ত হয় চুয়ান্ন হাজার বর্গমাইলের নয়নাভিরাম এ ভূখণ্ড। ইসলাম যেভাবে নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায়ের নিরঙ্কুশ সম্পদ ও ভোগ্যপণ্য নয়; মুক্তিযুদ্ধও একচ্ছত্র কারো উত্তরাধিকার স্বত্ব নয়। ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধ এ দেশের মানুষের গৌরবের প্রতীক। বেঁচে থাকার উপলক্ষ; মুক্তির মোক্ষম হাতিয়ার। ইসলামের চেতনা ও প্রাণশক্তির বলেই আল্লাহর রহমতে মাত্র নয় মাসে এ দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। যা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা।





করোনা ভাইরাস ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার

অতি সূক্ষ্ম ও অকোষীয় একটি বৈজ্ঞানিক অণুজীব হলো ভাইরাস। অচ্যুত-অস্পৃশ্য এ ভাইরাসটি আজ পুরো বিশ্বের আতঙ্ক। 'করোনা' নামক এই মহামারির ভয়াবহ তাণ্ডবে থমকে গেছে পৃথিবীর সচল চাকা। নির্জীব ও স্তব্ধ হয়ে পড়েছে সরব বসুন্ধরার গতিপ্রবাহ। এই ভাইরাস প্রতিরোধে বিশ্ব নেতৃত্বের ব্যর্থতা ও অসহায়ত্বে মুখ থুবড়ে পড়েছে আধুনিক প্রযুক্তি। গ্লোবাল ভিলেজ এর নির্মাতা ইউরোপ আমেরিকার গর্ব অনেকটা ধূলোয় মিশে গেছে। নিকট ইতিহাসের আধুনিক বিশ্ব এমন কঠিন সংকটের মুখোমুখী এ যাবত হয়নি। মহামারি চলাকালীন সময়ে জাতিসংঘ মহাসচিব বলেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর করোনা ভাইরাস আমাদের জন্য সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। চীনের হুবেই শহরের উহান অঞ্চলে করোনা নামক এ ভাইরাসের উৎপত্তি। সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুর বেসামাল ব্যবহারের করুণ পরিণতি হিসেবে প্রাণঘাতী এই মহামারির সৃষ্টি। জীবাণু অস্ত্র তৈরির গবেষণাগার থেকে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে এমন অভিযোগও রয়েছে বিশ্ব নেতৃত্বের স্বপ্নাচারী চীনের বিরুদ্ধে। পাল্টা ইরান ও চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও এই অভিযোগের কামান তাক করেছে। ঘটনার

সূত্রপাত যেথাই হোক, নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তুর প্রতি মানুষের আকর্ষণের শাস্তিস্বরূপ যমিনে খোদায়ি গযবের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কথিত আছে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কম্যুনিস্ট চীনে চেয়ার টেবিল ব্যতীত সকল প্রকার চতুষ্পদ বস্তু সুস্বাদু আহার্য হিসেবে স্বীকৃত। মুসলমানদের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনেও হারাম দ্রব্যের ব্যাপক ও অবাধ প্রচলন অব্যাহত রয়েছে। যা করোনার মতো হাজারো ভাইরাসের রূপ ধারণ করে যে কোনো সময় সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের সর্বাঙ্গীন অনুশীলনই মুসলমানদের সম্ভাব্য ভাইরাসের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে।

করোনা ভাইরাসের উৎস ও প্রতিকার

করোনা ভাইরাসের উৎস নির্ণয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা নানাবিধ গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেছে। সর্বসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ গবেষণাটি হলো, চীনের উহান শহরের সাপ ও বাদুড় এর মাংস কেনাবেচার স্থান থেকেই এই ভাইরাসের উৎপত্তি। ক্ষতিকর এ সকল প্রাণী রোগ-ব্যাধি সংক্রমণ করে। বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির কারণে এটি আজ প্রমাণিত সত্য। সৃষ্টিকর্তা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর সকল প্রকার বস্তু অখাদ্য ও গর্হিত বলে ঘোষণা করেছেন। নিষিদ্ধ বস্তুর তালিকা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,[১]

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾

উপর্যুক্ত আয়াতে (এক) মৃতজন্তু, রক্ত, শুকরের গোশত, গাইরুল্লাহর নামে জবাইকৃত পশু-পাখি... এবং জুয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি ভিন্ন আয়াতে (দুই) মাদক দ্রব্য, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, আত্মসাৎ, মিথ্যাচার, ব্যাভিচার ইত্যাদিও শরিয়তের অকাট্য দলিল দ্বারা হারাম ঘোষিত। মুসলমানগণ প্রথম প্রকারের নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেও অনেকে দ্বিতীয় প্রকারের বস্তুসমগ্র আগ্রহসহকারে গ্রহণ করে থাকে। একজন মুসলমানের পানাহারের মেন্যুতে শুকরের গোশত আপ্যায়ন করা হলে নির্ঘাত তার ধর্মীয়

---

[১] আল কুরআন, ৫;৩।

অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগ তোলবে। আবার একই ব্যক্তির সামনে মাদক পরিবেশিত হলে সে আগ্রহভরে তা গ্রহণ করে। শুকরের গোশত ভক্ষণ করা আর সুদ, ঘুষ ও দুর্নীতির অর্থ গ্রহণ করার মধ্যে শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো পার্থক্য নেই। মুসলমানদের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রথম প্রকারের বস্তুসমূহ নিষিদ্ধ হলেও দ্বিতীয় প্রকারের বস্তুসমূহের ব্যাপারে কোনো বিধি-নিষেধ নেই। বরং বিভিন্ন মুসলিম সরকার এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রণোদনা প্রদান করে। তারা হালালকে হারাম ঘোষণা করে এবং হারামকে বৈধতা দিয়ে খোদার আসনেও অধিষ্ঠিত হয়। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মুসলিম বিশ্বের নেতৃবর্গের প্রধান কর্তব্য ছিল, শরিয়তকর্তৃক গর্হিত বস্তুসমূহের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা। ভাইরাসের মূল উৎস চিহ্নিত না করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার দুর্নিবার প্রচারণা বিধানদাতা প্রভুর সঙ্গে উপহাস করার নামান্তর।

মহামারিতে মৃত্যুবরণকারীর ফজিলত

করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে বস্তুবাদী বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন মুসলিম দেশে লকডাউন ঘোষণা করেছে। অনেক দেশ সংক্রমণের ভয়ে জুমা ও জামাত বন্ধ করে মসজিদ তালাবদ্ধ করেছে। বাংলাদেশেও লাগাতার লকডাউনের কারণে গণমানুষের জীবনযাত্রা ব্যহত হয়েছিল। হাদিসের ভাষায় মহামারি অমুসলিমদের জন্য গযব হিসেবে আবির্ভূত হলেও মুমিনদের জন্য আল্লাহর অসীম রহমতের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়। এতে মুমিনগণ ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সুযোগ লাভ করে। আমল আখলাক এর মাত্রায় বর্ধিত হয়। আল্লাহর পরিচয় লাভ করার অমোঘ সুবিধা পায়। সর্বোপরি আল্লাহর অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটার কারণে ঈমানের অন্তর্জ্যোতি খুলে যায়। কোনো মুমিন মহামারিতে মৃত্যুবরণ করলে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। সহিহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে,

الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

> "মহামারি হলো আমার উম্মাতের জন্য শাহাদাত এর মর্যাদা লাভের অপূর্ব সুযোগ"।[১]

আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৭, পৃ. ১৩১, হাদিস নং- ৫৭৩২, মুসলিম- ৫০৫৩।

أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونِ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ

"আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট মহামারি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা যাকে চান আযাব দেন। তবে মুমিনদের জন্য তিনি এটিকে রহমত হিসেবে প্রেরণ করেন। যে ব্যক্তি মহামারিতে আক্রান্ত হবার পর সওয়াবের আশা পোষণপূর্বক ধৈর্যধারণ করে এবং নিজ এলাকায় অবস্থান করে। সে এ বিশ্বাস ধারণ করে যে, আল্লাহ তার ভাগ্যে যা নির্ধারন করেছেন তাই ঘটবে। ঐ ব্যক্তি শহিদের মর্যাদা লাভ করবে।"[১]

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন,

يَأْتِي الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ بِالطّاعُونِ، فَيَقُولُ أَصْحَابُ الطّاعُونِ: نَحْنُ شُهَدَاءُ، فَيُقَالُ: انْظُرُوا، فَإِنْ كَانَتْ جِرَاحُهُمْ كَجِرَاحِ الشُّهَداءِ تَسِيلُ دَمًا رِيحَ الْمِسْكِ، فَهُمْ شُهَدَاءُ؛ فَيَجِدُونَهُمْ كَذَلِكَ

"আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণকারী ও মহামারিতে মৃত্যুবরণকারীগণ কিয়ামতের মাঠে সমবেত হবে। মহামারিতে মৃত্যুবরণকারীগণ দাবী করবে, আমাদেরও শাহাদাতের মর্যাদা দেওয়া হোক। আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে তাদের শরীর চেক-আপ করার নির্দেশ দিয়ে বলবেন, তাদের শরীরে শহিদদের মতো আঘাতের কোনো চিহ্ন আছে কি না দেখো এবং তাদের রক্ত থেকে মেশক এর সুঘ্রাণ সুবাসিত হচ্ছে কিনা পর্যবেক্ষণ করো। ফেরেশতাগণ বডি পর্যবেক্ষণ করার পর তাদের শরীরে শহিদদের মতো আঘাতের চিহ্ন দেখতে পাবেন এবং তাদের রক্তে মেশকের সুঘ্রাণও অনুভব করবেন।"[২]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৭, পৃ. ১৩১, হাদিস নং- ৫৭৩৪।

[২] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদ*, (রিয়াদ: মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, ১৪২১ হি./ ২০০১ খ্রি.), খ. ২৯, পৃ. ১৯৮, হাদিস নং- ১৭৬৫১।

الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"শহিদ পাঁচ প্রকার। ১. মহামারিতে মৃত্যুবরণকারী ২. পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণকারী ৩. পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারী ৪. প্রাচীর ধ্বসে মৃত্যুবরণকারী ৫. আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণকারী"।[১]

অন্য হাদিসে সন্তান প্রসবজণিত মৃত্যুবরণকারী নারীদেরকেও শহিদের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। شَهَادَةٌ وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَاءَ (মুসনাদ আহমদ- ২২৮৩৬) অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত আছে,

يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسُرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ 'তাদের সন্তানেরা নিজ নিজ মায়েদের নাড়ি ধরে জান্নাতে নিয়ে যাবে'। (সহিহ আত তারগিব ওয়াত তারহিব- ১৩৩৯)

'যে ব্যক্তি নিজের ও পরিবার পরিজনের জান-মাল, ও মান-সম্মান রক্ষার্থে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘাতে মৃত্যুবরণ করবে, সেও শহিদ'।[২]

من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهوَ شَهيدٌ

ইসলাম ও সংক্রামক ব্যাধি

সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণা ইসলামের দর্শন-চিন্তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে সংগতিশীল। মহামারির প্রকোপ থেকে সাধারণ মানুষকে সুরক্ষার ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সতর্কতামূলক বিধি-ব্যবস্থা ইসলামের চৌদ্দশো বছর পূর্বের নির্দেশনার অংশবিশেষ। তবে বস্তুবাদী চিকিৎসা ব্যবস্থার কতিপয় ধ্যান-ধারণা এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

মূলত সংক্রমণের মৌলিক কোনো ক্ষমতা ইসলামে স্বীকৃত নয়। আল্লাহর হুকুমের বাইরে কোনো বস্তুর এমন কোনো শক্তি নেই, যা অপরকে সংক্রমণ করতে পারে। আবার সংক্রমণের বাস্তবতা এবং তা থেকে বাঁচার সতর্ককতামূলক ব্যবস্থাকে

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৪ , পৃ. ২৪, হাদিস নং- ২৮২৯। মুসলিম- ৫০৪৯।

[২] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৩, পৃ. ১৩৬, হাদিস নং- ২৪৮০। মুসলিম- ৩৭৮।

ইসলাম অস্বীকার করে না; ক্ষেত্রবিশেষে উৎসাহিত করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন। ইমাম বুখারি ও মুসলিম আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণনা করেন,

لا عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ . فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا بَالُ الإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا قَالَ فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟

"সংক্রমণের মৌলিক ও নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। সফর মাসকে অশুভ মনে করার কোনো ভিত্তি নেই। ইসলামে অশুভ ধারণার কেনো অস্তিত্ব নেই। জনৈক বেদুঈন প্রশ্ন করলো, মাঠে বিচরণশীল হরিণের মতো পরিচ্ছন্ন উটসমূহ সংক্রমণযুক্ত উটের সঙ্গে মিশ্রিত হবার কারণে তাদের মধ্যে এই ব্যাধি সংক্রমিত হবার কারণ কি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, পারস্পরিক সংশ্রব সংক্রমণের কারণ হলে প্রথম উটটিকে কে সংক্রমণ করলো?"[১]

সংক্রমিত রোগীর সংস্পর্শের কারণে অন্যের সংক্রমণের কোনো নিশ্চিত আশংকা নেই বলেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহামারি আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে পানাহারে অংশগ্রহণ করেছেন।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ كُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মহামারি আক্রান্ত রোগীর হাত ধরে তাঁর সঙ্গে খাবার পাত্রে বসিয়ে দিয়ে বলেছেন, আল্লাহর নাম নিয়ে আহার করো এবং সংক্রমণের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করো"।[২]

উপর্যুক্ত হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, সৃষ্টি জগতের মধ্যে কারো সংক্রমণের নিজস্ব কোনো শক্তি নেই। কারো মধ্যে সংক্রমণ দেখা গেলে বুঝতে হবে, একমাত্র

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৭, পৃ. ১৩৮, হাদিস নং- ৫৭৭০।

[২] তিরমিযি, মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযি*, (বৈরুত: দারুল গারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ২৪, হাদিস নং- ১৮১৭।

আল্লাহর হুকুমেই এটি সংঘটিত হয়েছে। তবে ইসলাম সংক্রমণের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা কখনো অস্বীকার করে না। যার ফলে সংক্রমণ রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি ইসলামে জোর তাগাদা দেয়া হয়েছে।

নিম্নের হাদিসে মহামারি সংক্রমণের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা স্বীকার করে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ নিদেশনা রয়েছে।

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا

"কোনো এলাকায় মহামারি সংক্রমণের খবর পাওয়া গেলে তাতে প্রবেশ করো না। আবার তোমাদের বসবাস মহামারি আক্রান্ত এলাকায় হলে, তা থেকে বের হবার চেষ্টাও করো না"।[১]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ

"মহামারি আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে এভাবে পালাও, যেভাবে বাঘ দেখলে পলায়ন করো"।[২]

তিনি আরো বলেন,

لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ

"মহামারি আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি দীর্ঘক্ষণ দৃষ্টিপাত করো না"।[৩]

لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৭, পৃ. ১৩০, হাদিস নং- ৫৭২৮।

[২] বগভি, আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইব্‌ন মাসউদ আল ফার্‌রা, *শরহুস সুন্নাহ*, স্পাদনা: শুআইবুল আরনাউত, (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ১৭১, হাদিস নং- ৩২৪৯।

[৩] ইব্‌ন মাজাহ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন য়াযিদ আল কাযভিনি, *সুনানু ইব্‌ন মাযাহ*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (কায়রো: দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা/বি.), খ. ২, পৃ. ১১৭২, হাদিস নং- ৩৫৪৩।

"সংক্রামক ও অসুস্থ উটের মালিকেরা সুস্থ উটসমূহ থেকে অসুস্থ উটগুলোকে যেন আলাদা রাখার ব্যবস্থা করে"।[১]

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ইসলামে সংক্রমণ প্রতিরোধনীতি

ভাইরাস প্রতিরোধ ও মহামারির বৈশ্বিক প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সামাজিক দূরত্ব, হোম কোয়ারেন্টাইন ও বারবার হাত ধোয়াসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করে। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিধি-নিষেধসমূহ ইসলামের চৌদ্দশো বছর পূর্বের স্বাস্থ্যবিধি দ্বারা সমর্থিত। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান ও প্রথম শিক্ষক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির জন্য সতর্কতামূলক স্বাস্থ্য-বিধি প্রণয়ন করেছেন।

মাস্ক পরিধান করা

মাস্ক বিশ্বের অনেক দেশে সংক্রমণ ঠেকানোর জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। উন্নত দেশের অনেক সচেতন নাগরিক বায়ূদুষণ থেকে বাঁচার জন্য মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ায়। ভাইরোলোজিস্ট তথা ভাইরাস বিশেষজ্ঞদের মতে, হাত থেকে মুখে সংক্রমণ ঠেকাতে মাস্ক ব্যবহার করে সুফল পাবার অনেক নজির আছে। আঠারো শতকে প্রথম সার্জিক্যাল মাস্কের প্রচলন শুরু হয় বলে জনশ্রুতি আছে। ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের সেন্ট জর্জেসের ড. ডেবিড ক্যারিংটন বলেন, সাধারণ সার্জিক্যাল মাস্ক বায়ূবাহিত ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে পারে। বেশিরভাগ ভাইরাসই বায়ূবাহিত। মাস্কে চোখ খোলা থাকে বলে সংক্রমণের ঝুঁকি থেকেই যায়। একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, মানুষ প্রতি ঘন্টায় গড়ে ২৩ বার হাত দিয়ে মুখ স্পর্শ করে। সুতরাং ভাইরাস থেকে পুরোপুরি মুক্তি পেতে সমগ্র মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতে পারলে ভালো। ভাইরাস থেকে মুক্তির লক্ষে কে সর্বপ্রথম মাস্ক পরিধান করেন সে বিষয়ে আধুনিক বিশ্ব অন্ধকারেই থেকে গেছে। তাঁর অনুসারীদের অনেকেই এ বিষয়ে খোঁজ নেয়ার তেমন গরয বোধ করেনি। সর্বপ্রথম যিনি ভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক পরিধান করেছিলেন তিনি হলেন, মানবতার নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى مَجْذُومٍ، فَخَمَرَ أَنْفَهُ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَلَيْسَ قُلْتَ: لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ؟ قَالَ: بَلَى

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৭, পৃ. ১৩৮, হাদিস নং- ৫৭৭১।

"ওয়ালিদ বিন আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাইরাস আক্রান্ত এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাবার সময় চেহারা ঢেকে ফেলেন। তাকে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আপনিই তো বলেছেন, "সংক্রমণের মৌলিক ও নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। ইসলামে অশুভ ধারণার কেনো অস্থিত্ব নেই। তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।"[১]

বারবার হাত ধোয়া

পরিচ্ছন্নতা অভিযান মহামারি প্রতিরোধের প্রধান উপাদান। পক্ষান্তরে অপরিচ্ছন্নতা রোগ-জীবাণু সংক্রমণের প্রধান সহায়ক। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে পরিত্রাণের লক্ষে বারবার হাত ধোয়ার প্রতি চিকিৎসা বিজ্ঞান বিবিধ নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলামে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধাংশ। একজন মুসলমানের প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য দৈনিক পাঁচবার হাত ধোয়ার নির্দেশ রয়েছে। তাও কব্জি পর্যন্ত নয়; কনুই অবধি। মুখের বহিরাংশ তথা চেহারা নয়; মুখগহ্বর ধোয়ার পাশাপাশি কণ্ঠনালী পর্যন্ত গড়গড়া করার বিধান জারি করা হয়েছে। হাত-পায়ের আঙ্গুলসহ দাত খিলাল করার নির্দেশনা বলবৎ রয়েছে। দৈনিক দুইবার নয়; নামাযের অযু ছাড়াও একাধিকবার মিসওয়াক করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পানাহারের পূর্বাপর ও নিদ্রা হতে গাত্রোত্থানের পর হাত ও মুখ-গহ্বর ব্রাশ করা ইসলামের একটি অপরিহার্য বিধান। চিকিৎসা শাস্ত্রের বারবার হাত ধোয়ার পদ্ধতি ইসলামের এই স্বাস্থ্যবিধি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এ পর্যায়ে উপণীত হতে হয়তো আরো কিছু অপেক্ষার প্রহর গুণতে হবে। ইসলামের স্বচ্ছতা বিধি এখানো আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র থেকে দেড় হাজার বছর এগিয়ে। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে,

بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ

"পানাহারের পূর্বাপর হাত ও মুখ ধোয়ার মধ্যে খাদ্যের বরকত নিহিত"।[২]

[১] ইব্‌ন আবি শাইবা, আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহিম, *মুসান্নাফ*, সম্পাদনা: ফাহিম মুহাম্মদ শালদুত, (জিদ্দা: তারিখুল মদিনা, ১৩৯৯ হি.), খ. ৫, পৃ. ৩১১, হাদিস নং- ২৬৪০৯।

[২] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্‌ন আশ'আস আল সাজিসতানি, *সুনানু আবি দাউদ*, (বৈরুত: মাকতাবাহ আল আসরিয়্যাহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, তা/বি.) খ. ৩, পৃ. ৩৪৫, হাদিস নং- ৩৭৬১।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ،

"নিদ্রা হতে জাগ্রত হবার পর পাত্রে হাত রাখার পূর্বে তোমার হাত ধুয়ে নাও। কেননা তোমার ঘুমন্তাবস্থায় এ হাত কোথায় বিচরণ করেছে তুমি তা জানো না"।[১]

মুখগহ্বর ও দাঁতের ফাঁক-ফোকরে আটকে থাকা অবশিষ্ট খাদ্যকণা বের করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُتَخَلِّلُونَ؟ قَالَ: الْمُتَخَلِّلُ مِنَ الْوُضُوءِ: أَنْ تَتَخَلَّلَ أَصَابِعَكَ وَأَسْنَانَكَ، وَالْمُتَخَلِّلُ مِنَ الطَّعَامِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى الْمَلَكِ الَّذِي مَعَ الْعَبْدِ أَنْ يَجِدَ مِنْ أَحَدِكُمْ فَيْحَ الطَّعَامِ،

"খিলালকারীগণ কতই না চমৎকার! সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! খিলালকারী কারা? তিনি উত্তর দিলেন, অযু করার সময় যে আঙ্গুল ও দাঁত খিলাল করে এবং আহার করার পর দাঁত খিলাল করে। কেননা বান্দার সঙ্গে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের নিকট দাঁতের ফাঁকে ও মুখ-গহ্বরের খাদ্যের দুর্গন্ধ অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও অসহ্য মনে হয়।"[২]

হোম কোয়ারেন্টাইন

নিরাপদ জীবন ও একাকিত্ব যাপন ভাইরাসের বিস্তৃতি রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মাধ্যম হিসেবে আধুনিক বিশ্ব লকডাউন ও হোম কোয়ারেন্টাইন এর মতো অত্যাধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

---

[১] মালিক ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমির আসবাহি, *মুয়াত্তা*, সম্পাদনা, মুহাম্মদ মুস্তফা আ'জামি, (আবু দাবি: মুয়াস্‌সাসাহ যায়দ ইব্‌ন সুলতান আলে নাহয়ান, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২১, হাদিস নং- ৯।

[২] ইব্‌ন আবি শাইবা, আবু বকর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহিম, *মুসান্নাফ*, সম্পাদনা: ফাহিম মুহাম্মদ শালদুত, (জিদ্দা: তারিখুল মদিনা, ১৩৯৯ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৩, হাদিস নং- ১৩।

সাধারণ ছুটি ঘোষণার মাধ্যমে সরকার জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মার্কিন গবেষণা জার্নাল 'নিউজ উইক' এর প্রতিবেদনে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস রাজ্যের গবেষক ড. কেরি কনসিডাইন বলেন, "হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন হোম কোয়রেন্টাইন এর প্রথম উদ্ভাবক"। এটি মহামারি মোকাবেলায় ইসলামের সতর্কতামূলক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলামের মূল দর্শন হলো, 'নিজেকে বিপদমুক্ত রাখা ও অপরের বিপদের কারণ না হওয়া'। খলিফা উমার (রাদি.) এর খেলাফতকালে ফিলিস্তিনে 'আমওয়াস' নামক মহামারি দেখা দিলে আমর ইবনুল আস (রাদি.) জনসমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে 'হোম কোয়ারেন্টাইন' সিস্টেমটি প্রথম বাস্তবায়ন করেন। নিরাপদ জীবন যাপনের লক্ষে আক্রান্ত রোগীদের তিনি পাহাড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, "মহামারির এই ভাইরাস কোথাও দেখা দিলে তা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে"। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বাস্থ্যবিধি ছিল বর্তমান কালের চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকেও হাজার গুণ আধুনিক। তিনি শুধুমাত্র শারীরিক দূরত্ব নয়; মহামারি আক্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রেও দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

كَلِّمِ المَجْذُومَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَدْرُ رُمْحٍ أَو رُمْحَيْنِ

"মহামারি আক্রান্ত ব্যক্তি ও তোমার মাঝে এক বর্শা বা দুই বর্শা পরিমাণ দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলো"।[১]

মোসাফাহা ও করমর্দন থেকে বিরত থাকা

মহামারি মোকাবেলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার স্বার্থে পারস্পরিক করমর্দন নিরুৎসাহিত করা হয়। ইসলামে জনসস্বার্থ বিবেচনায় ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দেয়ার অনেক নজির রয়েছে। দু'জন মুমিন ভাইয়ের পারস্পরিক সাক্ষাতের ফজিলত সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

"দুইজন মুসলমান পারস্পরিক সাক্ষাতের পর মোসাফহার করলে, পৃথক হবার

---

১ ইসফাহানি, আবু নুআইম আহমদ ইব্ন আবদিল্লাহ, *আল তিব আল নাবাভি*, (বৈরুত: দারু ইব্ন হাযম, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৫৫, হাদিস নং- ২৯২।

পূর্বেই উভয়ের গুনাহ মাফ হয়ে যায়”।[১]

হাতের উপর হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করা ইসলামের চিরাচরিত রীতি। কিন্তু মহামারি সংক্রমণের আশঙ্কায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নিয়ম শিথিল করেছেন। সাকিফ গোত্রের মাহামারি আক্রান্ত একজন ব্যক্তিকে হাতের উপর হাত না রেখেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইয়াত করান। সহিহ মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে,

كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ

“সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি দলে একজন ভাইরাস আক্রান্ত লোক ছিল। তার নিকট রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোক মারফত খবর পাঠালেন যে, তোমার বাইয়াত সম্পন্ন হয়ে গেছে। তুমি এখন যেতে পারো”।[২]

হাঁচি দেয়ার সময় মুখে টিস্যু বা রুমাল ব্যবহার করা

হাঁচি আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। হাঁচি শারীরিক অবসাদ দূর করে মানসিক প্রফুল্লতা আনে। এ নেয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁচি দেয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ বলতেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করে, একবার হাঁচির সাথে শরীর থেকে তিন হাজার রোগব্যাধি দূরিভূত হয়। একটি রোগের চিকিৎসার জন্য যেখানে অনেক লোক তিন হাজার টাকা ব্যয় করে, সেখানে তিন হাজার রোগের উপশম হওয়ার কারণে একবার আলহামদুলিল্লাহ বলে শুকরিয়া আদায় করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। হাদিসের কিতাবসমূহে হাঁচি দেয়ার বিস্তারিত নিয়ম-কানুন বিবৃত হয়েছে। কেবলমাত্র মহামারি থেকে বেঁচে থাকার জন্যই নয়; রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা জনস্বার্থ বিবেচনায় হাঁচি দেয়ার সময় কাপড় দিয়ে মুখে ঢেকে রাখতেন এবং শালীনতা রক্ষায় হাঁচির আওয়াজ ক্ষীণ রাখার পরামর্শ দিতেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا عَطَسَ وَضَعَ

---

[১] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্ন আশ'আস আল সাজিসতানি, *সুনানু আবি দাউদ*, (বৈরুত: মাকতাবাহ আল আসরিয়্যাহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, তা/বি.) খ. ৪, পৃ. ৩৫৪, হাদিস নং- ৫২১২।

[২] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ. ৪, পৃ. ১৭৫২, হাদিস নং- ২৩৩১।

يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ، وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ» شَكَّ يَحْيَى

"আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁচি দেয়ার সময় নিজের হাত অথবা কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে রাখতেন এবং হাঁচির স্বর ছোট রাখার চেষ্টা করতেন"।[১]

দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করা

অসুস্থ হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ইসলামের একটি বাস্তবসম্মত বিধান। তিনি অসুস্থ ব্যক্তিদের সেবা করার জন্য তাদের বাসস্থানে উপস্থিত হতেন এবং চিকিৎসা গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলতেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা রোগ সৃষ্টি করেছেন এবং সকল রোগের প্রতিষেধক আবিস্কার করেছেন"।

عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا أَتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى فُؤَادِي فَقَالَ: «إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْئُودٌ، ائْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ أَخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيَلُدَّكَ بِهِنَّ

"সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদি.) বর্ণনা করেন, একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন, তিনি আমার বুকে নিজ হাত রাখলেন, তাঁর হাতের স্নিগ্ধ পরশে আমি অন্তরের শীতলতা অনুভব করলাম। তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, আপনি হৃদরোগে আক্রান্ত। সাকিফ গোত্রের হারিস বিন কালদার চিকিৎসা গ্রহণ করা আপনার জন্য বাঞ্ছনীয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে তার দক্ষতা ভালো। সে মদিনার সাতটি 'আজওয়া' খেজুর বিচুর্ণ করে দুধ অথবা ঘি দ্বারা মিশ্রিত করে রোগীকে সেবন করায়।[২]

পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা ও আঙিনা পরিস্কার রাখা

মহামারির প্রাদুর্ভাব থেকে পরিত্রাণের লক্ষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[১] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্‌ন আশ'আস আল সাজিসতানি, *সুনানু আবি দাউদ*, (বৈরুত: মাকতাবাহ আল আসরিয়্যাহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, তা/বি.), খ. ৪, পৃ. ৩০৭, হাদিস নং-৫০২৯।

[২] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্‌ন আশ'আস আল সাজিসতানি, *সুনানু আবি দাউদ*, (বৈরুত: মাকতাবাহ আল আসরিয়্যাহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, তা/বি.), খ. ৪, পৃ. ৭, হাদিস নং-৩৮৭৫।

শুধুমাত্র শারীরিক পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি পরিবেশ-প্রতিবেশের পরিচ্ছন্নতার প্রতিও সমান উৎসাহ প্রদান করতেন। আবু মূসা আশআরি (রাদি.) বলেন, আমাকে আমিরুল মুমিনিন উমার (রাদি.) রাস্তা-ঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الجُودَ، فَنَظِّفُوا، أُرَاهُ قَالَ، أَفْنِيَتَكُمْ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ

"আল্লাহ তায়ালা পবিত্র; তিনি পবিত্রতা পছন্দ করেন। তিনি পরিচ্ছন্ন; পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসেন। তিনি দয়ালু; দয়া ও অনুগ্রহকে ভালোবাসেন। তিনি বদান্য; বদান্যতা পছন্দ করেন। অতএব তোমরা আঙ্গিনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখো এবং ইহুদিদের মতো হয়ো না।[১]

জনসমাবেশে থুথু ফেলা ও মসজিদ পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

"মসজিদে থুথু নিক্ষেপ মারাত্মক পাপ। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো এ থুথু বাইরে ফেলে দেয়া।"[২]

আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

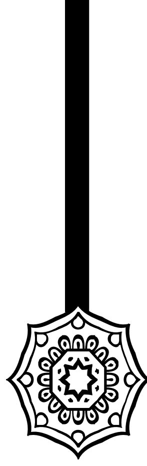
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এগুলো সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।



---

[১] তিরমিযি, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযি*, (বৈরুতঃ দারুল গারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪০৯, হাদিস নং- ২৭৯৯।

[২] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ১, পৃ. ২২৯, হাদিস নং- ৪০৪।



নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার ও আত্মরক্ষার অধিকার

ভারতে মুসলিম নিধনের ইতিহাস বেশ পুরনো। বিজেপি সরকারের ক্ষমতারোহণের পর এর মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনদিন। 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিয়ে তারা প্রতিনিয়ত হত্যা করছে মুসলিম নারী-পুরুষদের। মুসলিম নারীদের হিজাব পৌত্তলিক ভারতীয়দের গাত্রদাহের অন্যতম কারণ। নারীর সম্ভ্রম রক্ষার প্রধান হাতিয়ার হিজাব গোটা ভারতে নিষিদ্ধ করতে চায় এ উগ্র হিন্দুবাদী গোষ্ঠী। বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রেও ইসকনের প্রেতাত্মাদের হীন তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। এ দেশের কিছু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও মাঝে-মধ্যে হিন্দুত্ববাদের অনুকরণে হিজাব নিষিদ্ধ করার স্পর্ধা দেখায়। হিজাব নিষিদ্ধের অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে দুর্বল ঈমানের অধিকারী নারীদের বর্তমান সময়ের মডেল কর্ণাটকের কলেজছাত্রী 'মুসকান'। অদম্য শৌর্যবীর্য ও দুর্দান্ত সাহসের অধিকারী এই নারী 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি তুলে যে প্রতিরোধের সূচনা করেছে, তা কেবল বিশ্বের মুসলিম নারীদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তাই নয়; তাবৎ পৃথিবীর বাতিল শক্তির বুকে কম্পনও সৃষ্টি করেছে। নারী অধিকার রক্ষায় সাহসী ভূমিকার

কারণে সোস্যাল মিডিয়ায় প্রশংসায় ভাসছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রতীক কর্ণাটকের এই শীর্ণকায় মুসলিম নারী। 'আল্লাহু আকবার' কী শুধুমাত্র প্রতিরোধের ভাষা? কেবল প্রতিবাদমূলক স্লোগান? আত্মরক্ষার অবলম্বন? মুসলিম আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার জীবনে এই বাক্যের তাৎপর্য, ব্যবহার, শক্তি ও প্রয়োগ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে বক্ষমাণ প্রবন্ধে।

'আল্লাহু আকবার': তাৎপর্য ও প্রয়োগ

ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে 'আল্লাহু আকবার' বাক্যটি নানামাত্রিক অর্থ ও ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে। মুসলিম জাগরণের কবি ড. ইকবাল বাক্যটির অর্থগত ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন,

الفاظ ومعانی میں تفاوت نہیں لیکن

ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور

پرواز ہے دونوں کا اسی ایک فضا میں

کرگس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور

"শব্দ ও অর্থগতভাবে 'আল্লাহু আকবার' বাক্যে কোনো পার্থক্য না থাকলেও মোয়াজ্জিনের আযান ও মুজাহিদের আযানের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। গিরগিটি ও ইগল একই আকাশে বিচরণ করলেও ইগল যত দ্রুত উপরে উঠতে পারে গিরগিটি তা পারে না"।

শোকর, আত্মরক্ষা, সম্মান প্রদর্শন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাসহ বহুমুখী অর্থের সমাহার 'আল্লাহু আকবার' বাক্যটি । وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়ত লাভ করার বিনিময়ে তাঁর মহত্ত্ব বর্ণনা করো এবং তাঁর শোকর আদায় করো) আয়াতে বাক্যটি শোকর অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। খাইবার যুদ্ধের প্রাক্কালে সাহাবায়ে কেরাম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ইহুদিদের অনুরূপ একটি বৃক্ষ নির্ধারণের আবেদন জানান। যেখানে তারা অস্ত্র টাঙ্গিয়ে বৃক্ষটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতো। কতিপয় ব্যক্তির এমন আবেদনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলেন,

الله أكبر؛ إنها السنن، قلتم ـ والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى

"তোমরা এমন একটি প্রথা চালু করার আবেদন করেছো, যে আবেদন মূসা (আ.) এর নিকট বনি ইসরাইল করেছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বাক্যটি আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ব্যবহার করেছেন।"

জাহেলি সমাজে মুশরিকগণও তাদের দেব-দেবীদের সম্মানার্থে বাক্যটি উচ্চারণ করতো। আউস ইব্ন হাজার নিম্নের পংক্তিতে মুশরিকদের বড় মূর্তি 'হুবাল' এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষে বাক্যটি ব্যবহার করে।

وَبِاللاّتِ والعُزّى ومَن دانَ دينَها
وبالله إنّ الله مِنهُنّ أكْبَرُ

'আল্লাহু আকবার' একটি শক্তিবর্ধক, অনুপ্রেরণাদায়ক ও মধুময় বাক্য। এই বাক্যের তাৎপর্য ব্যাখায় ইমাম ইব্ন হাজার আসকালানি (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন,

ذكرٌ مأثورٌ عند كل أمرٍ مهُول، وعند كل حادِثِ سُرورٍ، شُكرًا لله تعالى، وتبرئةً له من كل ما نَسَبَ إليه أعداؤُه

'আল্লাহু আকবার' ভয়ানক বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ যিক্র। নেয়ামতের শোক্র ও শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষার কৌশল"।[১]

ইমাম ইব্ন তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হি.) 'আল্লাহু আকবার' বাক্যের বহুবিধ তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলেন,

التَّكْبِيْرُ يُشْرَعُ لِدَفْعِ الْعَدُوِّ مِنْ شَيَاطِيْنِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالنَّارِ الَّتِيْ هِيَ عَدُوٌّ لَنَا

"আল্লাহু আকবার বাক্যটি জ্বিন-ইনসানের অনিষ্ট ও শয়তানের উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার মোক্ষম হাতিয়ার। ক্ষতিকর আগুন থেকেও এটি সুরক্ষা দেয়"।[২]

---

[১] আসকালানি, আবুল ফজল আহমদ ইব্ন আলি ইব্ন হাজার, *ফতহুল বারি*, (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯ হি.), খ. ২, পৃ. ৪৩৮।

[২] ইব্ন তাইমিয়া, আবুল আব্বাস তাকিউদ্দিন আহমদ ইব্ন আবদুল হালিম, মাজমু'উল ফাতাওয়া, (সম্পাদনা: আবদুর রহিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম, (মদিনা মুনাওয়ারা:মাজমা'উল মালিক ফাহ্দ, ১৪১৬ হি/১৯৯৫), ফতোয়া নং- ২৩০।

'আল্লাহু আকবার' মুমিন জীবনের প্রথম ও শেষ বাক্য। সকাল-সন্ধ্যার নৈমিত্তিক যিক্‌র। অনন্ত প্রেরণার উৎস ও অফুরন্ত শক্তির আধার। এই কালিমা প্রথম উচ্চারণ করেন জিবরিল (আ.)। পিতা ইবরাহিম (আ.) কর্তৃক পুত্র ইসমাইলকে (আ.) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি করার প্রাক্কালে আল্লাহ তা'য়ালা ইসমাইলকে (আ.) জবাই করার পরিবর্তে বেহেশত থেকে একটি মেষ প্রেরণ করেন। আনন্দের আতিশয্যে জিবরিল (আ.) সর্বপ্রথম এই কালিমা পাঠ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। ফেরেশেতার 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি শুনে ইসমাইল (আ.) বারবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে থাকেন। পরবর্তীতে ইবরাহিম (আ.) 'আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ' বলে আল্লাহর শোক্‌র আদায় করেন। পিতা-পুত্র ও ফেরেশেতার যৌথ বাক্যটিই প্রতি বছর জিলহজ্ব মাসে প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষ 'তাকবিরে তাশরিক' হিসেবে আদায় করে আসছে।

قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (ওঠো, ভয় দেখাও, এবং তোমার রবের মহত্ত্ব ঘোষণা করো) আয়াতটি নাযিল হবার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আল্লাহু আকবার' বলে আল্লাহর হুকুম তামিল করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বাক্যটি শুনে খাদিজাও (রাদি.) তাকবির বলে রসূলের অনুসরণ করেন। ইমাম কুরতুবি (৬১০-৬৭১ হি.) বলেন, 'আল্লাহু আকবার' বাক্যটিই ইসলামে উচ্চারিত প্রথম কালিমা ও যিক্‌র। পরবর্তীতে আযানের প্রাথমিক বাক্য হিসেবে কালিমাটি অন্তর্ভুক্ত হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় বাক্য চারটি।[১]

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ

তিনি আরো ইরশাদ করেন, তাকবির ধ্বনির মাধ্যমে আসমানের দ্বারসমূহ খুলে যায়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত, একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেছনে নামায আদায়ের সময় এক ব্যক্তি এই বাক্য উচ্চারণ করেন,

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

---

[১] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ. ৩, পৃ. ১৬৮৫, হাদিস নং- ২১৩৭।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, এই বাক্যটি কে বলেছে? জনৈক ব্যক্তি বলল, আমি, হে আল্লাহর রসূল!। তিনি বললেন, আমি অবাক হয়েছি, এই বাক্যের কারণে আসমানের দরজাসমূহ খুলে গেছে। ইব্‌ন উমার (রাদি.) বলেন, একথা শোনার পর থেকে আমি কখনো বাক্যটির আমল ছেড়ে দেয়নি। অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে,

التَّسْبِيحُ نِصْفُ المِيزَانِ، وَالْحَمْدُ يَمْلَؤُهُ، وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

"একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলার কারণে মিযানের অর্ধেক পূণ্যে ভরে যায়। 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার সওয়াবে গোটা মিযান ভর্তি হয়ে যায়। 'আল্লাহু আকবার' বলার কারণে আসমান-যমিনের মধ্যবর্তী খোলা জায়গা পূর্ণ হয়ে যায়।"[১]

শত্রু মোকাবেলায় 'আল্লাহু আকবার'

শত্রু মোকাবেলায় 'আল্লাহু আকবার' স্লোগানের ইতিহাস ইসলামের প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা থেকেই। যুদ্ধের মাঠে বাতিলের মোকাবেলায় 'আল্লাহু আকবর' স্লোগানটির ব্যবহার বহুলপ্রচলিত। সর্বপ্রথম উহুদের যুদ্ধে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ স্লোগানটি ব্যবহার করে তার বাস্তব প্রয়োগ করেন। উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় দেখে মুশরিকনেতা আবু সুফ্‌য়ান (اعل هبل) 'আমাদের প্রধান দেবতা 'হুবাল' এর বিজয় হোক' মর্মে স্লোগান দিতে শুরু করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম الله أعلى وأجل বলে সাহাবায়ে কেরামকে একত্ববাদের চিরন্তন বিজয়ের পাল্টা স্লোগান তোলার নির্দেশ দেন। খন্দকের যুদ্ধে একটি প্রস্তরখণ্ড মুসলিম বাহিনীর খননকাজে প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দেয়। পাথরটি অপসারণে সাহাবায়ে কেরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করেও ব্যর্থ হন। এক পর্যায়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে কুড়াল নিয়ে পাথরে আঘাত করতেই এটি বিচুর্ণ হয়ে যায়। অমনি তিনি বলে উঠলেন, 'আল্লাহু আকবর! পারস্যের ধনভাণ্ডারের চাবিকাটি আমার হস্তগত হয়ে গেছে' (اللهُ أَكْبَرُ، أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ)। এখানে বাক্যটি নেয়ামত লাভের পর আনন্দ প্রকাশের

[১] তিরমিযি, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযি*, (বৈরুতঃ দারুল গারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৪২০, হাদিস নং- ৩৫১৯।

জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। খাইবারে মুসলিম বাহিনীর অভিযানের প্রাক্কালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "আল্লাহু আকবার' খাইবারের পতন হয়েছে" (اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ) মর্মে স্লোগন দেন। রণাঙ্গণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রসূলের পবিত্র যবান থেকে শেখা এই বাক্যটি সাহাবায়ে কেরাম যথাযথ প্রয়োগ করেন। ১৪ হিজরিতে পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয় কাদেসিয়ার যুদ্ধ। সেনাপতি সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রাদি.) মুসলিম বাহিনীর সাহসদান ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি তোলেন। ২১ হিজরিতে সংঘটিত 'নেহাওয়ান্দ' যুদ্ধেও সেনাধ্যক্ষ নু'মান ইব্ন মুকরিন এ স্লোগান ব্যবহার করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে 'আল্লাহু আকবার' স্লোগান সংক্রান্ত সহিহ বুখারির (بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرْبِ) একটি শিরোনামের কারণে বাক্যটির ব্যবহার ও প্রয়োগ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

'আল্লাহু আকবার' বাক্যটি মুমিন নারী-পুরুষের জীবনের অবধারিত অংশ। নামাযসহ প্রাত্যহিক ইবাদতে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে মুমিনের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। কুরআন-হাদিসের আলোকে যে সকল কাজে 'আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নাহ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. নামাযে ৪৫৭ বার 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়

তাকবিরে তাহরিমা 'আল্লাহু আকবার' বলেই নামাযের সূচনা। রুকু থেকে ওঠা ব্যতীত নামাযের প্রতিটি রুকনের পরিবর্তনে গুঞ্জরিত হয় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি। নামাযের প্রস্তুতিপর্বে আযান ও ইকামতে একাধিকবার 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিত হয়। নামাযের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শরি'য়তের বিধানসমূহে জমহুর আলিমদের মতে ৪৪৭ বার এবং হানাফি মাযহাবের আলিমদের মতে ৪৫৭ বার 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারিত হয়। ফরজ নামাযে উচ্চারিত হয় ৯৪ বার। এর ব্যাখ্যায় ইমাম নবভি (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, দুই রাকাতবিশিষ্ট নামাযে ২১ বার। প্রতি রাকাতে তাকবিরে তাহরিমাসহ ৬ বার। তিন রাকাতবিশিষ্ট নামাযে ২৭ বার। তাকবিরে তাহরিমা, প্রথম তাশাহ্হুদ থেকে উঠার তাকবির এবং প্রতি রাকাতে ৫ বার। চার রাকাতবিশিষ্ট নামাযে ২২ বার। সুতরাং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মোট ৯৪ বার। সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও বিত্‌রসহ মোট ১৩৮ বার। আযানের বাক্য জমহুর আলিমের মতে ২০ টি। হানাফি মাযহাবে ৩০ টি।

ইমাম নববি (রহ.) বলেন[১]

فَفِيْ كُلِّ صَلاةٍ ثَنَائِيَّةٍ إِحْدٰى عَشَرَةَ تَكْبِيْرَةً؛ وَهِيَ: تَكْبِيْرَةُ الْإِحْرَامِ وَخَمْسٌ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ، وَفِي الثُّلَاثِيَّةِ سَبْعَ عَشَرَةَ تَكْبِيْرَةً؛ وَهِيَ: تَكْبِيْرَةُ الْإِحْرَامِ، وَتَكْبِيْرَةُ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَخَمْسٌ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ، وَفِيْ الرُّبَاعِيَّةِ إِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ. فَفِي الْمَكْتُوْبَاتِ الخَمْسِ: أَرْبَعٌ وَتِسْعُوْنَ تَكْبِيْرَةً

২. চাঁদ দেখার সময়

নতুন মাসের চাঁদ দৃষ্টিগোচর হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের দোয়া পাঠ করতেন। যে দোয়ার প্রথম অংশ হলো 'আল্লাহু আকবার'।[২]

اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنا بالأَمْنِ والإِيْمَانِ والسَّلامَةِ والإِسلامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبُّنا وَرَبُّكَ اللهُ

৩. জিলহজ মাসের প্রথমার্ধে

জিলহজ মাস মুসলিম জাতির পূর্বপুরুষ ইবরাহিম ও আলে ইবরাহিমের স্মৃতিচারণের মাস। এ মাসের নয় তারিখ হজ ও দশ তারিখ কুরবানিসহ অন্যান্য 'মানাসিকুল হজ' আদায় করে তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মানসূচক শরি'য়তের বিধি-বিধান পালন করা হয়। এ সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো তাকবির বলা। জিলহজের প্রথম দশ দিন অধিকহারে তাকবির বলা একটি মাসনূন আমল। নয় তারিখ ফজর থেকে তেরো তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের উপর এ তাকবির বলা ওয়াজিব। তদুপরি কঙ্কর নিক্ষেপ, মিনা থেকে আরাফাতে যাওয়া ও তাওয়াফ করার সময়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ আমল হলো তাকবির বলা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

---

[১] নববি, আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দিন য়াহয়া ইব্ন শরফ, *আল মিনহাজ শারহু সহিহ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, (বৈরুত: দারু ইহয়া আল তুরাসিল আরবি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯২ হি.), খ. ৪, পৃ. ৯৮।

[২] বাইহাকি, আহমদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলি ইব্ন মুসা, *আল দা'ওয়াতুল কাবির*, সম্পাদনা: বদ্র ইবন আবদুল্লাহ আল বদ্র, (কুয়েত: গারাস লিন নাশরি ওয়াত তাওযি, ২০০৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১২৪, হাদিস নং- ৫১৯।

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ؛ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ والتحميد

"নেক আমল করার জন্য আল্লাহর নিকট জিলহজ মাসের দশ দিনের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ট কোনো দিন নেই। সুতরাং এ দিনসমূহে অধিকহারে আল্লাহর তাহলিল, তাকবির ও তাহমিদ বর্ণনা করো।"[১]

৪. দুই ঈদের নামাযে

ঈদুল আযহার নামায জিলহজ মাসের একটি আনুসঙ্গিক আমল। শা'বান মাসের প্রথম তারিখ ঈদুল ফিতর। এই দুই নামাযে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবির বলা ওয়াজিব। রমজান মাসে সিয়াম, কিয়াম ও লাইলাতুল কদর পালন করার শুকরিয়াস্বরূপ ঈদুল ফিত্‌র পালন করা হয়। শা'বানের চাঁদ দেখার পর থেকে ঈদের সালাত আদায় করে বাড়িতে ফেরা পর্যন্ত তাকবির বলে আল্লাহর মহত্ত্ব আদায় করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে তা'য়ালা বলেন,

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾

"যাতে তোমরা গণনা পূর্ণ করতে পারো এবং হেদায়ত দান করার দরুন আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা করো"।[২]

৫. যানবাহনে আরোহণ ও সফরে বের হওয়ার সময়

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে বের হওয়ার সময় যানবাহনে আরোহণকালে আলহামদুলিল্লাহ বলতেন। অতঃপর سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ বলতেন। এরপর বলতেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ। অতঃপর এই দোয়া পাঠ করতেন,

سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْت،

---

[১] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদ*, (রিয়াদ: মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, ১৪২১ হি./ ২০০১ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ২৯৬, হাদিস নং- ৬১৫৪।
[২] আল কুরআন, ২:১৮৫।

অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে বের হওয়ার সময় উটে আরোহণ করে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন।[১]

৬. উপরে উঠার সময়

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঁচু স্থানে আরোহণ করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে এ বিষয়ে নির্দেশনা দিতেন। তিনি মুসাফিরকে উদ্দেশ করে বলতেন,

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ

> "তুমি অবশ্যই তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং উঁচু স্থানে আরোহণ করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবে"।[২]

৭. পশু জবাই করার সময়

পশু জবাই করার সময় আল্লার নাম নিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলা জরুরি। অন্যথায় জবাইকৃত পশু কোনো মুসলিমের জন্য হালাল বলে গণ্য হয় না। আনাস (রাদি.) বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর নাম নিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করতে দেখেছি।[৩]

ويقول بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

৮. সুসংবাদ ও আনন্দদায়ক খবর শুনে

আনন্দদায়ক খবর শোনার পর সাহাবায়ে কেরাম 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। আবু সাঈদ খুদরি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ " فَكَبَّرْنَا، فَقَالَ:

---

[১] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্ন আশ'আস আল সাজিসতানি, *সুনানু আবি দাউদ*, (বৈরুত: মাকতাবাহ আল আসরিয়্যাহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, তা/বি.) খ. ৩, পৃ. ৩৪, হাদিস নং- ২৬০২।

[২] তিরমিযি, মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযি*, (বৈরুত: দারুল গারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩৭৭, হাদিস নং- ২৪৪৫।

[৩] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ. ৩, পৃ. ১৫৫৭, হাদিস নং- ১৯৬৬।

«أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ» فَكَبَّرْنَا، فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ» فَكَبَّرْنَا،

"সেই সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। আমি আশা করি, তোমরা হবে জান্নাতের এক তৃতীয়াংশ। এ কথা শোনার পর আমরা 'আল্লাহু আকবার' বললাম। তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি, তোমরা হবে জান্নাতের এক চতুর্থাংশ। এ কথা শোনার পর আমরা আবার 'আল্লাহু আকবার' বললাম। তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি, তোমরা হবে জান্নাতের অধিবাসীদের মধ্যে অর্ধেক। আমরা আবারো 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলাম"।[১]

৯. আগুন নির্বাপনের জন্য

কোথাও আগুন ধরে গেলে পানি দ্বারা তা নেভানোর চেষ্টা করা আমাদের প্রচলিত নিয়ম। বিদ্যুৎস্পৃশ্য ব্যক্তিকে পানি দ্বারা রক্ষা করার চেষ্টা হিতে বিপরীত হয় । মানুষের চেষ্টা বৃথা প্রমাণিত হলে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি যে কোনো আগুন থেকে মানুষের জানমাল রক্ষা করতে পারে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَرِيقَ فَكَبِّرُوا، فَإِنَّ التَّكْبِيرَ يُطْفِئُهُ

"কোথাও আগুন ধরলে তাকবির ধ্বনি দাও। কেননা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি আগুন নিভিয়ে দেয়।"[২]

১০. ইসতেস্কার নামাযের সময়

অতিষ্ঠ গরম ও অনাবৃষ্টির কারণে আদায়কৃত নাামযকে 'সালাতুল ইসতেস্কা' বা বৃষ্টি প্রার্থনার নামায বলে। এটি একটি মাসনূন নামায। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ থেকে এটির উপর মুসলিম উম্মাহ আমল করে আসছে। বর্তমানে এ সুন্নাত অনেকটা পরিত্যাজ্য। এই নামাযে 'আল্লাহু আকবার' বলার বিধান হাদিসে বর্ণিত রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِيهَا سَبْعًا وَخَمْسًا كَالْعِيدِ وَيَقْرَأُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، و هَلْ أَتَاكَ

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫/২০০৪), খ. ৪, পৃ. ১৩৮, হাদিস নং-৩৩৪৮।

[২] তাবরানি, আবুল কাসিম সোলাইমান ইব্ন আহমদ ইব্ন আইয়ুব, *আল দু'য়া*, (কায়রো: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৩ হি.), খ. ১, পৃ. ৩০৭, হাদিস নং- ১০০২।

حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি প্রার্থনার নামাযে ঈদের নামাযের ন্যায় পাঁচবার/সাতবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ও هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ পড়তেন।"[১]

১১. সদ্যপ্রসূত সন্তানের কানে

সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তার ডান কানে আযান দেয়া সুন্নাত। বাম কানে ইকামত দেয়ার কথাও বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেন, সন্তানের কানে আল্লাহর মহত্ত্ববাচক তাকবির ধ্বনির মাধ্যমে শিশুকে ইসলামি শিক্ষায় দীক্ষিত করে তোলা হয়। শিশুর জীবনে এ কালিমার প্রভাব বহুমুখী। ইব্‌ন আবি রাফি' তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন,

عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ،

"হাসান ইব্‌ন আলি (রাদি.) এর জন্মের পর আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার কানে নামাযের মতো আযান দিতে দেখেছি"।[২]

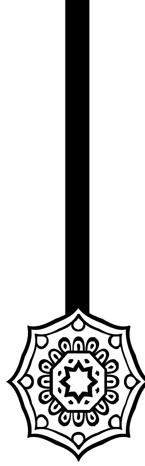
১২. জানাযার নামাযে

জানাযার নামায মুসলিম নর-নারীর জীবনের সর্বশেষ বিদায় সংবর্ধনা। ভূমিষ্টের পর সন্তানের ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিয়ে তাওহিদের যে বীজ বপন করা হয়েছিল, তারই চূড়ান্ত বাস্তবায়ন হলো এই নামায। মুসলমানদের উপর এই নামায ফরজে কেফায়া। কিয়াম করা ও চারবার 'আল্লাহু আকবার' বলা এই নামাযের ফরজ।



[১] দারা কুতনি, আবুল হাসান আলি ইব্‌ন উমার আল বাগদাদি, *সুনানু দারা কুতনি*, (বৈরুত, মুয়াসসাসাহ আল রিসালা, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি), খ. ২, পৃ. ৪২২, হাদিস নং- ১৮০০।

[২] তিরমিযি, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযি*, (বৈরুতঃ দারুল গারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৩, পৃ.১৪৯, হাদিস নং- ১৫১৪।



বিশ্ব জগতের শৃঙ্খলা বিন্যাসে বায়তুল্লাহ'র অধিকার

নিউটন একদা বাগানে বসে চিন্তা করছিলেন। অকস্মাৎ গাছ থেকে একটি আপেল মাটিতে ঝরে পড়লো। তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লেন। বৃক্ষের চারপাশে এতো বিস্তৃত জায়গা থাকা সত্ত্বেও আপেলটি মাটিতে কেন পড়লো? নিশ্চয় পৃথিবীর এমন কোনো আকর্ষণ শক্তি আছে, যার ফলে আপেলটি মাটিতে ঝরে পড়েছে। অমনি তিনি একটি সূত্র আবিস্কার করে ফেললেন। বিজ্ঞানে যা 'মহাকর্ষ' বলে পরিচিত।

পৃথিবীর এ আকর্ষণশক্তির মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো মক্কা নগরীতে অবস্থিত বাইতুল্লাহ। যাকে কেন্দ্র করে মহাবিশ্ব আবর্তিত হয়। আল্লাহ তায়'ালা বলেন,

﴿انَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾

"ভূখণ্ডের সর্বপ্রথম নির্মিত বরকতময় স্থাপনা হলো মক্কা নগরীতে। এতে রয়েছে বিশ্ব জগতের সার্বিক দিক নির্দেশনা।"[১]

---

[১] আল কুরআন, ৩;৯৬।

বাইতুল্লাহর এমন একটি অলৌকিক শক্তি রয়েছে, যার ফলে মুসলিম মানস বারবার এ দিকে আকৃষ্ট হয়। নিউটনের থিওরিতে এ আকর্ষণশক্তিকে ‘অভিকর্ষ বলে। ইবরাহিম (আ.) স্বীয় স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র ইসমাইলকে মক্কার নির্জন মরুভূমিতে নির্বাসন দেয়ার প্রাক্কালে বাইতুল্লাহর এ অভিকর্ষ শক্তির জন্য আল্লাহর নিকট দু‘য়া করেছিলেন। আল কুরআনের ভাষায় ইবরাহিম (আ.) এর দু‘য়াটি নিম্নরূপ-

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾

“হে আমাদের রব! আমি আমার কিছু বংশধরকে আপনার সম্মানিত গৃহের নিকট মরুভূমির একটি উপত্যকায় বসবাসের জন্য রেখে গেলাম। হে আমাদের রব! তারা যেন নামায কায়েম করে এবং মানুষের অন্তর যেন তাদের নিকট আকৃষ্ট হয়। তাদেরকে ফল-মূল দ্বারা রিযিক প্রদান করুন। যেন তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে।”[১]

বিশ্বজগতের স্থিতি ও সঠিক দিক নির্ণয়ের লক্ষ্যে পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম স্থাপিত গৃহ মক্কা নগরীর বাইতুল্লাহ। যেখানে দৈনন্দিন রহমতের অজস্র ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। মহাবিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা এ গৃহের সমীহ, মর্যাদা ও স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল।

মূলত মহাবিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর অস্থিত্ব আল্লাহর যিক্‌র ও তার আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। যতোদিন জিন-ইনসান পৃথিবীতে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি অব্যাহত রাখবে, ততোদিন সৃষ্টিজগত তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে। মহাবিশ্বের গতি-প্রবাহ অক্ষুণ্ন থাকবে। চন্দ্র-সূর্য, আলো-বাতাস, জোয়ার-ভাটাসহ সমগ্র সৃষ্টিজগত নির্ধারিত ও সঠিক নিয়মে চলমান থাকবে। এতে ছেদ পড়লে মূহুর্তেই ধসে পড়বে মহাবিশ্বের বিন্যাস। ইমাম মুসলিম আনাস (রাদি.) থেকে বর্ণনা করেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى لا يُقالَ في الأرضِ اللهُ اللهُ

---

[১] আল কুরআন, ১৪;৩৭।

"পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ যিক্‌র অব্যাহত থাকা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না" [১]

কিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা বাইতুল্লাহকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উঠিয়ে নেবেন। কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত, মহাবিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾

"সপ্ত আসমান-যমিন ও তন্মধ্যবর্তী সবকিছু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। প্রতিটি বস্তু আল্লাহর প্রশংসাসহকারে তার তাসবিহ পাঠ করে। যদিও তাদের তাসবিহ পাঠ তোমাদের বোধগম্য নয়"। [২]

আল্লাহর এ তাসবিহ ও পবিত্রতার বর্ণনা বস্তুসমগ্রের ইবাদতের পাশাপাশি তাদের অস্তিত্বেরও রক্ষাকবচ। পরম দয়ালু আল্লাহ প্রতিটি অণু-পরমাণুকে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾

"আমাদের রব হলেন সে মহান সত্ত্বা, যিনি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করার পর তাদের টিকে থাকার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন"। [৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসির তাবারি'তে বর্ণিত আছে, ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন জুবাইর ও সুদ্দি বলেন, প্রতিটি বস্তুর সুষ্ঠু জীবন-প্রণালী অব্যাহত রাখার নিমিত্তে আল্লাহ তা'য়ালা স্বজাতীয় বিপরীত লিঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। তাদের বিয়ে-শাদি, পানাহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। হাসান বসরি বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য বেঁচে থাকার সকল কল্যাণকর পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

---

[১] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ১৩১, হাদিস নং- ১৪৮।

[২] আল কুরআন, ১৭;৪৪।

[৩] আল কুরআন, ২০;৫০।

﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾

"আপনার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করুন। যিনি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করার পর তাদের সুগঠিত করেছেন। তাদের দান করেছেন পরিমিতি এবং বাতলে দিয়েছেন বেঁচে থাকার উপায়"।[১]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে (هدي) 'দিকনির্দেশনা' এর ভাবার্থ হলো প্রতিটি বস্তুকে তাদের ভালো-মন্দের দিশা প্রদানপূর্বক আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেয়া। ন্যাচারাল টি.ভি.'র একটি ভিডিওতে দেখা যায়, সজারু সদৃশ একটি জন্তুর মুখাবয়ব ছাড়া সমগ্র অঙ্গ কাঁটাযুক্ত। একটি হিংস্র নেকড়ে মাঠে বিচরণরত জন্তুটির উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হলে, ক্ষুদ্র জন্তুটি তার কাঁটাযুক্ত পালক দিয়ে মুখ ঢেকে দেয়। আক্রমণোদ্যত বিশালদেহী ও শক্তিশালী বাঘটি ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যায়। অনেকবার চেষ্টার পরও সে নিরাশ হয়ে নিজের পথ ধরে। এভাবে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু নিজেদের আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে বাইতুল্লাহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

বিজ্ঞান প্রমাণ করে, মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু নির্দিষ্ট গতিপথে পরিচালিত। চন্দ্র-সূর্য তাদের নিজস্ব কক্ষপথে আবর্তিত হয়। বিজ্ঞানের এ সূত্র আল কুরআনের এ আয়াত থেকে গৃহীত।

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾

"সূর্য তার গতি-পথে পরিচালিত, এটি মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে। চন্দ্রের জন্যও আমি নিজস্ব কক্ষপথ নির্ধারণ করে রেখেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অবয়বে ফিরে আসে"।[২]

মহাবিশ্বের প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্র বিধিবদ্ধ নিয়মে নিত্য-চলমান। বাহ্য-দৃষ্টিতে চন্দ্র-সূর্যকে আমরা উদয়াস্তের আকৃতিতে দেখতে পেলেও তারা নিজস্ব কক্ষপথে

---

[১] আল কুরআন, ৮৭; ১-৩।

[২] আল কুরআন, ৩৬;৩৮-৩৯।

পরিচালিত হয় এবং নিজেদের কিবলা অভিমুখে ধাবিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সূর্যের উদয়াস্তের মূল কেন্দ্রস্থল হলো আল্লাহর আরশ। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সূর্যের যে কক্ষপথের কথা বলা হয়েছে, তা হলো আল্লাহর আরশ। এ আরশকে আবর্তন করেই সূর্য আবর্তিত হয়।

عن أَبِي ذرَ الغفاريّ، قال: كنت جالسا عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في المسجد، فلما غَرَبت الشمس، قال: يا أَبا ذَرّ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ الشَّمْسُ ؟ قلت الله ورسوله أعلم قال: فإنها تذهب فتسجد بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهَا ، ثُمَّ تَسْتَأْذِنُ بالرُّجُوعِ فَيُؤْذَنُ لَهَا ، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَكَانِهَا وَذَلِكَ مُسْتَقَرّها،

"আবু যর গিফারি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট মসজিদে বসা ছিলাম। সূর্য অস্ত যাবার সময় তিনি বললেন, হে আবু যর! তুমি কী জানো সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সূর্য স্বীয় বিচরণপথে আরশের নিচে গমন করে আল্লাহকে সিজদা করে। অতঃপর ফিরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করে এবং সে অনুমতিপ্রাপ্ত হয় । যেন তাকে বলা হলো, যেদিক থেকে এসেছো সেদিকে ফিরে যাও। তখন সূর্য যথাস্থান থেকে উদিত হয়। এটিই তার গতিচক্র ও কক্ষপথ"।[১]

রূহ আল্লাহর একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি ও তার হুকুমের আজ্ঞাবহ। যার বাস্তব পরিচয় নির্ধারণে আধুনিক বিজ্ঞান এখনো অপারগ। রুহ'ও তার নিজস্ব একটি কক্ষপথে সদা ধাবমান। আল্লাহর আরশকে কেন্দ্র করে এটির আবর্তন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমার ইব্ন আস (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْأَرْوَاحَ تَعْرُجُ بِهَا فِي مَنَامِهَا، وَتُؤْمَرُ بِالسُّجُودِ عِنْدَ الْعَرْشِ، فَمَنْ كَانَ طَاهِرًا سَجَدَ عِنْدَ الْعَرْشِ، وَمَنْ كَانَ

---

[১] তাবারি, আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্ন জারির, আল বায়ান ফি তাভিলিল কুরআন, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), খ. ২০, পৃ. ৫১৭।

لَيْسَ بِطَاهِرٍ سَجَدَ بَعِيدًا مِنَ الْعَرْشِ

"ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের রূহ আল্লাহর আরশের দিকে উত্থিত হয়। তাকে আরশের নিচে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়। রূহ পবিত্রাবস্থায় দেহ থেকে নির্গত হলে, আরশের নিকট সিজদা করার তাওফিক লাভ করে। পবিত্রাবস্থায় নির্গত না হলে আরশ থেকে কিছু দূরে সিজদা করার সুযোগ লাভ করে"।[১]

মহাবিশ্বের শৃঙ্খলা বিধানে আল্লাহ তা'য়ালা বিবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করার পাশাপাশি জিন-ইনসান ও ফেরেশতাদের ইবাদত-বন্দেগির শৃঙ্খলা বিধানেও নানা উপায়-পদ্ধতি নির্ধারন করেছেন। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা নির্দিষ্ট একটি মৌলিক বস্তুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। বিশ্ব মুসলিমের ইবাদত-বন্দেগির জন্য বাইতুল্লাহকে কিবলা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। যে অভিমুখে পাঞ্জেগানা নামায, উমরা ও হজ্বের বিধিবিধান সম্পন্ন হয়। ফেরেশতাদের কিবলা হলো সপ্তাকাশে অবস্থিত বাইতুল মা'মুর। মহাবিশ্বের কিছু কিছু বস্তুনিচয়ের কিবলা হলো আল্লাহর আরশ। এগুলো আরশকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় এবং নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে।

আল কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী কা'বা হল বিশ্বব্যবস্থার টেকসই স্থায়িত্ব, শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তিস্থান। কুরআনে আরো বর্ণিত আছে,

﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ﴾

"আল্লাহ তা'য়ালা সম্মানিত গৃহ কা'বাকে মানুষের স্থিতিশীলতার লক্ষে স্থাপন করেছেন। নিষিদ্ধ মাসসমুহ, কুরবানির জন্তু ও কুরবানি-নির্দেশক জন্তুর গলায় ঝুলন্ত হার বিশ্ব মানবতার শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।[২]

"কিয়াম" (قيام) অর্থ যার উপর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। কা'বা ও তৎসম্পৃক্ত নিদর্শনসমুহ মানুষের অস্থিত্ব ও স্থায়িত্বের প্রধান অবলম্বন। 'নাস' (ناس) শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এখানে মানুষ বলে শুধুমাত্র মক্কার লোকজন

---

[১] বাইহাকি, আবু বকর আহমদ ইব্ন হোসাইন *শু'আবুল ঈমান*, (রিয়াদ: মাকতাবাহ আল রুশদ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৮৪, হাদিস নং- ২৫২৭।

[২] আল কুরআন, ৫;৯৭

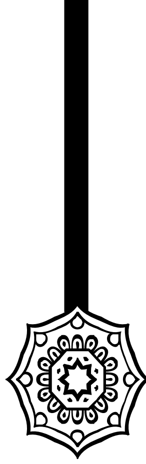
কিংবা আরববাসীও উদ্দেশ্য হতে পারে। এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসিরে মাআরিফুল কুরআনে বর্ণিত আছে, যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ কা'বা অভিমুখী হয়ে নামায আদায় করবে, হজ পালন করবে, ততোদিন পর্যন্ত বিশ্বের অস্থিত্ব ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। অন্যথায় পুরো পৃথিবীতে মুহুর্তের মধ্যেই নেমে আসবে ধ্বংসের অমানিশা। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

> عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم: اسْتَمْتِعُوا بِهَذَا الْبَيْتِ فَقَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ وَيُرْفَعُ فِي الثَّالِثَة
>
> "এ গৃহ দ্বারা তোমরা উপকার ভোগ করে নাও। এটি দুইবার ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। তৃতীয়বার এটিকে উঠিয়ে নেয়া হবে"।[১]

মূলত যতোদিন পর্যন্ত দুনিয়াতে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হবে এবং তার বিধি-বিধান কার্যকর থাকবে, ততোদিন বিশ্বজগত টিকে থাকবে। অন্যথায় তা ধ্বংস হয়ে যাবে।



[১] বায্‌যায, আবু বকর আহমদ ইব্‌ন আমর, *মুসনাদ*, (মদিনা মুনাওয়ারাহঃ মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, প্রথম সংস্করণ, ২০০৯খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ৩০৮, হাদিস নং- ৬১৫৭।



শাম দেশের বরকত রক্ষার অধিকার

যুগে যুগে নবি-রসূলগণ ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ফিতনা সম্পর্কে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। শেষ নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল সতর্ক করেই ক্ষান্ত হননি, ফিতনার প্রকৃতি ও ভয়াবহতা সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা প্রদান করেছেন। পাশাপাশি তিনি চিহ্নিত করেছেন ফিতনার উদয়স্থল, সময়-কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাও। উল্লিখিত শিরোনামটি ফিতান সম্পর্কীয় একটি হাদিসের অংশবিশেষ। বুখারি-মুসলিমবর্ণিত এ হাদিস দ্বারা শাম ও ইয়েমেনের মর্যাদা সাব্যস্ত হয় এবং নজদ সম্পর্কে সৃষ্টি হয় নেতিবাচক ধারণা। বক্ষমাণ প্রবন্ধে হাদিসটির আলোকে একটি অনুসন্ধানমূলক বর্ণনা উপস্থান করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। শাম এর ব্যাপারে স্বতঃসিদ্ধ মত হলো, এটি হারামাইন এর পর সর্বাধিক বরকতময় পূণ্যস্থাপন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন শাম ও ইয়েমেনের জন্য বরকতের দোয়া করেন। পূর্বাঞ্চল থেকে আগত একদল সাহাবি 'নজদ' এর জন্যও দোয়া করার অনুরোধ জানান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম শাম ও ইয়েমেনের জন্য পৌনঃপুনিক দোয়া করেন, কিন্তু নজদ এর জন্য দোয়া করা থেকে বিরত থাকেন। উপরন্তু এ অঞ্চলে ভূমিকম্প, ফিতনার উদ্ভব ও শয়তানের শিং উদয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، وَفِي يَمَنِنَا» قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا» قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالَ: هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ،

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ! আমাদের শাম ও ইয়েমেনে বরকত দান করুন। একদল সাহাবি বললেন, আমাদের 'নজদ' এর জন্যও দোয়া করুন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাদি.) বলেন, তিনি পুনরায় বলেন, হে আল্লাহ! আমাদের শাম ও ইয়েমেনে বরকত দান করুন। নজদবাসী সাহাবিগণ বললেন, আমাদের 'নজদ' এর জন্যও দোয়া করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেখান থেকে ভূমিকম্প ও ফিতনার উদ্ভব হবে। সেখানেই শয়তানের শিং উদিত হবে"।[১]

'নজদ' এর শাব্দিক অর্থ উঁচুভূমি। মদিনা থেকে পূর্বদিকে ও বর্তমান সৌদি আরবের মধ্যবর্তী একটি অঞ্চল 'নজদ' নামে পরিচিত। উইকিপিডিয়ার বর্ণনা মতে, 'নজদ' একটি মালভূমি। যার উচ্চতা ভূমি থেকে ১৬৭-১৫২৬ মিটার পর্যন্ত উচুঁ। পশ্চিম থেকে পূর্বের দিক কিছুটা ঢালু। ঐতিহাসিকভাবে এটি ইয়ামামা নামে বেশ প্রসিদ্ধ। 'নজদ' বর্তমানে রাজধানী রিয়াদ, আল কাসেম এবং হাইল এলাকা নিয়ে গঠিত। অনেকের ধারণা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নজদ' দ্বারা এই স্থানকেই নির্দেশ করেছেন। মূলত তিনি মদিনা থেকে পূর্বদিকের সকল উঁচু স্থানকে বোঝানোর জন্য 'নজদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি নির্দিষ্টভাবে রাজধানী রিয়াদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত 'নজদ'কে বোঝাননি। ইমাম ইব্ন তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হি.) বলেন, তৎকালীন সময়ে মদিনাবাসীরা ইরাকের অধিবাসীদের পূর্বাঞ্চলের মানুষ বলে অভিহিত করতো। ইমাম ইব্ন হাজার আসকালানি (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন,

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, সহিহ আল বুখারি, (বৈরুত: দারু তুকিন নাজাত, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি.), খ. ২, পৃ. ৩৩, হাদিস নং- ১০৩৭।

كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر ، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية ، فكان كما أخبر، وأول الفتن كان من قبل المشرق ، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين ، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به ، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة،

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল কাফের। এ অঞ্চল ছিল তখনো ইসলামি সাম্রাজ্যের বাইরে। তাই তিনি এ দিক থেকে ফিতনা ছড়ানোর আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলে গেছেন বাস্তবে তাই ঘটেছে। মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ফিতনা পূর্বদিক থেকে শুরু হয়েছিল। যা ছিল মুসলমানদের আভ্যন্তরীন বিভাজনের অন্যতম কারণ। এ অনৈক্য ছিল শয়তানের ভীষণ পছন্দ। ইসলামি শরিয়তে বিদআতের উৎপত্তিও এদিক থেকে আরম্ভ হয়েছিল"।[১]

হাদিসে বর্ণিত 'নজদ' দ্বারা বর্তমান সউদি আরবের নির্দিষ্ট ও সঙ্কুচিত অঞ্চলকে বোঝানো হয়নি, বরং পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ ও বিশাল এলাকাকে বোঝানো হয়েছে। ইমাম ইব্‌ন হাজার আসকালানির (রহ.) নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা উপর্যুক্ত বক্তব্যের পক্ষে জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি ইমাম আবু সোলাইমান আল খাত্তাবি'র (৩১৯-৩৮৮ হি.) উক্তি উল্লেখ করে বলেন,

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ نَجْدٌ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ وَمَنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ كَانَ نَجْدُهُ بَادِيَةَ الْعِرَاقِ وَنَوَاحِيهَا وَهِيَ مَشْرِقُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَصْلُ النَّجْدِ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ وَهُوَ خِلَافُ الْغَوْرِ فَإِنَّهُ مَا انْخَفَضَ مِنْهَا وَتِهَامَةُ كُلُّهَا مِنَ الْغَوْرِ وَمَكَّةُ مِنْ تِهَامَةَ، انْتَهَى وَعُرِفَ بِهَذَا وَهَاءَ مَا قَالَهُ الدَّاوُدِيُّ إِنَّ نَجْدًا مِنْ نَاحِيَةِ الْعِرَاقِ فَإِنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ نَجْدًا مَوْضِعٌ مَخْصُوصٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كُلُّ شَيْءٍ ارْتَفَعَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَلِيهِ يُسَمَّى الْمُرْتَفِعُ نَجْدًا وَالْمُنْخَفِضُ غَوْرًا ،

"ইমাম খাত্তাবি বলেন, আরবের লোকেরা পূর্বাঞ্চলকে 'নজদ' نَجْد বলে।

[১] আসকালানি, আহমদ ইব্‌ন আলি ইব্‌ন হাজার, ফতহুল বারি, (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৯ হি.), খ. ১৩, পৃ. ৪৭।

> সুতরাং মদিনাবাসীর নজদ হলো ইরাক ও এতদঞ্চলের মরুভূমি এলাকা। আভিধানিকভাবে উঁচু স্থানকে নজদ বলা হয়। পক্ষান্তরে নিম্নভূমিকে বলা হয় গাউর (غَوْر) । আরবের তিহামা অঞ্চল হলো নিম্নভূমির অন্তর্গত। আর মক্কা তিহামারই অংশ। এ কথা দ্বারা ইমাম আহমদ ইব্‌ন নদার আল দাউদি'র (মৃ.৪০২) বক্তব্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন, ইরাক ও পার্শ্ববর্তী এলাকা বোঝাবার জন্য নজদ শব্দ ব্যবহার করা হয়। যারা নজদকে নির্দিষ্ট অঞ্চল মনে করেছে তাদের মতিভ্রম হয়েছে। বাস্তবে বিষয়টি তেমন নয়। বরং পাশাপাশি দু'টি অঞ্চলের মধ্যে উঁচুভূমিকে নজদ (نَجْد) এবং নিচুভূমিকে মুনখাফিজ (الْمُنْخَفِضُ) বলে।[১]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাম ও ইয়েমেনের জন্য দোয়া করলেও নজদ অঞ্চলের জন্য দোয়া করেননি, বরং এ স্থানকে ফিতনার উৎসকেন্দ্র ও শয়তানের শিঙোদয়ের স্থান বলে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবে ইসলামি শরিয়তে বিদআতের উৎপত্তিও এদিক থেকে আরম্ভ হয়েছিল। যা ছিল মুসলমানদের আভ্যন্তরীন অনৈক্যের মূল কারণ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরণের ফিতনাকেই শয়তানের শিং বলে বর্ণনা করেছেন। ইতিহাস প্রমাণ করে, ইসলামের প্রথম ফিতনা ছিল উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) এর হত্যাকাণ্ড। এ ফিতনার মূল পরিকল্পনা ও হত্যাকারী আবু লুলু ছিল পারস্যের অধিবাসী। যা মদিনা থেকে পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। তৃতীয় খলিফা উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রাদি.) এর হত্যার চক্রান্ত ইরাক থেকেই শুরু হয়। চতুর্থ খলিফা আলিকে (রাদি.) ইরাকের প্রধান শহর কূফায় হত্যা করা হয়। আলি ও মুআবিয়া (রাদি.) এর মধ্যে সংঘটিত জামাল যুদ্ধের রণদামামা অনুরণিত হয় ইরাকের মাটিতে। ইরাক থেকেই শুরু হয় ইসলামের প্রথম ভ্রান্তদল খারেজিদের উৎপাত। ইসলামের ঐক্যবিনাশী 'জাবারিয়া ও কাদারিয়া' নামক দু'টি ভণ্ডদলের সূচনা এখানেই। জাহামিয়া, মুতাযিলা, রাফেজি ও শিয়া সম্প্রদায়ের ন্যায় বাতিল ফিরকাসমূহ ইরাকের ভূমিতে সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম আবু হাতিম (১৯৫-২৭৭ হি.) বলেন,

مَشْرِقُ الْمَدِينَةِ هُوَالْبَحْرَيْنِ، وَمُسَيْلِمَةُ مِنْهَا، وَخُرُوجُهُ كَانَ أول حادث

---

[১] আসকালানি, আহমদ ইব্‌ন আলি ইব্‌ন হাজার, ফতহুল বারি, (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৯ হি.), খ. ১৩, পৃ. ৪৭।

حدث في الإسلام

"মদিনার পূর্বাঞ্চল বলে বাহরাইনকে বোঝানো হয়েছে। যেখান থেকে ভন্ডনবি মুসাইলামাতুল কায্যাব এর আবির্ভাব হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম ফিতনা"।[১]

ইমাম ইব্ন হিব্বান (রহ.) বর্ণিত হাদিস দ্বারাও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নজদ শব্দ দ্বারা পূর্বাঞ্চলকে নির্দেশ করাই ছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ: إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

"আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্বের দিকে ইঙ্গিত করে এ উক্তি করতে দেখেছি যে, 'ফিতনা এখানে'। 'ফিতনা এখানে'। যেখান থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়"।[২]

কুরআন সুন্নাহর নস দ্বারা কোনো অঞ্চল বা জাতির মর্যাদা প্রমাণিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, ঐ অঞ্চল বা জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই উক্ত ফজিলতের অন্তর্ভুক্ত হবে। তেমনিভাবে কোনো এলাকা বা ব্যক্তির কুৎসা বর্ণনা দ্বারা ঐ অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত সকলেই এই নিন্দাবাদের উপযোগী হবে। মূলত মান-মর্যাদা ও উৎকৃষ্টতা-নিকৃষ্টতার মানদণ্ড হলো ঈমান ও আমল। বংশের আভিজাত্য কিংবা বর্ণের লৌকিকত্ব নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

"হে মানবমণ্ডলি! আমি তোমাদেরকে একজন নারী ও পুরুষ থেকে

---

[১] ইব্ন হিব্বান, আবু হাতিম ইব্ন আহমদ ইব্ন মুআজ, সহিহ ইব্ন হিব্বান, সম্পাদনা: শুআইবুল আরনাউত, (বৈরুত: মুয়াসসাসাহ আল রিসালা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৮/১৪০৮), খ. ১৫, পৃ. ২৫, হাদিস নং- ৬৬৪৮।

[২] মালিক ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক ইব্ন আমির আল আসবাহি, মুয়াত্তা, সম্পাদনা: ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়া আল তুরাসিল আরবি, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খ্রি.),খ. ২, পৃ. ৯৭৫, হাদিস নং- ২৯।

সৃষ্টি করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। মূলত আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত, যে সর্বাধিক তাকওয়াবান। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানেন ও খবর রাখেন”।[১]

বিশিষ্ট সাহাবি সালমান ফারেসি (রাদি.) এর প্রতি লিখিত আবুদ দারদা (রাদি.) এর পত্র দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কোনো জনপদের বিশেষ মর্যাদা সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বজনীন মর্যাদা হিসেবে পরিগণিত হয় না। আবার কলঙ্কযুক্ত অঞ্চলের সকল অধিবাসী নিন্দিত বলে বিবেচিত হয় না। বরং মানবীয় মর্যাদার মূল চাবিকাঠি হলো ঈমান। ইমাম মালিক য়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন,

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، أَنْ هَلُمَّ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الْأَرْضَ لَا تُقَدِّسُ أَحَدًا. وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنْسَانَ عَمَلُهُ،

“আবুদ দারদা (রাদি.) সালমান ফারেসি (রাদি.) এর নিকট এই মর্মে পত্র লিখেন যে, তুমি পবিত্র ভূমি শাম দেশে চলে এসো। সালমান ফারেসি (রাদি.) প্রতিউত্তরে লিখেন, কোনো ভূখণ্ড কাউকে পবিত্র করে না। আমলই মানুষকে পবিত্র করে’। [২]

আল কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও অগণিত সহিহ হাদিসে শামের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে, এতদসত্ত্বেও মূসা (আ.) ও বনি ইসরাইলের পদার্পনের পূর্বে শাম ছিল জালেম, ফাসেক ও মুশরিকদের অভিশপ্ত জনপদ। সুতরাং কুরআন সুন্নাহর নস দ্বারা প্রমাণিত বৈশিষ্ট্যাবলি কোনো অঞ্চলের জন্য স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য নয়। পূর্বাপর যে কোনো সময় ঐ অঞ্চলের নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় জনপদের বৈশিষ্ট্য অবস্থানকারীর মহত্ত্বের বিবেচনায় হয়ে থাকে। কালে-ভদ্রে স্থানের মর্যাদার কারণে অধিবাসীগণও সমীহিত হয়। পক্ষান্তরে নস এর বর্ণনা দ্বারা কারো সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য ও সামষ্টিক গুণাগুণ বর্ণিত হলে, ঐ সামগ্রিকতার অধিভূক্ত সকলেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও সমাদৃত বলে বিবেচিত হবে।

---

[১] আল কুরআন, ৪৯;১৩।

[২] মালিক ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমির আল আসবাহি, মুয়াত্তা, সম্পাদনা: ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়া আল তুরাসিল আরবি, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খ্রি.),খ. ২, পৃ. ৭৬৯, হাদিস নং- ৭।

যেমন ইসলামে প্রথম শতাব্দীর ফজিলত দ্বিতীয় শতাব্দীর তুলনায় অধিক এবং দ্বিতীয় শতাব্দী, তৃতীয় শতাব্দীর তুলনায় অধিক মর্যাদাবান। তেমনিভাবে কুরাইশ বংশের কৌলিণ্য অন্যান্য গোত্রের উপর সামগ্রিকভাবে বেশি।

উপর্যুক্ত মূলনীতির আলোকে বলা যায়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অঞ্চলের দিকে ফিতনা উদ্ভব হওয়ার আঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, তা চিরস্থায়ী ফিতনার উৎপত্তিস্থল হিসেবে বিবেচ্য নয়; সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী কলঙ্ক হিসেবে ধর্তব্য। আবার শরিয়তের নস দ্বারা প্রমাণিত ফজিলতপূর্ণ স্থান থেকে ফিতনা-ফাসাদের উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কাও অমূলক নয়। তাবৎ পৃথিবীর সর্বাধিক পূণ্যস্থান হলো মক্কা-মদিনা। কালের পরিক্রমায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মদিনা থেকেও ফিতনা উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। সাময়িকভাবে মদিনা থেকে ফিতনা সৃষ্টি হওয়া এই পূণ্যভূমির সামগ্রিক মর্যাদার পরিপন্থি নয়। উসামা ইব্ন যাইদ (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

> عَنْ أُسَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ، كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ،

> “রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার একটি উঁচু দূর্গ থেকে নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, আমি যা দেখতে পাই তোমরা কি তা দেখতে পাও? আমি তোমাদের গৃহের অভ্যন্তরে ফিতনার জায়গাসমূহ দেখতে পাচ্ছি। যেভাবে বৃষ্টির ফোঁটা পতিত হওয়ার স্থানসমূহ দেখা যায়”।[১]

ভূমিকম্প, ফিতনা ও শয়তানের শিঙোদয়সমন্বিত হাদিস দ্বারা সউদি আরবের নজদ অঞ্চলকে কলঙ্কিত মনে করা হলে, হাদিসের মূল ভাষ্য মতে পূর্বাঞ্চলের ইরাক তুলনামূলকভাবে অধিক কালিমাযুক্ত। ইরাক ফিতনা ছড়ানোর মূলকেন্দ্র হলেও পরবর্তী প্রজন্মে সে এলাকায় এমন যুগশ্রেষ্ট মহা-মনীষীগণ জন্ম গ্রহণ করেছেন, মুসলিম উম্মাহর প্রতি যাদের অবদান অনস্বীকার্য। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) তাদের মধ্যে অন্যতম। ক্ষণজন্মা এই মহান ইমামের প্রখর মেধা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ধী-শক্তি প্রাতঃস্মরণীয়। মদিনার বহুল-পরিচিত ও

[১] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি, সহিহ মুসলিম, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুতঃ দারু ইহয়া আল তুরাসিল আরবি), খ. ৪, পৃ. ২২১১, হাদিস নং- ২৮৮৫।

সর্বজনস্বীকৃত মুজতাহিদ ইমাম মালিক (রহ.) এর সাথে তার প্রথম পরিচয়ের ঘটনাটির উল্লেখ এখানে অতি প্রাসঙ্গিক।

حضر أبو حنيفة درس الإمام مالك ولم يعرفه فألقى الإمام مالك سؤالا على أصحابه فأجابه أبو حنيفة فقال من أين الرجل قال من أهل العراق قال من أهل بلد النفاق والشقاق فقال تأذن لي أن أقول شيئا من القرآن قال نعم فقرأ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل الْعراق مردوا على النفاق فقال الإمام مالك ما قال الله هكذا فقال أبو حنيفة كيف قال الله قال ومن أهل المدينة فقال الحمد لله الذي حكمت على نفسك ووثب من مجلسه فلما عرفه أكرمه

"ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) একদিন ইমাম মালিক (রহ.) এর দরসে উপস্থিত হন। ইমাম মালিক (রহ.) এর সাথে তখনও তার পরিচয় ছিল না। ক্লাস চলাকালীন সময়ে ইমাম মালিক (রহ.) শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ করে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তার উত্তর প্রদান করেন। ইমাম মালিক (রহ.) তাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইরাক থেকে। ইমাম মালিক (রহ.) বললেন, আপনি তো নেফাক ও অনৈক্যের দেশ থেকে আগমন করেছেন। তদুত্তরে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) অনুমতি নিয়ে বললেন, আমি কি আপনার সমীপে আল কুরআনের কিছু অংশ তেলাওয়াত করতে পারি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সূরা তাওবার ১০১ নং আয়াতটি খানিকটা বিকৃত করে তেলাওয়াত করেন,

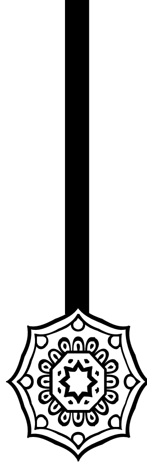
وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْعراق مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ

'তোমাদের আশপাশের গ্রাম্য লোকদের মধ্যে কিছু মুনাফেক আছে। আর 'ইরাকবাসীদের মধ্যে কিছু লোক মুনাফেকিতে খুবই পটু'। যাদের ব্যাপারে আপনি জানেন না। তাদের পরিচয় আমিই জানি। তাদেরকে আমি দুইবার শাস্তি দেব। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে'। ইমাম মালিক বলেন, আল্লাহ তায়ালা এভাবে বলেননি। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, তবে আল্লাহ কীভাবে বলেছেন? তিনি বললেন,

> ‘মদিনাবাসীদের মধ্যে কিছু লোক মুনাফেকিতে খুবই পটু’। অতঃপর ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) বললেন, সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, আপনি নিজের বিপক্ষে ফায়সালা দিয়েছেন। এই বলে তিনি দ্রুত সেই মজলিস থেকে প্রস্থান করেন। ইমাম মালিক তার পরিচয় লাভ করার পর তাকে অত্যন্ত সমাদর করেন।’

বিশ্ববরেণ্য মহান দুই ইমামের এই আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, কুরআন-সুন্নাহর নস দ্বারা কোনো অঞ্চলের সুখ্যাতির কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকার সকলেই নন্দিত হয় না। তেমনিভাবে কোনো এলাকার নিন্দাবাদ ঐ এলাকার সর্বস্তরের মানুষের কপালে কলঙ্কের দাগ পড়ে না। ইরাকের মাটি থেকে যেভাবে ইমাম আযমের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে, তেমনিভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এর ন্যায় জঘন্য মুনাফেকগণের বাস্তুভিটা ছিল মদিনার উপকণ্ঠেই।





আত্মহত্যা বনাম জান-মালের সুরক্ষার অধিকার

সম্প্রতি রাজধানী ঢাকার একজন নামজাদা ব্যবসায়ী ফেইসবুক লাইভে এসে আত্মহত্যা করে। সিনেমার মতো অশ্লীল কাজে জড়িত একজন পরিচিত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় হবার সুবাদে এই অপমৃত্যু মিডিয়ার দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়। আত্মহত্যার জন্য প্রকাশ্যে কাউকে দোষারোপ না করলেও পরিবার-পরিজনের প্রতি পুঞ্জিভূত ক্ষোভ, অবিরাম নিঃসঙ্গতা, বিশ্বস্ত বন্ধু-বান্ধবদের প্রতারণা, ব্যবসায় লোকসানসহ বিভিন্ন কারণে সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। সাধারণত ডিপ্রেশন, দাম্পত্য কলহ, পারিবারিক অশান্তি, মানসিক আঘাত, দারিদ্র ও বেকারত্বকে আত্মহত্যার কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মূলত ধর্মীয় ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে সুশিক্ষার অভাব, জীবনদর্শন সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণা, বস্তুবাদী চিন্তাধারা ও ভোগবাদী সমাজব্যবস্থাই আত্মহত্যার প্রধান কারণ। নিম্নে আত্মহত্যাকে আমাদের সমাজব্যবস্থার আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নিজের জীবন বিসর্জন দেয়া বা স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণনাশের প্রক্রিয়াকে আত্মহত্যা বা আত্মহনন (Suicide) বলে। আত্মহত্যার চেষ্টাকে

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মানসিক অবসাদজণিত গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের অনেক দেশেই আত্মহত্যা একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরিপ মতে প্রতি বছর পৃথিবীতে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করে। যে সব কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটে আত্মহত্যার অবস্থান সেগুলোর মধ্যে ত্রয়োদশ। নারীর তুলনায় পুরুষের আত্মহত্যার হার তিন থেকে চারগুণ বেশি। বাংলাদেশ একটি আত্মহত্যাপ্রবণ দেশ। সর্বাধিক আত্মহত্যার দেশের তালিকায় বাংলাদেশের ক্রমমান বিশ্বে ১৩ তম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় দশম।

সকল ধর্মেই আত্মহত্যা পাপ, আর ইসলামে মহাপাপ। এ বিষয়ে অবগত নয় এমন ধার্মিক খুঁজে পাওয়া গোটা পৃথিবীতে দুস্কর। ইসলামি জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে ধর্মীয় অনুশাসন পালনকারী অনেক ব্যক্তিকে আত্মহত্যা করতে দেখা যায়। দীনের সঠিক জ্ঞানের বদৌলতে কোনো আলেমের আত্মহত্যার খবর অদ্যাবধি শোনা যায়নি। মূলত ধর্মীয় জ্ঞানে অস্বচ্ছতা ও স্বচ্ছতার খোলসে অজ্ঞতার কারণেই মানুষ অধর্ম করে। ইসলাম আত্মহত্যাকে পাপ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়নি। মৃত্যু কামনাকেও অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلِ:
اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي،

"বিপদ যতই ঘনীভূত হোক তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। একান্ত অপারগ হলে এতটুকু বলতে পারে, হে আল্লাহ! আমার জন্য হায়াত কল্যাণকর হলে হায়াত দান করুন। আর মৃত্যু মঙ্গলজনক হলে মৃত্যু দান করুন"।[১]

সৃষ্টিকুলের সবকিছুর নিরঙ্কুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। জান-মাল আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার নিকট আমানতস্বরূপ। মানব শরীরের জন্য ক্ষতিকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেভাবে বান্দার জন্য জায়েয নয়। সম্পদ নষ্ট করা ও অপচয় করারও অপরাধ হিসেবে বিবেচিত জিন-ইনসানকে আল্লাহর নেয়ামতসমূহের ব্যবহার করার অধিকার দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, নষ্ট ও অপচয় করার ক্ষমতা

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫/২০০৪), খ. ৭, পৃ. ১২১, হাদিস নং- ৫৬৭১।

দেয়া হয়নি। ইসলামে এবাদতের ক্ষেত্রেও সহজলভ্য সম্পদের অপচয় করার কোনো সুযোগ নেই। উযু করার সময় প্রতিটি অঙ্গ একবার ধোয়া ফরজ। তিনবার ধৌত করা সুন্নাহ। প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পর চতুর্থবার ধৌত করা মাকরুহ। বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। অথচ এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামের মৌলিক বিষয়ে ধারণা লাভ করার কোনো সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে আমাদের সমাজব্যবস্থায় এমন কিছু আইন, কুসংস্কার ও রীতি-নীতি প্রচলিত রয়েছে, যা মানুষকে আত্মহত্যার প্রতি ধাবিত করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আত্মহত্যার কারণসমূহ নিম্নরূপ-

তাকদিরের প্রতি অবিশ্বাস

বান্দার জন্য অবধারিত আল্লাহর ফায়সালা ও সিদ্ধান্তকে তাকদির বলে। তাকদিরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজে আইন। হায়াত-মউত, ধন-দৌলত ও ইজ্জত-আব্রুসহ সৃষ্টিজীবের অনেক বিষয় আল্লাহর ফায়সালায় নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে সীমাতিরিক্ত কর্মপ্রয়াস অকার্যকর হিসেবে প্রমাণিত। সৃষ্টির অনেক পূর্বে রিযিক বরাদ্দ করে মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব ও আশরাফ-আতরাফ আল্লাহর তাকদিরের ফায়সালা। মানব সমাজে পরিদৃষ্ট শ্রেণিবৈষম্য ও ভেদাভেদ আল্লাহর কুদরতের কারিশ্মা। বিশ্বের শৃঙ্খলা বিধানে এটিই আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম। শ্রেণিবিভাজনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে প্রতিনিয়ত পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। তাকদিরের প্রতি বান্দার বিশ্বাসের শিথিলতা আত্মহত্যার প্রধান কারণ। তাকদিরের ফায়সালা হিসেবে সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুর্দশা উভয়টিই মুমিনের জন্য সমান কল্যাণকর। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

"মুমিনের কাজকর্মের বিশ্ময়কর বিষয় হলো, তার প্রতিটি কাজই কল্যাণকর। এ বৈশিষ্ঠ্য একমাত্র মুমিনের মধ্যেই পাওয়া যায়। সে নেয়ামত লাভ করলে শোক্‌র আদায় করে। সুতরাং এটি তার জন্য মঙ্গলজনক হয়। বিপদাক্রান্ত হলে সবর করে। এটিও তার জন্য কল্যাণ ডেকে আনে"।[১]

---

[১] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ. ৪, পৃ. ২২৯৫, হাদিস নং- ২৯৯৯।

তাকদিরে বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তি কখনো বিপদাপদে মুষড়ে পড়ে না। এটিকে তারা আল্লাহর নির্ধারিত সিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নিয়ে সবর এখতিয়ার করে এবং তাঁর ফায়সালার উপর সন্তোষ প্রকাশ করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

"পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ পতিত হয়, তার মধ্যে এমন কোনো বালা-মুসিবত নেই, যা সেই সময় থেকে এই কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই, যখন আমি সেই প্রাণসমূহ সৃষ্টিও করিনি। নিশ্চয় এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে তোমরা হারানো বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ না করো এবং আল্লাহ যা দান করেছেন তার জন্য উল্লসিতও না হও। বস্তুত আল্লাহ উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না"।[১]

মুমিন যাতে বিপদাপদে ধৈর্যহারা না হয়, সে জন্য আল কুরআনে পূর্ব থেকেই এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, ঈমানদার ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'য়ালা সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"কোনো বিপদই আল্লাহর হুকুম ছাড়া আসে না। যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ তার অন্তরকে হেদায়ত দান করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত"।[২]

হতাশা ও আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্য

বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু আল্লাহর রতমতের বদৌলতেই টিকে থাকে। সৃষ্টিজগতের কোনো বস্তুর উপর থেকে আল্লাহর রহমত উঠে গেলে তার অস্থিত্ব বিনাশ হয়। আল্লাহর রহমতের কারণেই মানুষ বিশ্বজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব।

---

[১] আল কুরআন, ৫৭;২২।
[২] আল কুরআন, ৬৪;১১।

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে জীবনের প্রতি হতাশার কারণেই মানুষ আত্মহত্যায় প্ররোচিত হয়। এ ধরনের নৈরাশ্য প্রকাশ্য গোমরাহি ও স্পষ্ট কুফরি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾

"পথভ্রষ্টরাই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়"।[১]

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾

"বলুন! হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার গুনাহসমূহ মার্জনা করেন"।[২]

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাদি.) আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াকে কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করে বলেন,

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ

"সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ হলো, আল্লাহর সঙ্গে শির্‌ক করা। আল্লাহর শাস্তি থেকে নির্ভয় থাকা ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া"।[৩]

সুসময়ে উৎফুল্ল হওয়া ও বিপদাপদে ভেঙ্গে পড়া কাফের-মুশরিকের স্বভাব। সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকাই মুমিনের পরিচয়। কাফেরদের চরিত্র বিবশ্লেষণ করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

---

[১] আল কুরআন, ১৫;৫৬।

[২] আল কুরআন, ২৯;৫৩।

[৩] তাবরানি, আবুল কাসিম সোলাইমান ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আইয়ুব, *আল মু'জামুল কাবির*, (কায়রো: মাকতাবাহ ইবননি তায়মিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫ হি./ ১৯৯৪ খ্রি.), খ, ১০, পৃ. ৪৫৯, হাদিস নং-১৯৭০১।

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾

"আমি যখন তাদেরকে আমার রহমত আস্বাদন করাই তারা আনন্দ প্রকাশ করে। আর যখন তাদের পাপের কারণে কোনো বিপদে পতিত হয়, হতাশ হয়ে পড়ে"।[১]

আল্লাহর রহমতের বিশালতা ও অনুগ্রহের প্রশস্থতা প্রসঙ্গে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْئَسْ مِنَ الجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ العَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ

"আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টির সূচনায় একশটি রহমত সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিরানব্বইটি রহমত নিজের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষণ করেন। সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য বরাদ্দ করেন একটিমাত্র রহমত। কাফেরগণ আল্লাহর রহমতের এই প্রশস্ততা সম্পর্কে জানতে পারলে কখনো জান্নাত থেকে নিরাশ হতো না। মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর আজাবের ভয়াবহতার সম্পর্কে অবগত হলে জাহান্নাম থেকে নির্ভয় হতে পারতো না"।[২]

পার্থিব সমস্যা মানুষের দৃষ্টিতে যতই দুঃসাধ্য বিবেচিত হোক, প্রয়োজনের মুহূর্তে আল্লাহর সাহায্য ততই নিকটে। আল্লাহর রহমতের উপর আস্থা রাখার কারণে তাঁর সাহায্য লাভের হাজারো ঘটনা কুরআন-হাদিসে বর্ণিত আছে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ঘটনাসমূহ স্মরণ থাকলে বিপদাপদে ধৈর্য ধারণের শক্তি লাভ করা যায় এবং আত্মহত্যার প্রবণতা থেকে মুক্তি লাভে সহায়তা পাওয়া যায়।

---

[১] আল কুরআন, ৩০;৩৬।

[২] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫/২০০৪), খ. ৮, পৃ. ৯৯, হাদিস নং- ৬৪৬৯।

সন্তানকে দীনি শিক্ষা দান

সন্তান দাম্পত্য জীবনে পরিপূর্ণ আনন্দের অন্যতম উপলক্ষ। সুসন্তান একটি সুখী পরিবারের শোভা বহুগুণ বর্ধন করে। ধন-সম্পদ ব্যতীত যেভাবে মাবন জীবন সমৃদ্ধ হয় না, সন্তানহীন দাম্পত্য জীবনও স্বাচ্ছন্দ্যকর হয় না। অনুগত সন্তান পিতা-মাতার জীবনের শোভনীয় অংশ। আর অবাধ্য সন্তান পরিবারের অশান্তির অন্যতম কারণ। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾

"হে ঈমানদারগণ! কিছু কিছু স্ত্রী-সন্তান তোমাদের শত্রুসমতুল্য। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও"।[১]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾

"ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু"।[২]

ইসলামের মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ। তাওহিদের শিক্ষাই মানব জীবনের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা। এ শিক্ষার পাশাপাশি মাতাপিতার সঙ্গে সদাচরণের বিষয়টি সংযুক্ত করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

"তোমাদের রব এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করো না এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ করো"।[৩]

ইসলাম পিতা-মাতার উপর সন্তানের কিছু অধিকার বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে। এ দায়িত্ব প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

---

[১] আল কুরআন, ৬৪;১৪।

[২] আল কুরআন, ৬৪;১৫।

[৩] আল কুরআন, ১৭;২৩।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো"।[১]

পরিবার পরিজনকে দুনিয়া-আখিরাতের সব ধরনের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার প্রধান হাতিয়ার হলো দীনি শিক্ষা। এ বিষয়টি যত দ্রুত মানুষের বোধগম্য হবে, পারিবারিক শান্তি ও সমৃদ্ধি ততই ত্বরান্বিত হবে। দীনি শিক্ষার বিপরীতে যারা পার্থিব শিক্ষাকে উন্নতির মাপকাটি হিসেবে বিবেচনা করে, তাদের ক্ষতি দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতে। দীনের সঠিক জ্ঞান অনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তি কখনো মাতা-পিতাকে অবহেল করতে পারে না। উম্মতের গৌরবদ্বীপ্ত এ প্রজন্মের দীনি শিক্ষার সূচনা হয় শৈশবকাল থেকে। এ সময় থেকে তাদেরকে আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তোলা পিতা-মাতার একান্ত কর্তব্য।

সন্তানের সংখাধিক্য

ইহ জীবনের শান্তি ও পরকালের কল্যাণে সন্তানের ভূমিকা অপরিসীম। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

"ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ইহকালীন জীবনের শোভনীয় বস্তু"।[২]

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর দুনিয়াতে সুসন্তান রেখে গেলে নেক আমলের ধারা চলমান থাকে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"মৃত্যুর পর আদম সন্তানের সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি কর্মের সওয়াব অব্যাহত থাকে। সদাকায়ে জারিয়া। উপকারী ইলম। নেককার সন্তান, যারা পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে"।[৩]

সন্তানের সংখ্যা বেশি হলে পূণ্যের ধারা যেভাবে গতিময় হয়, দুনিয়ার জীবনেও

---

[১] আল কুরআন, ৬৬;৬।

[২] আল কুরআন, ১৮;৪৬।

[৩] দারিমি, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান, *সুনানু দারিমি*, (বৈরুত: দারুল বাশায়ির, ১ম সংস্করণ, ১৪৪৩ হি.), খ.১, পৃ. ১৯৯।

তারা বহুমুখী অবদান রাখতে সক্ষম হয়। অধিক সন্তান লাভ করার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে এমন নারী বিয়ে করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন, যারা অধিক সন্তান জন্মদানে সক্ষম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

> "তোমরা মায়াবতী ও অধিক সন্তান জন্মদানকারী নারীদের বিয়ে করো। কেননা কিয়ামতের দিন আমি উম্মতের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করবো"।[১]

আনাস ইব্ন মালিক (রাদি.) এর জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদের প্রাচুর্য ও অধিক সন্তানের দোয়া করেন। ইমাম বুখারি 'বরকতসহ অধিক সন্তানের জন্য দোয়া' নামে একটি শিরোনামে কায়েম করেছেন (بَابَ الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْوَلَدِ مَعَ الْبَرَكَةِ) । আনাস (রাদি.) বলেন, আমার মা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আমার জন্য অধিক সম্পদ ও সন্তানের দোয়া করার আবেদন করেন, তিনি আমার জন্য এই মর্মে দোয়া করেন,

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ

> "হে আল্লাহ তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করুন এবং আপনার দেয়া নেয়ামতে বরকত দান করুন"।

অধিক সন্তান থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্ধ্যা নারীদের বিয়ে করতে নিরুৎসাহিত করেন। মা'কাল ইব্ন য়াসার (রাদি.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন,

> إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

---

[১] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদ*, (রিয়াদঃ মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, ১৪২১ হি./ ২০০১ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ২৪২।

"হে আল্লাহর রসূল! আমি একজন বংশমর্যাদাসম্পন্ন ও সুদর্শন নারীর সন্ধান পেয়েছি। যে সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম। আমি কি তাকে বিয়ে করতে পারি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। লোকটির দ্বিতীয়বারের আবেদনেও তিনি না বললেন। তৃতীয়বার আবেদন করার পর তিনি বললেন, তোমরা মায়াবতী ও অধিক সন্তান জন্মদানকারী নারীদের বিয়ে করো। কেননা কিয়ামতের দিন আমি উম্মতের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করবো"।

তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতির সুবাদে লেখা-পড়া, কর্মসংস্থান ও ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ নানাবিধ প্রয়োজনে মানুষের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অনেককে ভিনদেশে স্থায়ীভাবে নিবাসও গ্রহণ করতে হয়। এমতাবস্থায় দেশে অবস্থানরত মাতা-পিতার সেবা-যত্ন করা সন্তানের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। একাধিক সন্তান থাকলে কেউ না কেউ মাতা-পিতার সেবাদানে নিজেকে ধন্য করার সুযোগ লাভ করে। পিতা-মাতাও তাদের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে।

একাধিক বিয়ে

ইসলাম মানবতার কল্যাণে এমন কিছু বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে, যা অত্যন্ত বাস্তবানুগ ও সময়োপযোগী। একাধিক বিয়ে এমন একটি বিজ্ঞানসম্মত ও সময়োচিত বিধান। ইসলাম পুরুষের জন্য প্রয়োজনের নিরিখে ও শর্তসাপেক্ষে একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। নারীর সংখ্যাধিক্য, বিপদাপদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে পুরুষ সদস্যের মৃত্যু, নারীর স্বাস্থ্যগত সমস্যা, বন্ধাত্ম ও কিছু পুরুষের একাধিক নারীর প্রয়োজনীয়তার কারণে ইসলাম একাধিক বিয়ের অনুমোদন দিয়েছে। ইসলামপূর্ব যুগ থেকেই বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। জাহেলি সমাজে বহু বিবাহের প্রথা চালু থাকলেও এতে কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম ছিল না। ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের স্বার্থ বিবেচনায় স্ত্রীর সংখ্যা নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধও আরোপ করেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ: أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا

قَلِيلًا، وَايْمُ اللهِ، لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ، وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ، أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ، وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ

"গায়লান ইব্ন সালামা আল সাকাফি'র ইসলাম গ্রহণের সময় তার অধীনে দশজন স্ত্রী ছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি স্ত্রী হিসেবে মাত্র চারজনকে বাচাই করতে পারো। উমার (রাদি.) এর খেলাফতকালে গায়লান তার স্ত্রীদের তালাক দিয়ে যাবতীয় সম্পদ সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়। উমার (রাদি.) এর নিকট খবরটি পৌঁছার পর তিনি বললেন, শয়তানের গোপন অনুসন্ধানে সম্ভবত তোমার মৃত্যুর খবর ধরা পড়েছে। সে তোমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে যে, তুমি হয়তো বেশিদিন বাঁচবে না। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি। অবশ্যই স্ত্রীগণ তোমার নিকট ফিরে আসবে এবং তোমার সম্পদের মালিক হবে। অথবা তিনি বলেছেন যে, আমি তাদেরকে তোমার সম্পদের উত্তরাধিকার করে ছাড়বো। আবু রেগালের সমাধিতে যেভাবে প্রস্তরাঘাত করা হয়েছিল, তোমার কবরেও অনুরূপ রজম করা হবে।"[১]

ইসলাম চারজন নারীকে একসঙ্গে বিয়ে করার সীমারেখা নির্ধারণ করে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচারের শর্ত আরোপ করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾

"তোমরা যদি এতিমদের মধ্যে ন্যায়বিচার করার ব্যাপারে আশঙ্কা করো, তবে দুই, তিন ও চারজন নারীকে বিয়ে করতে পারো। আর যদি তাদের প্রতি সুবিচার করার ব্যাপারে আশঙ্কা করো, তবে একটিমাত্র বিয়ে করবে। অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের নিয়ে ক্ষান্ত থাকবে। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা অধিক।"[২]

এসতেগফার

ডিপ্রেশন বা আবসাদ এক প্রকারের মানসিক রোগ। এটি এখন বৈশ্বিক ব্যাধিতে

---

[১] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদ*, (রিয়াদ: মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, ১৪২১ হি./ ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, পৃ.২৫১, হাদিস নং- ৪৬৩১ ।

[২] আল কুরআন, ৪;৩।

পরিণত হয়েছে। অবসন্নতা ও হতাশার কারণে মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা হ্রাস পায়। এটি মানুষের জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরিপ মতে পৃথিবীর ৩০০ মিলিয়ন এর বেশি মানুষ এই সমস্যায় আক্রান্ত। এক গবেষণায় দেখা যায়, দশ ভাগের বেশি আমেরিকান ডিপ্রেশনের মতো মানসিক রোগে আক্রান্ত। বাংলাদেশের মতো নিম্নবিত্তের দেশের মানুষ এখন সমবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। এ সমস্যা জটিল আকার ধারণ করলে অনেক মানুষ আত্মহত্যা করে মুক্তি পেতে চায়। উপরে বর্ণিত আত্মহত্যার কারণসমূহ ও কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে এ রোগ সৃষ্টি হতে পারে। মানবজীবনের সর্বস্তরে সুন্নাহর আমল এ সমস্যা থেকে মুক্তির প্রধান উপায়। দুশ্চিন্তা ও অবসাদগ্রস্থ ব্যক্তির সামনে পুরো পৃথিবী অন্ধকার দেখায়। আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া ও দুনিয়ার প্রতি অধিক মোহগ্রস্থ হয়ে পড়ার কারণে বান্দার জন্য গোটা পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾

"যে আমার স্মরণ থেকে গাফেল থাকবে, তার জীবন সঙ্কটময় হয়ে পড়বে। কিয়ামতের দিন আমি তার হাশর করবো অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে অন্ধ অবস্থায় কেন উঠালেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এভাবেই তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজ সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"[১]

কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন জায়গায় এ রোগের অব্যর্থ চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণিত আছে। আবু সাঈদ খুদরি (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মসজিদে প্রবেশ করে আবু উমামা নামক একজন আনসারি সাহাবিকে দেখতে পেলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি অসময়ে মসজিদে বসে আছো কেন? আবু উমামা উত্তর দিল, হে আল্লাহর রসূল! ঋণ আমাকে বড় ধরনের দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[১] আল কুরআন, ২০;১২৪,২৫।

বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য শিখিয়ে দেবো? যা পাঠ করলে আল্লাহ তা'য়ালা তোমার দুশ্চিন্তা দূর করে দেবেন এবং তোমার ঋণশোধের ব্যবস্থা করবেন। লোকটি বলল, অবশ্যই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সকাল সন্ধ্যা এই দোয়া পাঠ করবে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ

লোকটি বলল, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশনা অনুযায়ী আমি দোয়াটি পড়তে লাগলাম। ফলে আল্লাহ তা'য়ালা আমার দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন এবং ঋণও পরিশোধ হয়ে গেলো।[১]

কোনো বান্দাই আল্লাহর নাফরমানি থেকে মুক্ত নয়। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে মানুষ পাপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বান্দার দায়িত্ব হলো, পাপ সংঘটিত হবার পর তৎক্ষনাৎ আল্লাহর নিকট পাপমুক্তির প্রার্থনা করা। তাওবা করার মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়ে গেলে বান্দার আত্মা প্রশান্তি লাভ করে এবং দুশ্চিন্তা ও হতাশা থেকে মুক্তি লাভ করে। দুশ্চিন্তা ও অবসাদ থেকে মুক্তির একটি কার্যকর উপায় হলো অধিকহারে এসতেগফার করা বা আল্লাহর নিকট নিজের গুনাহ মার্জনার প্রার্থনা করা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে ব্যক্তি নিয়মিত এসতেগফার করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সকল প্রকার সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবেন। দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দান করবেন এবং এমন স্থান থেকে রিযিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করে না"।[২]

---

[১] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্ন আশ'আস আল সাজিসতানি, *সুনানু আবি দাউদ*, (বৈরুত: মাকতাবাহ আল আসরিয়্যাহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, তা/বি.), খ. ২, পৃ. ৯৩, হাদিস নং-১৫৫৫।

[২] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্ন আশ'আস আল সাজিসতানি, *সুনানু আবি দাউদ*, (বৈরুত: মাকতাবাহ আল আসরিয়্যাহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, তা/বি.), খ. ২, পৃ. ৮৫, হাদিস নং-১৫১৮।

একাকী নিদ্রা যাওয়া

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বিশ্ব মানবতার পরম বন্ধু। রহমাতুল লিল আলামিন হিসেবে তিনি যেভাবে মানবতার কল্যাণচিন্তা করতেন, তেমনিভাবে উম্মতকে সম্ভাব্য বিপদাপদ থেকে সতর্কও করেছেন। কোনো ভবনে বা স্থানে নারী বা পুরুষের একাকী নিদ্রা যাওয়ার মধ্যে নানাবিধ অসুবিধার আশঙ্কা রয়েছে। সাধারণত মানুষ একে অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী। রাতের বেলায় আপতিত সম্ভাব্য বিপদ থেকে সুরক্ষার জন্য কারো পাশে থাকা একান্ত জরুরি। শয়তান কিংবা চোর-ডাকাতের উপদ্রব, বিভিন্ন ধরনের ভয়-ভীতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা লাভের আশায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এমন স্থানে একাকী নিদ্রা যেতে বারণ করেছেন, যেখানে সহজে কারো সহযোগিতা পাওয়ার সুযোগ থাকে না। তেমনিভাবে তিনি একাকী ভ্রমনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলেন-[১]

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ، أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ

সরকার প্রধানের দরবার দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্য উন্মুক্ত না থাকা

দেশের সরকার প্রধান হলো পুরো জাতির অভিভাবক। যে কোনো অভিযোগ প্রধান নির্বাহীর নিকট অনায়াসে দায়ের করার অবাধ অধিকার থাকা চাই সর্বস্তরের মানুষের। দেশের আদালতসমূহে বিচার প্রার্থীদের অব্যাহত হয়রানীর কারণে মজলুমের আর্তনাদ আল্লাহর আরশ ছুঁয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সাধারণ মানুষের বিচার প্রার্থনা এক প্রকারের জুলুমে পরিণত হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিমাতাসুলভ আচরণে অসহায় জনগোষ্ঠী প্রচণ্ডভাবে হতাশ। এমন পরিস্থিতিতে চরম হতাশাগ্রস্থ ব্যক্তিগণ দেশের অভিভাবকের নিকট প্রতিকার লাভের সুযোগ পেলে অনেকের জান-মাল রক্ষা পেতো। ইসলামের সোনালী যুগে রাজা-বাদশাহদের দ্বার সাধারণ নাগরিকদের জন্য ছিল উন্মুক্ত। দিশাহারা মানুষ দেশের অভিভাবকের নিকট অন্যায়ের প্রতিকার লাভ করতো। আমাদের সমাজে

---

[১] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদ*, (রিয়াদ: মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, ১৪২১ হি./ ২০০১ খ্রি.), খ. ৯, পৃ.৪৬৬ হাদিস নং- ৫৬৫০।

সাধারণ মানুষের জন্য সরকার প্রধানের দরবার অবারিত নয়। অবিরাম জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ট জনগোষ্ঠী হতাশা ও দুর্দশায় বিপর্যস্ত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেচে নেয়। দেশের কিছু কিছু নাগরিক মিডিয়া বা অন্য কোনো উপায়ে সরকারের সুদৃষ্টি আকৃষ্ট করার কারণে সুবিচার লাভ করার অনেক নজির দেখা যায়।

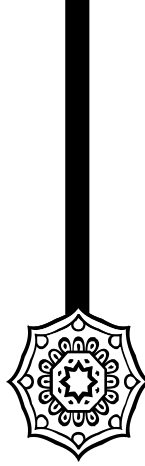
ফেইসবুক লাইভে প্রকাশ্যে আত্মহত্যাকারী ব্যবসায়ীর ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা বোঝা যায়, ধর্মীয় জ্ঞানে তার স্পষ্ট ধারণার অভাব ছিল। সন্তানদেরও তিনি দীনি শিক্ষায় দীক্ষিত করেননি। একমাত্র পুত্রসন্তান দেশের বাইরে অবস্থান করার কারণে পিতার সেবা-যত্ন করার মোক্ষম সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। একমাত্র কণ্যাসন্তান মডেলিংয়ের মতো অবৈধ পেশায় নিয়োজিত ছিল এবং পিতার সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল না। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হলো, আত্মহত্যাকারীর স্ত্রী কঠিন দুর্দিনেও স্বামীর পাশে থাকার প্রয়োজনবোধ করেনি। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আবু মহসিনের পরিবারের পরিধি একটু বড় হলে অথবা দেশে কোনো পুত্র সন্তান থাকলে তার জীবন আরো সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হতো। সমাজের শ্যেনদৃষ্টি উপেক্ষা করে দ্বিতীয় বিয়ে করার মতো দুঃসাহস থাকলেও তার সামগ্রিক জীবন সুখকর হতো এবং আত্মহননের পথ থেকে ফিরে আসার পথ বেরিয়ে আসতো। তদুপরি তার পার্থিব জীবন ধর্মীয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ হলে এবং তাকদিরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক সার্বক্ষনিক এস্তেগফার এর উপর আমল করলে এমন আত্মঘাতি পদক্ষেপ থেকে মুক্তির পথ বেরিয়ে আসতো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾

"যে আমার পথে পরিচালিত হতে চায়, তাকে আমি অবশ্যই কল্যাণের পথ দেখাবো। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন।"[১]



[১] আল কুরআন, ২৯;৬৯।



ভূখণ্ডে আল্লাহর ইবাদতের অধিকার

আল্লাহর ইবাদতের লক্ষ্যে নির্মিত ভূখণ্ডের সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম স্থাপনা হলো বাইতুল্লাহ। ইসলাম-পূর্ব জাতিসমূহের উপাসনার জন্য মসজিদই ছিল একমাত্র স্থান। নির্ধারিত স্থানের বাইরে তাদের ইবাদত-বন্দেগি আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশেষ নবির জন্য সমগ্র পৃথিবীকে মসজিদে পরিণত করেছেন। এ উম্মতের প্রতি এটি আল্লাহর সবিশেষ অনুগ্রহ। এর ফলে উম্মতে মুহাম্মদি ভূখণ্ডের যে কোনো পবিত্র স্থানে নামায আদায় করার সুযোগ লাভ করে। মসজিদের আবাদ ও তত্ত্বাবধানের একচ্ছত্র অধিকার মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত। তবে যুগে যুগে অমুসলিমরা জোরপূর্বক মসজিদ দখল করেছে। আবার অনেকে করেছে ধ্বংস।

মক্কার পৌত্তলিক আদালত পৃথিবীর বুকে নির্মিত সর্বপ্রথম গৃহ বাইতুল্লাহ দখল করে একটি ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করে। 'আজ থেকে এখানে আল্লাহর একত্ববাদের পরিবর্তে গাইরুল্লাহর বহুত্ববাদী পূজা চলবে এবং তাওহিদে বিশ্বাসী কোনো মুসলিমের জন্য বাইতুল্লায় প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো'। আদালতের রায় বাস্তবায়নকারী মুশরিক সমাজপতিদের এ সিদ্ধান্তবলে

পৌত্তলিকরা কা'বা অভ্যন্তরে গাইরুল্লাহর অসংখ্য মূর্তি স্থাপন করে এগুলোর উপাসনা শুরু করে। তারা বাইতুল্লাহর চারপাশে উলঙ্গ তাওয়াফ করতে লাগলো। মসজিদের ধ্বংসসাধন ও এতে মূর্তি স্থাপনের ইতিহাস অতি প্রাচীন। বুখতনসর ও রোমান খ্রিস্টানগণ পৃথিবীর বুকে নির্মিত দ্বিতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাদ্দাস বারেবারে ধ্বংস করেছে। জবরদখলকারী অনেক অমুসলিম শক্তি বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করেছে। ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহা কর্তৃক কা'বা ধ্বংসের ইতিহাস ও তার পরিণতি সর্বজনবিদিত। যুগে যুগে ইসলামের বৈরি শক্তি অনেক মসজিদে অগ্নিসংযোগ করেছে। ক্ষতিসাধন করেছে ইবাদতগাহের । ভেঙ্গে চুরমার করেছে অসংখ্য উপাসনালয়। মসজিদ ধ্বংস করা একটি গর্হিত কাজ ও নির্ঘাত পাপাচার। মসজিদে দখলদারিত্ব কায়েম করে গাইরুল্লাহর পূজা করা এর চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ। সরাসরি মসজিদ ভাঙ্গার পরিণতি নিজেদের ধ্বংসই ত্বরান্বিত করে। আবরাহার হস্তিবাহিনীকে আবাবিল পাখি দ্বারা নিপাত করে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার তাৎক্ষনিক প্রমাণ দেখিয়েছেন। তবে আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মিত স্থানে গাইরুল্লাহর পূজা করার মতো সিদ্ধান্ত পরাধীনতার অশনি সংকেত ও জাতিসত্ত্বা বিলুপ্তির নিশ্চিত লক্ষণ।

ভারতের অযোধ্যা নগরীতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্টাতা জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর কর্তৃক নির্মিত মসজিদটি বাবরী মসজিদ নামে খ্যাত। প্রায় পাঁচশত বছর পর্যন্ত এটি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে ছিল মুখরিত-প্রাণবন্ত। ভারতের উগ্রবাদী দল বিজেপি রাজনৈতিক হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম এতে বিতর্কের সূচনা করে। অবশেষে আদালতের বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে মসজিদের স্থলে রামমন্দির নির্মাণের রায় আদায় করে নেয়। ভারত সরকারের হঠকারী এ সিদ্ধান্তে খোদায়ি গযবের লেলিহান শিখায় পৃথিবী উত্তপ্ত হতে থাকে। তাবৎ মুসলিম বিশ্বের হৃদয় মানসে ঘটে প্রচুর রক্তক্ষরণ। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। সুপ্রতিষ্ঠিত একটি ঐতিহাসিক মসজিদকে মন্দিরে রূপান্তরের প্রতিকারে মুসলিম সমাজের করণীয় কী? মুসলিম বিশ্বের এমন ক্রান্তিকালে সমাধান দেয়ার অথরিটি কে? এ বিষয়ে পুরো জাতি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একমাত্র মুসলিম উম্মাহ'র খলিফার পক্ষেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া সম্ভব। তবে আবরাহা কর্তৃক বাইতুল্লাহ ধ্বংসের প্রাক্কালে কা'বার মুতাওয়াল্লি আবদুল মুত্তালিব এর বিবেচনাপ্রসূত পদক্ষেপটি ছিল মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য শিক্ষণীয়। মোদী-অমিত শাহ'র পূর্বসূরী আবদুল মুত্তালিব ছিল কা'বার অভিভাবক ও

তত্ত্বাবধায়ক। কুরাইশ বংশের পৌত্তলিক সমাজের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল খানায়ে কা'বায়। তারা বাইতুল্লাহর অবকাঠামো অক্ষুণ্ন রেখেই তাতে মূর্তিপূজা করেছে। মসজিদ ভাঙ্গা ও মন্দির গড়ার রাজনীতি তখনো তাদের মাথায় ঢোকেনি। বাইতুল্লাহ'র দখলদারিত্ব অন্যের হাতে চলে যাবে এমন চিন্তা তারা কখনো করেনি। মক্কার অলিন্দ-গলিতে মুশরিকদের ক্ষমতা ছিল অবাধ ও নির্ঝঞ্ঝাট। মক্কার উপকণ্ঠে বহুত্ববাদ বিরোধী রাজনীতির কানাঘুষাও তখন ছিল না।

অতীতকালে মসজিদের প্রতি মুশরিকদের ভক্তি-শ্রদ্ধায় কখনো ঘাটতি ছিল না। মন্দিরের নিয়েও ছিল না কোনো মুসলিমের বিবাদ-বিদ্বেষ। বাল্যকালে অনেক সনাতন ধর্মীয় নারীদের মসজিদ চত্বরে সিজদা করতে দেখেছি। এখনো অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু জনগোষ্ঠীকে মসজিদের প্রতি মাথানত করে কিংবা দু'হাত উঁচিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখা যায়। ব্যতিক্রম শুধু মোদী-অমিত শাহ ও তাদের কতিপয় উগ্রবাদী অনুসারী। সাধারণ মুশরিকগণ পূর্বপুরুষের অনুকরণে মূর্তিপূজা করলেও মসজিদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ এখনো অটুট রয়েছে। মক্কার কাফেররা মনে করতো, কা'বা তত্ত্বাবধানে তাদের অধিকার সর্বময় ও নিরঙ্কুশ। এ ক্ষেত্রে আবদুল মুত্তালিব ও পৌত্তলিক কুরাইশদের ভূমিকা ছিল রক্ষকের। পক্ষান্তরে বাবরী মসজিদের ক্ষেত্রে মোদি-অমিত শাহ এর পদক্ষেপটি ছিল ভক্ষকের। ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত মসজিদসমূহে সরকারি তত্ত্বাবধান না থাকায় আদালতকে ব্যবহার করে তাতে আধিপত্য কায়েম করে। যা তাদের জন্য হিতে বিপরীত হবার সমূহ আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মক্কার মূর্তিপূজারীরা আবরাহার আক্রমণ থেকে আল্লাহর কুদরতে নিস্তার পেলেও মসজিদে মূর্তি পূজার শাস্তি হিসেবে আরবে মুশরিক শাসনের পতন ঘটে। পরাধীনতার সেই অশনি সংকেত বাস্তবে রূপায়িত হয় মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে। আরব উপদ্বীপে চিরদিনের জন্য রচিত হয় পৌত্তলিকতার কবর। মক্কা বিজয়ের পরের বছর আবু বকর সিদ্দিক (রাদি.) এর নেতৃত্বে মুসলমানগণ হজ পালন করেন। আমিরুল হাজ আবু বকর সিদ্দিক (রাদি.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষে দ্বীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন,

أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

“পরের বছর থেকে কোনো মুশরিক মক্কায় হজ করতে পারবে না এবং মক্কা

চত্বরে মুশরিকদের উলঙ্গ তাওয়াফও নিষিদ্ধ করা হলো"।[১]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আরব উপদ্বীপে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের সহাবস্থান নিষিদ্ধের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করে বলেন,

أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

"আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের বের করে দাও"।[২]

আল্লাহ তা'য়ালা মসজিদ তত্ত্বাবধানের একচ্ছত্র অধিকার মুসলমানদের হাতে অর্পন করেন এবং মসজিদে হারামে অমুসলিমদের প্রবেশাধিকার চিরতরে রহিত করে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا﴾

"হে ইমানদারগণ! মুশরিকগণ একটি অপবিত্র জাতি। এ বছরের পর তারা যেনো মসজিদে হারামের ধারে কাছেও না আসে"।[৩]

আল্লাহর নির্দেশ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মনোকামনা উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) এর খিলাফতকালে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়। দ্বিতীয় খলিফা উমার (রাদি.) মুশরিকদের পাশাপাশি ইহুদি-খ্রিস্টনিদেরও আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়ন করেন। আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দীন ইসলামই আরব উপদ্বীপে স্বাধীনভাবে টিকে থাকবে। এটিই ছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের সর্বশেষ আকাঙ্ক্ষা। ইসলামের উদয়স্থল মক্কা-মদিনায় ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের সহাবস্থান না থাকাই ছিল উম্মতের প্রতি তার সর্বশেষ নির্দেশনা। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল আয়িশা (রাদি.) এর বরাতে বর্ণনা করেন,

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ, ২, পৃ. ১৫৩, হাদিস নং- ১৬২২।

[২] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৪, পৃ. ৯৯, হাদিস নং- ৩১৬৮।

[৩] আল কুরআন, ৯;২৮

كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ،

"উম্মতের প্রতি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বশেষ নির্দেশনা এই ছিল যে, আরব উপদ্বীপে দ্বি-ধর্মের উপস্থিতি মেনে নেয়া যায় না"।[১]

ভূখণ্ডকে আল্লাহর ইবাদত থেকে বঞ্চিত করা ও মসজিদ ধ্বংসের চিরাচরিত শাস্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মিত মসজিদে ইবাদত করার ক্ষেত্রে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তাদের চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে? তাদের পরিণাম হলো, এক সময় তারা স্বদেশের সেই মসজিদে ভীত-সন্ত্রস্থ অবস্থায় প্রবেশ করবে। দুনিয়ার জীবনে তাদের জন্য রয়েছে অপমান আর পরকালে রয়েছে মহাশাস্তি"।[২]

মসজিদে আল্লাহর ইবাদত করতে বাধা সৃষ্টিকারীদের অবধারিত শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"যারা মসজিদে ইবাদতকারীদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা কেন শাস্তি দেবেন না? তারা তো আল্লাহর বন্ধু নয়। মুত্তাকিরাই আল্লাহর একমাত্র প্রিয়ভাজন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝতে পারে না"।[৩]

---

[১] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদ*, সম্পাদনা: শুআইবুল আরনাউত, (বৈরুত: মুয়াসসাসাহ আল রিসালা, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), খ, ৪৩, পৃ. ৩৭১, হাদিস নং- ২৬৩৫২।

[২] আল কুরআন, ২:১১৪।

[৩] আল কুরআন, ৮:৩৪।

আল্লাহর ইবাদতের নিমিত্তে নির্মিত মসজিদে তারই ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

"যারা কুফরি করেছে এবং আল্লাহর পথে ও মসজিদে হারামে বাধার সৃষ্টি করে। যাতে আমি স্বাগত ও বহিরাগত সকলের জন্য সম অধিকার দান করেছি। আর যারা এতে ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছে পোষণ করে, তাদেরকে আমি মর্মন্তুদ শাস্তি আস্বাদন করাবো।"[১]

লক্ষণীয় বিষয় হলো, মসজিদে আল্লাহর ইবাদতে বাধা প্রদানকারী এবং মসজিদ ধ্বংসের পরিকল্পনাকারীদের আল্লাহ তা'য়ালা সবচেয়ে বড় জালিম বলে আখ্যায়িত করেছেন। মুসলিম-অমুসলিম সকলের বিশ্বাস হলো জালিমের ইহকালীন শাস্তি অবধারিত। পরকালে অবিশ্বাসী তথা মক্কার মুশরিকদের জন্য এখানে যে ভয়াবহ শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে তা হলো, তারা স্বদেশে স্বাধীনভাবে বসবাসের অধিকার ও কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলবে। মসজিদে হারামে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হবে। যেভাবে বর্তমানে বিভিন্ন স্বাধীন দেশের মুসলিম নাগরিকদের মসজিদে প্রবেশে বাধা প্রদান করছে। একসময় তারাও সে মসজিদে প্রবেশে ভয়-ভীতি ও বাধার মুখোমুখী হবে। ভারত হলো উপমহাদেশের সুপ্রিম পাওয়ার, আমেরিকার বিশ্বস্ত অনুচর ও ঘনিষ্ট বন্ধু। কথায় আছে, 'আমেরিকা যার বন্ধু তার কোনো শত্রুর প্রয়োজন নেই'। পারমানবিক শক্তিসম্পন্ন একটি স্বাধীন জাতি নিজ দেশের একটি এলাকায় প্রবেশে কীভাবে বাধাগ্রস্থ হতে পারে? বিষয়টি অনুধাবণ করতে আমাদেরকে অতীত ইতিহাসে ফিরে যেতে হবে। চোখ বোলাতে হবে কুরাইশদের ইতিহাস ও মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপটে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে হারামে নামায আদায়ে বাধা প্রদান করার অপরাধে অথবা হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে সূরা বাকারার উপর্যুক্ত ১১৪ নং আয়াতটি নাযিল হয়। মদিনার উপকণ্ঠে বিকাশমান সুপ্ত মুসলিম শক্তি

[১] আল কুরআন, ২২;২৫।

তখনো অনেক চড়াই-উৎরাই পার করছে। মুহুর্মুহু বেজে উঠছে যুদ্ধের দামামা। প্রতিনিয়ত হিমশিম খাচ্ছে আরবের সম্মিলিত বিরোধী শক্তির মোকাবেলায়। কিন্তু বাইতুল্লাহর উমরা করতে তাঁরা নবিকে বাধা দেয়ার পরিণামে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের পতনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

তাফসিরকারকদের মতে, যে প্রেক্ষাপটেই আয়াতটি নাযিল হোক না কেনো। আয়াতের বিধান তথা স্বাধীনতা হারানোর শাস্তি মসজিদ ধ্বংস ও এতে মূর্তি স্থাপনের সঙ্গে জড়িত সকলের জন্য প্রযোজ্য। তদুপরি ভারতের সঙ্গে মুসলমানদের অবধারিত যুদ্ধ তথা 'গাযওয়ায়ে হিন্দ' সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। যে যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ও কাফেরদের পরাজয়ের সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

নাইম ইব্ন হাম্মাদ (মৃ.২২৮)'আল ফিতান' গ্রন্থে সাফওয়ান বিন আমর এর বরাতে বর্ণনা করেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يَغْزُو قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي الْهِنْدَ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَأْتُوا بِمُلُوكِ الْهِنْدِ مَغْلُولِينَ فِي السَّلَاسِلِ، فَيَغْفِرُ اللهُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ، فَيَنْصَرِفُونَ إِلَى الشَّامِ، فَيَجِدُونَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالشَّامِ،

"আমার উম্মতের একটি দল ভারতে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করবেন। আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং পাপসমূহ মার্জনা করবেন। এক পর্যায়ে তারা মুশরিক শাসকগোষ্ঠীকে গ্রেফতার করে শামে নিয়ে যাবেন। তখন ঈসা (আ.) ইব্ন মারয়ামকে শামে দেখতে পাবেন"।[১]

নাইম ইব্ন হাম্মাদ আরো বর্ণনা করেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يَبْعَثُ مَلِكٌ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ جَيْشًا إِلَى الْهِنْدِ فَيَفْتَحُهَا، فَيَطَئُوا أَرْضَ الْهِنْدِ، وَيَأْخُذُوا كُنُوزَهَا، فَيُصَيِّرُهُ ذَلِكَ الْمَلِكُ حِلْيَةً لَبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَيُقْدِمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْجَيْشُ بِمُلُوكِ الْهِنْدِ مُغَلَّلِينَ، وَيُفْتَحُ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ

[১] নাইম ইব্ন হাম্মাদ, *আল ফিতান*, সম্পাদনা: সামির আমিন আল যুহাইরি, (কায়রো: মাকতাবাহ আল তাওহিদ, ১৪১২ হি.), খ. ১, পৃ. ৪০৯, হাদিস নং- ১২৩৬।

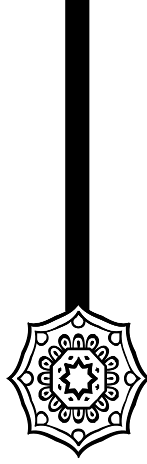
وَالْمَغْرِبِ، وَيَكُونُ مَقَامُهُمْ فِي الْهِنْدِ إِلَى خُرُوجِ الدَّجَّالِ

"বাইতুল মুকাদ্দাস এর একজন মুসলিম শাসক ভারত অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করবেন। এ অভিযানে তারা বিজয় লাভ করবেন। তারা সমগ্র ভারতের ধনভাণ্ডার আয়ত্ব করে তা দিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস এর শোভাবর্ধণ করবেন। মুসলিম বাহিনী ভারতের শাসকগোষ্ঠীকে বন্দি করবে। তারা পূর্ব-পশ্চিমে পরিচালিত সকল যুদ্ধেও বিজয় লাভ করবে। সময়টি হবে দাজ্জাল এর আগমনের পূর্বমুহূর্তে" ।[১]

আল কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ ও ফিতান সম্পর্কীয় হাদিস দ্বারা বাবরী মসজিদে নামায আদায়ে বাধা প্রদানকারী ও মসজিদের স্থলে মন্দির নির্মাণকারী ভারতের পতনের আভাস পাওয়া যায়। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় ও সরকারের জাতীয় সিদ্ধান্তের কারণে বিজেপির হাতেই ভারতের পতন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মহানবির ভবিষ্যদ্বাণী ও বিশ্ব মানচিত্রের ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে ইমাম মাহদি, দাজ্জাল ও ঈসা (আ.) এর আগমন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এর পূর্বেই বিশ্ব মুসলিম গাযওয়ায়ে হিন্দে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এবং পৌত্তলিক মোদী সরকারের অত্যাসন্ন পরাজয়ের অধীর আগ্রহে প্রহর গুণছে ।



[১] প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০৯, হাদিস নং- ১২৩৫।



ইসলামে শিশু অধিকার

ভূমিষ্টকালীন ব্যক্তির প্রাথমিক রূপকে শিশু (Child) বলে। যে এখনও যৌবনপ্রাপ্ত হয়নি কিংবা বয়ঃসন্ধিক্ষণে প্রবেশ করেনি, সমাজ ও রাষ্ট্রে সে শিশু হিসেবে স্বীকৃত। সচরাচর যে ছেলে বা মেয়ের বয়স ১৮ বছরের নিচে সে শিশু হিসেবে বিবেচিত। কখনো কখনো অনাগত সন্তান অর্থাৎ যে সন্তান এখনো ভূমিষ্ট হয়নি বা মায়ের গর্ভে অবস্থান করছে সেও শিশুরূপে পরিগণিত। একজন ব্যক্তি তার পিতা-মাতার কাছে সবসময়ই সন্তান বা শিশু হিসেবে গণ্য।[১]

জীববিজ্ঞানের ভাষায়- মনুষ্য সন্তানের জন্ম এবং বয়ঃসন্ধির মধ্যবর্তী পর্যায়ের রূপ হচ্ছে শিশু। চিকিৎসা শাস্ত্রের সংজ্ঞানুযায়ী মাতৃগর্ভে ভ্রুণ আকারে অ-ভূমিষ্ঠ সন্তানই শিশু।[২]

---

[1] For exampole, the US Socil Security department speci ficaly defines an adult child as being over 18.

[2] Shorter Oxford english Dictonary 397(6th ed. 2007) which'first definition is " A fetus, an infant,...

ইসলাম পিতা-মাতার উপর সন্তানের কিছু অধিকার বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে। পিতা-মাতার অবর্তমানে তাদের বৈধ অভিভাবকের উপর এ অধিকার ও দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ রয়েছে। শিশুর দৈহিক ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের লক্ষ্যে এটি অত্যাবশ্যকীয়। আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যতের নির্মাতা। কোনো জাতির দীর্ঘস্থায়িত্বের নিমিত্তে শিশুর পরিচর্যার বিকল্প নেই। দাম্পত্য জীবনে ইসলাম অধিক সন্তান গ্রহণের প্রতিও উৎসাহিত করেছে। আল কুরআনে এটিকে একটি বিশেষ নেয়ামত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পর বলা হয়েছে।

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾

"আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের নিজ সত্ত্বা থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে তোমাদের সন্তান ও নাতি-পুতি সৃষ্টি করেছেন"[১]।

উম্মতের গৌরবদ্বীপ্ত এ প্রজন্মের সূচনা হয় শৈশবকাল থেকে। এ সময় থেকে তাদেরকে আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তোলা পিতা-মাতার একান্ত কর্তব্য। শিশুর সুশিক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে ভূমিষ্ঠের পর তার কানে আযান-ইকামতের সুন্নাত প্রবর্তন করা হয়েছে। নিম্নে শিশুর অধিকারসমূহ আলোচনা করা হলো-

বেঁচে থাকার অধিকার

প্রতিটি শিশু সুস্থ-সবলভাবে বেঁচে থাকা আল্লাহ প্রদত্ত একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। জাহিলি সমাজ দরিদ্রতা ও লজ্জার অজুহাতে কন্যা শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতো। এ ঘৃণ্য কাজের পরিণাম সম্পর্কে আল কুরআনে বর্ণিত আছে,

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

"নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার কারণে যারা নিজ সন্তানদের হত্যা করেছে, তারা নির্ঘাত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।"[২]

---

[১] আল কুরআন, ১৬;৭২।
[২] আল কুরআন, ৬;১৪০।

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاء مَا يَحْكُمُونَ﴾

"তাদেরকে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলে ক্রোধে তাদের চেহারা কালোবর্ণ ধারণ করতো। এ মন্দ খবরে তারা সমাজ থেকে নিভৃত্তে জীবন যাপন করতো। অপমান সহ্য করে কন্যা শিশুটি বাঁচিয়ে রাখবে, নাকি মাটিতে দাফন করে দেবে। তাদের ফয়সালা কতই না নিকৃষ্ট"।[১]

এ হত্যাযজ্ঞের বিষয়ে কিয়ামতের দিন তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾

"জীবন্ত সমাহিতদের ব্যাপারে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। কী অপরাধে তাদের হত্যা করা হয়েছে"।[২]

বর্তমান আধুনিক সমাজের 'ভ্রূণ হত্যা'ও জীবন্ত কবরস্ত করার অন্তর্ভুক্ত। সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, মায়ের গর্ভে সন্তান চল্লিশ দিন অতিবাহিত হবার পর তার হায়াতের সূচনা হয়। কারো অপকর্মে ভ্রূণ হত্যা প্রমাণিত হলে তার উপর ক্ষতিপূরণ আদায় করা ইসলামি শরি'য়তের অকাট্য বিধান। ইসলামে অনুপ্রবেশকারী নারীদের বাই'য়াত করার সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এ বিষয়ে শর্তারোপপূর্বক ওয়াদা নিতেন। গর্ভস্ত সন্তানের জীবন সংহার অথবা দুর্বলতার আশংকা হলে গর্ভধারণকারী নারীর ক্ষেত্রে রমজান মাসে রোজা না রাখার বিধান কার্যকর রয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ভস্ত শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে মাকে দুইবার নির্দেশ প্রদান করে ইরশাদ করেন,

لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ مَرَّتَيْنِ

---

[১] আল কুরআন, ১৬:১৮।
[২] আল কুরআন, ৮১:০৮।

"মা যেনো তার সন্তানের উপর অত্যাচার না করে"।[১]

বর্ণিত আছে, খলিফা উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) একদা মদিনার রাস্তায় ছদ্মবেশে বের হয়েছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন, মদিনার উপকন্ঠে একটি কাফেলা যাত্রাবিরতি করেছে। খলিফার সঙ্গী সাহাবি আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রাদি.) তাদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও পাহারার ব্যবস্থা করলেন। ইতোমধ্যে কাফেলার একটি শিশু কেঁদে উঠল।

তিনি শিশুটির মাকে দুধ পান করানোর নির্দেশ দিলেন। ইতোমধ্যে আরেকটি সন্তান কেঁদে উঠলে ঐ শিশুর মাকে ধমক দিয়ে শিশুটিকে দুধ পানের আদেশ করলেন। শিশুটির মা বললো, আপনি আমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করছেন কেনো? আমি অচিরেই শিশুটির দুধ ছাড়িয়ে ফেলবো। তিনি প্রশ্ন করলেন, কেনো? মহিলাটি জবাব দিলো। খলিফা উমার শিশুদের দুধ ছাড়ানোর পরেই তাদের ভাতা নির্ধারণ করেন। সাহাবি আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রাদি.) বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি ধ্বংস হও। তোমার কারণে অনেক মুসলিম সন্তানের জীবন নষ্ট হয়েছে। তুমি এখনই তড়িৎ ফরমান জারি করো। যেনো ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই শিশুরা ভাতা পায়।

শিশুর স্বার্থ রক্ষায় ইসলাম গর্ভবতী নারীদের বিবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। রোঝার বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

> "যারা রোঝা রাখতে অক্ষম, তারা মিসকিনদের খাদ্য প্রদানপূর্বক ফিদ্‌য়া আদায় করবে"।[২]

ইব্‌ন আব্বাস (রাদি.) এর মতে, অক্ষম বলে এখানে গর্ভধারণকারী ও দুগ্ধদানকারী নারীদের বোঝানো হয়েছে। তারা রোঝা রাখতে সক্ষম হলেও সন্তানের সুবিধার্থে তাদের জন্য এ বিধান রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে তারা শুধুমাত্র ফিদ্‌য়া আদায় করবে। তাদের উপর কাজা করার বিধান প্রযোজ্য হবে না। নয় মাস গর্ভধারণ ও দীর্ঘ দুই বছর দুধপান করানোর পর রমজানের রোঝা কাজা

---

[১] নাসায়ি, আবু আবদির রহমান আহমদ ইব্‌ন শু'আইব ইব্‌ন আলি আল খোরাসানি, *সুনানু নাসায়ি*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৫৫, হাদিস নং -৪৮৩৯।

[২] আল কুরআন, ২:৮৪।

করার হুকুম তাদের জন্য যথেষ্ট কষ্টসাপেক্ষ বিধায় এ সুযোগ দান করা হয়েছে। নারীদের জন্য এ সুযোগ একমাত্র গর্ভস্থ ভ্রুণের সুস্থতা ও দুধ পানকারী শিশুর সু স্বাস্থ্যের কারণেই। গর্ভস্থ সন্তানের জীবন সংহারের আশংকা হলে, গর্ভধারণকারী নারীর জন্য হারাম বস্তু ভক্ষণ করাও শরি'য়তে বৈধতা দেয়া হয়েছে।

বংশ পরিচয় ও জাতীয়তার অধিকার

আল্লাহ তা'য়ালা এ পৃথিবীকে মানুষের বাসস্থানরূপে সৃষ্টি করেছেন। কোনো আদম সন্তানকে জাতীয় পরিচয় ও রাষ্ট্রহীন সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষ নিজেদের স্বার্থে এ ভূখণ্ডে বিভাজনের প্রাচীর নির্মাণ করেছে। পৃথিবীতে প্রচলিত আইনে পিতার জন্মস্থানই শিশুর জাতীয়তার পরিচায়ক। এ বিশাল ভূখণ্ডে ভূমিষ্ট কোনো শিশুকে রাষ্ট্রহীন করা আন্তর্জাতিক আইনেরও পরিপন্থি। দেশ ও পিতৃ-পরিচয় শিশুর অন্যতম অধিকার। পিতার মাধ্যমেই শিশুর বংশ সাব্যস্ত হয়। আর দেশের মাধ্যমে হয় তার জাতীয়তা। কারো বংশ-পরিচয় গোপন করা, অস্বীকার করা বা ভিন্ন বংশে শিশুকে পরিচিত করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ﴾

"তোমাদের পালিত সন্তানগণকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রকৃত সন্তান সাব্যস্ত করেননি। এটা তোমোদের মৌখিক বুলি। প্রকৃত সত্য একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই বলেন। তিনিই সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। পালক সন্তানদের তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাকো। আল্লাহর নিকট এটিই অধিকতর ন্যায়বিচার।[১]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

"যে ব্যক্তি জেনেশুনে কোনো শিশুকে তার পিতা নয় এমন ব্যক্তির নিকট

[১] আল কুরআন, ৩৩;৪।

সম্বন্ধ করে, তার জন্য জান্নাত হারাম"।[১]

বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভে ভূমিষ্ঠ শিশুকেও কোনো স্বামী পরের সন্তান বলে দাবি করতে পারে না। এতে শরি'য়তসম্মত দলিল-প্রমাণ ব্যতিরেকে স্ত্রীকে ব্যভিচারে অভিযুক্ত করার শামিল।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عن أبي هريرة جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ":هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ":فَمَا أَلْوَانُهَا؟" قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ":هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟" قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ":فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟" قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ":وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ

"আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, জনৈক বেদুইন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আগমন করে বললো, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, তোমার কি উট আছে? লোকটি বললো হ্যাঁ। তিনি বললেন, এগুলো কী বর্ণের? লোকটি বললো, লাল। তিনি বললেন, এ উটগুলোর মধ্যে কি সাদা-কালো বর্ণের (ভিন্ন রঙের) কোনো উট আছে? লোকটি বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ রঙ কোত্থেকে আসলো? লোকটি বললো, সম্ভবত এই উটগুলো পূর্বপুরুষের কারো বর্ণ ধারণ করেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সম্ভবত তোমার এ সন্তানটিও পূর্বপুরুষের কারো রঙ ধারণ করেছে"[২]।

অনুরূপভাবে স্ত্রীর জন্যও এ অধিকার নেই যে, সে ভিন্ন পুরুষের ঔরষে প্রাপ্ত কোনো সন্তানকে নিজ স্বামীর দিকে সম্পর্কিত করবে।

﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৫, পৃ. ৫৬।

[২] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৭, পৃ. ৫৩।

আয়াতে এ ধরনের অপকর্ম পরিত্যাগ করার জন্য নারীদের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। ভিন্ন বংশের কোনো সন্তানকে নিজ বংশের প্রতি সম্পর্কিত করাও ইসলামে হারাম ঘোষিত হয়েছে। এতে শিশুর মূল বংশ-পরিচয় বিলুপ্ত হয়। যার ফলে শিশু অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এতে উত্তরাধিকার সম্পদ, বিয়ের অধিকার ও অনুপ্রবিষ্ট সন্তানের সঙ্গে পিতার সম্পর্ক নির্ণয়ে নানাবিধ জটিলতার সম্মুখীন হয়।

সুন্দর ও অর্থবোধক নামকরণের অধিকার

ভূমিষ্ঠ হবার পর সপ্তম, চতুর্দশ কিংবা একবিংশতম দিনে শিশুর একটি সুন্দর ও অর্থবোধক নাম রাখা পিতার কর্তব্য। এটি শিশুর মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। পরিবার প্রদত্ত এ নামেই কিয়ামতের দিন শিশুকে ডাকা হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ

> "নিজের ও পিতার নাম নিয়ে তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন ডাকা হবে। অতএব তোমরা শিশুদের সুন্দর নাম রেখো"।[১]

আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান সর্বাধিক উত্তম নাম। নবি-রসূলদের নামে সন্তানের নামকরণ অতীব বরকতময়। 'মুহাম্মদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামের অনেক ফজিলত অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত। এটি বর্তমান পৃথিবীর সর্বাধিক জনপ্রিয় নাম। ইমাম মালিক রহ. বলেন, আমি মদিনাবাসীর অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি, যে ঘরে মুহাম্মদ নামের কোনো সন্তান আছে, সে ঘরে উত্তম রিযিক এর সুন্দর ব্যবস্থা হয়। হাদিস শরিফে এমন কিছু নাম পাওয়া যায়, যা অত্যন্ত বরকতময়। আবার এমন কিছু নামের সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম ও বুর্জুগানে দীনের নামানুসারে শিশুর নামকরণ করা অধিকতর উত্তম।

আত্মসম্মানের অধিকার

শিশু-সত্ত্বা তার বয়সের স্বল্পতা ও ক্ষুদ্র গঠনের অনুপাতে ন্যায্য ইজ্জত-সম্মানের

---

[১] ইব্ন হিব্বান, আবু হাতিম মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহমদ, *সহিহ ইব্ন হিব্বান*, (বৈরুত: মুয়াসসাসা আল রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ হি.), খ. ১৩, পৃ. ১৩৫।

অধিকার রাখে। শিশুর অধিকার রক্ষায় ইসলাম নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পিতা-মাতাসহ পুরো পরিবারের জন্য সন্তানের জন্ম আনন্দের বিষয়। এ আনন্দের শুকরিয়া আদায় করা ও শিশুর ইজ্জতের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুর জন্মের পর আকিকার বিধান প্রবর্তন করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু-সত্ত্বার সম্মানার্থে অনেক সময় নামায সংক্ষিপ্ত করতেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وإن كان ليسمعُ بكاءَ الصَّبِيِّ فيخفِّفُ مخافةَ أن تُفْتَتَنَ أُمُّه

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত অবস্থায় শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনে নামায সংক্ষিপ্ত করতেন। তাদের মায়েদের সংশয়ে আক্রান্ত হবার ভয়ে"।[১]

আমর ইব্‌ন সালামা (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

كُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ : "يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ " وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين

"আমি কিশোর বয়সে কুরআনের অনেকাংশ মুখস্ত করেছি। আমার পিতা ও আমার মাতামহ স্বজাতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গমন করেন। তিনি তাদেরকে নামাযের আহকাম শিক্ষা দানপূর্বক বলেন, তোমাদের মধ্যে যে কুরআন সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী, সে নামাযের ইমামতি করবে। কুরআন সম্পর্কে আমার জ্ঞান বেশি থাকার কারণে গোত্রের লোকেরা আমাকে ইমামতির দায়িত্ব প্রদান করতো। সাত অথবা আট বছর বয়সে আমি আমার গোত্রে নামাযের ইমামতি করতাম"।[২]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সাহাবায়ে কেরাম এর অধিবেশনে

---

[১] ইব্‌ন হিব্বান, আবু হাতিম মুহাম্মদ ইব্‌ন হিব্বান ইব্‌ন আহমদ, *সহিহ ইব্‌ন হিব্বান*, (বৈরুত: মুয়াসসাসা আল রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ হি.), খ. ৫, পৃ. ৫১১।

[২] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্‌ন আশ'আস আল সাজিসতানি, *সুনানু আবি দাউদ*, (বৈরুত: মাকতাবাহ আল আসরিয়্যাহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, তা/বি.) খ. ১, পৃ. ১৫৯।

উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় একজন ব্যক্তি একটি পানপাত্র নিয়ে উপস্থিত হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ডানে বসা ছিল একজন অল্পবয়সী বালক। বামে ছিলেন জলিলুল কদর কয়েকজন সাহাবি। ডান দিক থেকে খাবার পরিবেশন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সাংঘর্ষিক দু'টি নিয়মের বিধিবদ্ধ নিয়মানুযায়ী আপ্যায়নকারী ব্যক্তি ডানে উপবিষ্ট বালক থেকে অনুমতি চেয়ে বললেন,

أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ ؟ ، فَقَالَ الغُلاَمُ : لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا

"তুমি অনুমতি দিলে আমি বাম পাশে উপবিষ্ট মুরুব্বি ও বয়ষ্ক সাহাবিদের প্রথমে খাবার পরিবেশন করতে পারি। বালকটি অকুণ্ঠচিত্তে উত্তর দিল, আল্লাহর কসম! আপনার পক্ষ থেকে আমি যে বরকতের অধিকার প্রাপ্ত হয়েছি, তাতে কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না"।[১]

তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! ডানে বসার কারণে আপনার পরে পান করার অধিকার আমার। যে পাত্রে আপনার পবিত্র মুখ লেগেছে, তার বরকত আমি অন্য কাউকে দিতে চাই না। এ কথা শোনার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রটি বালককে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

দুধ পানের অধিকার

জন্মের পর দুই বছর পর্যন্ত শিশু মায়ের দুধ পান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। শিশুর কল্যাণকর দিক উপেক্ষা করে দুই বছর পূর্ণ হবার পূর্বে দুধপান বন্ধ করা পিতা-মাতার জন্য জায়েয হবে না। দুধ পানের ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব হলো পিতার। দুগ্ধ পানকারী মহিলার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার মতো গুরুদায়িত্ব পালন করা পিতার কর্তব্য। পিতার অবর্তমানে শিশুর বৈধ অভিভাবক এ দায়িত্ব পালন করবে। শিশুর মা দুধ পানে অপারগতা প্রকাশ করলে পিতা তার দুধ-পানজনিত ব্যয়ভার প্রত্যাহার করে নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে দুই বছর পূর্ণ করার নিমিত্তে অন্য একজন দুধপানকারী মহিলা নিযুক্ত করা পিতার কর্তব্য। দুধ

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, সহিহ আল বুখারি, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৭, পৃ. ১১১, হাদিস নং- ৫২২০।

পান করার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে আল কুরআনে বর্ণিত আছে,

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে। এ বিধান তাদের জন্য প্রযোজ্য, যারা মেয়াদ পরিপূর্ণ করতে ইচ্ছুক। এ ক্ষেত্রে শিশুর পিতাকে দুধ পানকারী মায়ের ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণ আদায় করতে হবে। কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেয়া যাবে না। শিশুর কারণেও কোনো মাকে কষ্টে ফেলা যাবে না। শিশুর অভিভাবকের জন্যও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য। মাতা-পিতা উভয়ে সন্তুষ্টচিত্তে ও পরামর্শের ভিত্তিতে মেয়াদপূর্তির পূর্বে শিশুর দুধ ছাড়াতে চাইলে কোনো অসুবিধা নেই। ন্যায়সঙ্গত পাওনা আদায়পূর্বক শিশুর জন্য কোনো দুধ পানকারী নিযুক্ত করতে তোমাদের কোনো সমস্যা নেই"।[১]

খাদ্য ও আনুসঙ্গিক অধিকার

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ জীবনযাত্রার আনুসঙ্গিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী একজন শিশুর ন্যায্য অধিকার। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

"যারা খাদ্যসামগ্রী পাবার ন্যায্য অধিকারী, তাদের নিকট থেকে তা প্রত্যাহার করে নেয়া একজন মানুষের পাপী হওয়ার জন্য যথেষ্ট"।[২]

আবু সুফ্য়ান (রাদি.) এর স্ত্রী হিন্দা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন,

---

[১] আল কুরআন, ২;২৩৩।

[২] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ. ২ পৃ. ৬৯২, হাদিস নং- ৯৯৬।

إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ . فَهَلْ عَلَىَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ

"আবু সুফ্য়ান একজন কৃপণ প্রকৃতির লোক। আমার এবং আমার সন্তানের প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণ সে আদায় করে না। তবে তার অগোচরে আমি যা কিছু তার নিকট থেকে গ্রহণ করি। এতে কি আমার পাপ হবে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার এবং তোমার সন্তানের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করার অধিকার তোমার রয়েছে"।[১]

এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, স্বামীর অগোচরে তার বিনানুমতিতে নিজের ও নিজের সন্তানের জীবিকার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সম্পদ গ্রহণ করা স্ত্রীর জন্য বৈধ।

চিকিৎসার অধিকার

শিশুর সুস্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান থাকা মাতা-পিতার কর্তব্য। স্বাস্থ্য সুরক্ষার মূল উপাদান দুইটি। রোগ-ব্যাধির সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা ও রোগ-ব্যাধির আক্রমণে সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। স্বাস্থ্য সুরক্ষার একটি প্রধান উপকরণ হলো পুরুষের জন্য খতনা। যা ইসলামস্বীকৃত দশটি মৌলিক স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করে যে, খতনা লিঙ্গমুণ্ডের প্রদাহ ও মুত্রনালীর ক্যানসারের মতো হাজারো রোগ-ব্যাধির প্রতিশেধক। খতনাকৃত মুসলিম পুরুষের স্ত্রীগণ জরায়ু ক্যানসারের আশংকা থেকে মুক্ত থাকে। সাধারণ রোগীদের চিকিৎসার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদিসে গুরুত্বারোপ করা হলেও শিশুদের চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে ঝাড়-ফুঁক (رقية) সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। শিশুদের বদনজর সম্পর্কে আসমা বিনতে উমাইস (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقٌ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ

[১] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ. ৩, পৃ. ১৩৩৮, হাদিস নং- ১৭১৪।

"জা'ফর এর সন্তানগণ প্রায় সময় বদনজরে আক্রান্ত হয়। আমি কি তাদের ঝাড়-ফুঁক করবো? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তবে এটি তাকদিরে পূর্ব নির্ধারিত থাকলে তাকদিরই অগ্রগামী হবে"।[১]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইনকে (রাদি.) নিম্নবাক্য দ্বারা রোগ-ব্যাধির সংক্রমণ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন।[২]

اعوذ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

বিপদাপদ থেকে সুরক্ষার অধিকার

শিশুদের যাবতীয় বিপদাপদ থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা মাতা-পিতার কর্তব্য। শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তিদের পক্ষে সশস্ত্র সংগ্রাম করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ﴾

"তোমাদের কি হলো? তোমরা আল্লাহর পথে এবং দুর্বল নারী-পুরুষ ও শিশুদের পক্ষে সশস্ত্র সংগ্রাম করছো না কেন? [৩]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ أَوْ كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ،

"সন্ধ্যাকালীন সময়ে শিশুদের বাইরে যেতে বারণ করো। কেননা এ সময় শয়তান ছুটাছুটি করে"।[৪]

---

[১] তিরমিযি, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযি*, (বৈরুত: দারুল গারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪৬৩, হাদিস নং- ২০৫৯।

[২] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ২, পৃ. ১১৬৪, হাদিস নং- ৩৫২৫।

[৩] আল আল কুরআন, ৪;৭৫।

[৪] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ.৭, পৃ. ১১১, হাদিস নং- ৫৬২৩।

এমনকি শয়তানের যাবতীয় কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী–সহবাসের পূর্বে আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيَاطِينَ مَا رَزَقْتَنَا. فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شيطان أبدا،

"যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাসের সময় বলবে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে দূরে রাখুন এবং ভূমিষ্ঠ সন্তানকে শয়তানের নিয়ন্ত্রণ থেকে রক্ষা করুন। এ নিয়মে স্ত্রী-সঙ্গমের ফলে কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করলে, শয়তানে সে শিশুর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না"।[১]

খেলা-ধূলা ও বিনোদনের আধিকার

শিশুর মনন-মানসের বিকাশে খেলা-ধূলার ভূমিকা অপরিসীম। শরীর চর্চামূলক খেলা-ধূলা শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি তরান্বিত করে। এটি মানব জীবনের একটি কল্যাণকর দিক। ইসলাম শিশুর আবেগ-অনুভূতির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে শিশুর খেলা-ধূলার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছে। তীর নিক্ষেপের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فإِنَّ أَبَاكُمْ كانَ رَامِيًا،

"হে ইসমাইল (আ.) এর বংশধর! তোমরা তীর নিক্ষেপ করো। কেননা তোমাদের পিতা একজন তীর নিক্ষেপকারী ছিলেন"।[২]

আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي،

---

[১] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ. ২, পৃ. ১০৫৮, হাদিস নং- ১১৬।

[২] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৪, পৃ. ৩৮, হাদিস- ১২৮৩ ।

"আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গৃহে খেলার সঙ্গীনীদের নিয়ে খেলতাম। তিনি ঐ সকল বালিকাদের আমার নিকট পাঠাতেন। তারা আমার সঙ্গে খেলতো।"[১]

আবু দাউদ বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ما هذا ؟ قالَت : بَناتي قال : ما هذا الَّذي في وسْطِهِنَّ ؟ قالَت : فرسٌ قال : ما هذا الَّذي علَيهِ ؟ قالَت جَناحانِ قال : فرَسٌ لها جَناحانِ ؟ قالَت : أوَ ما سمِعتَ أنَّهُ كانَ لسُلَيمانَ بنَ داودَ خيلٌ لَهَا أجنِحَةٌ فضحِكَ رسولُ اللهِ حتَّى بدَت نواجِذُهُ

"হে আয়িশা! এগুলো কি? আয়িশা জবাব দিলেন, এগুলো আমার মেয়ে। তিনি নারী আকৃতিসম্বলিত খেলনাসমূহের মধ্যে একটি ঘোড়ার প্রতিকৃতি দেখতে পেলেন, যার দু'টি ডানা রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মধ্যখানের এটি কি? আয়িশা (রাদি.) উত্তর দিলেন। এটি ঘোড়া। তিনি বললেন, ঘোড়ার কি আবার ডানা থাকে? আয়িশা (রাদি.) উত্তর দিলেন, আপনি কি শোনেননি দাউদপুত্র সুলাইমান (আ.) এর একটি ঘোড়া ছিল। যার অনেকগুলো ডানা ছিল। আয়িশা (রাদি.) এর কথা শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলেন। এতে তাঁর দাঁত মোবারক পরিদৃষ্ট হয়।"[২]

আয়িশা (রাদি.) থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ

"আমি মসজিদে নবভিতে সামরিক অনুশীলণে নিয়োজিত হাবশিদের

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৮, পৃ. ৩১ হাদিস নং- ৬১৩০।

[২] আবু দাউদ, সুলায়মান বিন আশ'আস আল সাজিসতানি, *সুনানু আবি দাউদ*, (বৈরুত: মাকতাবাহ আল আসরিয়্যাহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, তা/বি.) খ. ৪, পৃ. ২৮৩।

প্রদর্শিত খেলা দেখছিলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাদর দ্বারা আমাকে পর্দাবৃত করে রাখতেন, যাতে তাদের খেলা দেখতে আমার সুবিধা হয়।"[১]

আনাস (রাদি.) থেকে বর্ণিত, "রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের গৃহে আগমন করতেন। আমার এক ভাই ছিল, যার উপনাম আবু উমাইর। তার একটি পাখির ছানা ছিল, যা দ্বারা সে খেলতো। পাখির বাচ্ছাটি একদিন মারা যায়। একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের গৃহে এসে আমার ভাইকে চিন্তিত দেখে বললেন, তার বিষণ্নতার কারণ কি? তিনি জানতে পারলেন যে, তার পাখিটি মারা যাওয়ার কারণে সে বিষণ্নতায় ভোগছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৌতূকের স্বরে বললেন,

يا أبا عُمَيرُ! ما فعل النُّغَيرُ

"হে আবু উমাইর! তোমার ছোট্ট পাখিটির কী হলো?"[২]

ন্যায়বিচারের অধিকার

পরিবারে একাধিক সন্তান থাকলে তাদের প্রতি সুবিচার করা মাতা-পিতার কর্তব্য। ছেলে হোক, মেয়ে হোক, কোনো প্রকার ভেদাভেদ না করে আদর-স্নেহ, লেন-দেনসহ সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ পাওয়া প্রতিটি শিশুর অধিকার। সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার ন্যায়বিচারের অভাবে তাদের মাঝে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের উদ্রেক হতে পারে। আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

أن بشيرا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أكل ولدك نحلت مثل هذا قال لا فقال أرجعه، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم

"বশির নামক সাহাবি একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, আমি আমার এই সন্তানকে একটি গোলাম দান

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৭, পৃ. ৩৭।

[২] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদ*, (রিয়াদঃ মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, ১৪২১ হি./ ২০০১ খ্রি.), খ. ১৯, পৃ. ২৩৩। মুসলিম, হাদিস নং- ২১৫০।

করেছি। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি তোমার প্রতিটি সন্তানকে অনুরূপ অনুদান দিয়েছো? সে উত্তর দিলো, না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা প্রত্যাহার করে নাও। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সন্তানদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করো।"[১]

স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার

শিশু বয়স স্বাধীন মত প্রকাশের প্রতিবন্ধক নয়। এটি শিশুসুলভ শিষ্টাচারের পরিপন্থিও হতে পারে না। এ সময়ে সে নির্দ্বিধায় সত্য প্রকাশ করতে পারে। ইসলাম শিশুদের মত প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করে না। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাদি.) খলিফা উমার (রাদি.) এর পরামর্শ সভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবিদের মতের বিপরীতে নিজের সঠিক মত উপস্থাপন করতে কখনো কুণ্ঠিত হতেন না। খলিফা তাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করতেন। খলিফা উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) এর সঙ্গে শিশু আবদুল্লাহ ইব্ন আল যুবাইর এর কথোপকথন একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। খলিফা উমার (রাদি.) এর এক যাত্রাপথে কতিপয় শিশুর সাক্ষাৎ হয়। খলিফাকে দেখে শিশুরা ভয়ে পালিয়ে যায়। তবে আবদুল্লাহ যুবাইর না পালিয়ে সটান দাঁড়িয়ে থাকে। খলিফা উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) তাকে প্রশ্ন করলেন, অন্যদের ন্যায় তুমি পালাওনি কোনো? শিশু আবদুল্লাহ দৃঢ়চিত্তে জবাব দিলেন।

لَيْسَتِ الطَّرِيْقُ بِضَيِّقَةٍ عَلَيْكَ فَأَوْسَعُ لَكَ، وَلَمْ أَرْتَكِبْ ذَنْباً فَأَخَافُ مِنْكَ،

"এখানে রাস্তা এতো সংকীর্ণ নয় যে, আমি আপনার জন্য প্রশস্ত করে রাখবো। আর এমন কোনো অপরাধও আমি করিনি, যার কারণে আমি ভয়ে পালাতে বাধ্য হবো"।

আদর-স্নেহের অধিকার

সন্তানের বয়স, দুর্বলতা ও অক্ষমতার প্রেক্ষিতে তাদের প্রতি যথাযথ আদর ও স্নেহমূলক আচরণ করা পিতা-মাতার কর্তব্য। আদর-স্নেহ শিশুর একটি মৌলিক অধিকার। এ প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৩, পৃ. ১৫৭।

قبَّل النَّبِيُّ ﷺ الْحسنَ بنَ عَلِيٍّ رضي الله عنهما، وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشرةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلتُ مِنْهُمْ أَحدًا، فنَظَر إِلَيْهِ رسولُ الله ﷺ فقَالَ :مَن لا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আলি (রাদি.) এর পুত্র হাসানকে চুম্বন করলেন। আকরা' ইব্ন হাবিস (রাদি.) তার নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। আকরা' বললেন, আমার দশটি সন্তান আছে। তাদের কাউকে আমি কখনো চুম্বন করিনি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, যে অন্যের প্রতি সদয় হয় না, তার প্রতিও কেউ সদয় হয় না।" [১]

আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, একদল বেদুইন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আগমন করলো। তারা লোকদের প্রশ্ন করলো, তোমরা কি স্বীয় শিশুদের চুম্বন করো? তারা উত্তর দিলো, হ্যাঁ। তারা বললো, আল্লাহর কসম! আমরা আমাদের শিশুদের চুম্বন করি না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জবাবে বললেন, তোমাদের অন্তর থেকে আল্লাহ তা'য়ালা মায়া-মমতা ছিনিয়ে নিলে আমার কি তা রুখে দেয়ার ক্ষমতা আছে?"

স্বভাব-চরিত্র ও শিষ্টাচার শিক্ষার অধিকার

শিশু-মানস বেশ অনুকরণপ্রিয়। এ বয়সে শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব অতিশয় কার্যকর। শিক্ষার পাশাপাশি স্বভাব-চরিত্র সুগঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করা মাতা-পিতার কর্তব্য। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বস্তরের উম্মতের পাশাপাশি তার কর্তৃত্বাধীন শিশুদের সৎ স্বভাবে অভ্যস্ত করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। উম্মুল মুমিনিন উম্মু সালামা (রাদি.) এর পুত্র আমর ইব্ন আবি সালামা তার পিতার ইন্তেকালের পর মায়ের সঙ্গে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গৃহে বসবাস করতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুটির শিষ্টাচার শিক্ষার প্রতি বেশ তাগিদ দিতেন। সে একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে আহার করছিল। সাধারণ শিশুর ন্যায় সে পাত্রের এদিক সেদিক থেকে

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫/২০০৪), খ. ৭, পৃ. ৮।

বিক্ষিপ্তভাবে খেতে লাগলো। তিনি আমরকে বললেন,

يَا غلام، سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ ،

"হে প্রিয় বৎস! বিসমিল্লাহ বলে পানাহার করবে এবং নিজের সামনে থেকে ডান হাত দ্বারা আহার করবে"।[১]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাতে তিন আঙ্গুল দিয়ে খাবার গ্রহণ করতেন। খাবার শেষে পাত্র চেঁটে খেতেন। তিনি তিন শ্বাসে পানি পান করতেন। তিনি দাঁড়িয়ে পানাহার করতে নিষেধ করতেন"।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমির (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

أتى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بيتِنا وأنا صبيٌّ قال : فذهبتُ أخرجُ لألعبَ فقالت أمي : يا عبدَ اللهِ تعالَ أُعطيكَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : وما أردتِ أن تُعطيه ؟ قالت : أُعطيه تمرًا قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أما إنك لو لم تُعطِه شيئًا كُتبتْ عليكِ كَذِبةٌ

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদের বাড়িতে আসলেন। শিশু হিসেবে আমি খেলতে বের হচ্ছিলাম। আমার মা আমাকে ডেকে বললেন, এসো, তোমাকে কিছু খাবার দেবো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাকে বললেন,। তুমি তাকে কী দিতে চেয়েছিলে? আমার মা উত্তর দিলেন, খেজুর। তিনি বললেন, তুমি তাকে তা না দিলে তোমার আমলনামায় মিথ্যা বলার অপরাধ লেখা হতো"।[২]

মিথ্যা কথনের অভ্যাস থেকে শিশুদের দূরে রাখতে হলে শিশুদের সঙ্গে কৌতূকচ্ছলেও মিথ্য বলা পরিহার করা উচিত।

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ,১৪২৫/২০০৪), খ.৭, পৃ. ৬৮।

[২] আবু দাউদ, সুলায়মান বিন আশ'আস আল সাজিসতানি, সুনানু আবি দাউদ, (বৈরুতঃ মাকতাবাহ আল আসরিয়্যাহ, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, তা/বি.) খ. ৪, পৃ. ২৯৮, হাদিস নং-৪৯৯১।

মালিকানার অধিকার

ইসলামি শরি'য়তে শৈশবকালেও শিশুরা সম্পদের মালিকানার অধিকার লাভ করে। তবে শিশুসম্পদ বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে কেউ তাদের সম্পদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করবে। নিজের ধন-সম্পদে যথাযথ ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা অর্জনসাপেক্ষে শিশুর মালিকানায় তা ন্যস্ত করতে হবে। এ বিষয়ে মা'ন বিন য়াযিদ এর নিম্নোক্ত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য।

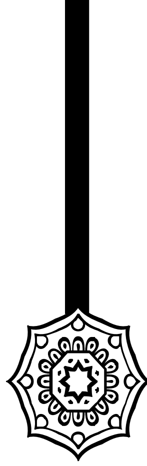
كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ بِهَا فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ :« لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذْتَ

"আমার পিতা কিছু দিনার সদকা করছিলেন, এগুলো মসজিদে অবস্থানরত কারো হস্তগত হয়। তাদের নিকট থেকে এগুলো আমার হাতে আসে। দিনারগুলো নিয়ে আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম। মা'ন বললেন, আল্লাহর কসম! এগুলো আমি তোমাকে দিতে চাইনি। আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, হে য়াযিদ! তুমি যা নিয়ত করেছো তার ফলাফল লাভ করেছো। আর হে মা'ন! তুমি যা গ্রহণ করেছো, তার মালিকানা তোমার"।[১]

মা'ন যে মাল গ্রহণ করেছে তা ফেরৎ দেয়ার নির্দেশ না দিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদে শিশুর মালিকানা সাব্যস্ত করলেন।



[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ,১৪২৫/২০০৪), খ. ২, পৃ ১১, হাদিস নং- ২২৯২।



ইসলামে যুবসমাজের অধিকার

যৌবন হলো মানব জীবনের বসন্তকাল। এর ব্যাপ্তিকাল পনেরো থেকে চল্লিশ বছর। পার্থিব উন্নতি, বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও পরকালীন অগ্রগতির বর্ণাঢ্য সময় যৌবনকাল। অদম্য সাহস, অনুপম শৌর্যবীর্য ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জীবনবাজি রাখা আদর্শ যুবকের চারিত্রিক ভূষণ। আল্লাহর দেয়া অযাচিত নেয়ামত যৌবনকে কাজে লাগিয়ে অসাধ্য সাধন করতে পারে একজন যুবক। বিশ্ব জয়ের বর্ণিল ইতিহাস যুবকদের কীর্তিগাঁথায় ভাস্বর হয়ে আছে। যুগে যুগে যুবকদের তপ্ত খুনের নযরানায় উড্ডীন হয়েছে ইসলামের ঝাণ্ডা। আল্লাহর পথে জান-মাল উৎসর্গ করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে মুসলিম দামাল যুবকেরা। ইমাম সা'আলাবি 'আল লাতায়েফ ওয়াত তারায়েফ' (اللطائف والطرائف) গ্রন্থে বর্ণনা করেন, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'নুবুওয়াতের প্রাথমিককালে যুবকরাই আমার প্রতি ঈমান এনেছে, অথচ বৃদ্ধরা করেছে বিরোধিতা'। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, 'গুনাহের প্রতি অনাসক্ত যুবকদের অল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ

করেন’। যৌবনকাল হলো স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও সকল প্রকার মহৎকর্ম সাধনের উপযুক্ত সময় এবং জ্ঞান অর্জনের মোক্ষম সুযোগ। যৌবনে জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাদি.) বলেন, “আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাকে জ্ঞান দান করেন যৌবনকালে। তদুপরি যৌবন হলো সকল কল্যাণের আধার”। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদি.) জ্ঞানী যুবক আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসকে (রাদি.) অভিজ্ঞ সাহবাবিদের জন্য আয়োজিত পরামর্শ সভায় আহ্বান করতেন। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদের দীনের প্রতি উৎসাহিত করে বলেছেন, ‘যুবকদের কল্যাণ কামনা করো। কেননা তাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল’।

ইসলামের ইতিহাসে যুবসমাজের অবদান

ইসলামের ইতিহাসে যুবসমাজের অবদান অতুলনীয়। আল্লাহ তা'য়ালা আল কুরআনে কতিপয় যুবকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এঁকেছেন এবং তাদেরকে যুবসমাজের আইডল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। নিষ্কলুষ চরিত্র গঠনে য়ুসুফ (আ.), শক্তিমত্তা ও আমানতদারিতে মূসা (আ.), ধৈর্যধারণ ও সত্যানুসন্ধিৎসায় ইবরাহিম (আ.), স্বাধীণচেতা ও উল্টোস্রোতে অবগাহনের ক্ষেত্রে আসহাবে কাহফ মানবেতিহাসের অনুপম আদর্শ। এসকল ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম উম্মাহকে তাদের অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছেন। যুগে যুগে প্রতিটি আন্দোলনের নেতৃত্ব ও পরিকল্পনা বয়োজ্যেষ্ঠদের বাগডোরে থাকলেও যুবকদের অকৃত্রিম আত্মোৎসর্গের কারণে বিপ্লব সফলতা লাভ করেছে। মূসা (আ.) এর দাওয়াতের সূচনায় যে কতিপয় ব্যক্তি সাড়া দিয়েছেন তারা ছিলেন যুবক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾

> “ফেরআউন ও তার গোত্রের অত্যাচারের ভয়ে মূসা (আ.) এর উপর কয়েকজন যুবক ব্যতীত কেউ ঈমান আনে নি। নিশ্চয় ফেরআউন পৃথিবীতে উদ্ধত হয়েছে এবং সে সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।”[১]

দীনের জন্য আত্মোৎসর্গের ইতিহাসে সাতজন যুবক একটি জ্বলন্ত নযির।

---

[১] আল কুরআন ১০;৮৩।

'আসহাবে কাহফ' নামাঙ্কিত যুবকদের ব্যাপারে আল কুরআনের ভাষ্য হলো,

﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾

"তারা এমন কতিপয় যুবক, যারা স্বীয় রবের প্রতি ঈমান এনেছে। আর আমি তাদের হেদায়ত বৃদ্ধি করেছি।"[১]

ইবরাহিম (আ.) এর প্রতি মূর্তি ভাঙচোরের অভিযোগ তুলে পৌত্তলিক মুশরিকগণ বললো,

﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾

"ইবরাহিম নামক এক যুবককে আমাদের দেব-দেবী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে শুনেছি"।[২]

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সর্বপ্রথম যারা ইসলাম কবুল করেছেন তারা ছিলেন সকলেই যুবক। আবু বকর সিদ্দিক (৩৮) উমার ইবনুল খাত্তাব (৩০) উসমান ইব্ন আফ্ফান (৩৮) আলি ইব্ন আবি তালিব (২০) যুবাইর ইবনুল আওয়াম (১৮) আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ (১৫) যাইদ ইব্ন সাবিত (২০) উসামা ইব্ন যাইদ (১৮)।

রণাঙ্গণে মুসলিম যুবকদের ভূমিকা

যৌবন আল্লাহর এক মহা নেয়ামত। মহৎকাজে জীবন উৎসর্গ করা যৌবনেরই বৈশিষ্ট্য। ইসলামে যৌবনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিবেচনায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবীণদের উপস্থিতিতেই যুবকদের হাতেই জিহাদের পতাকা তুলে দিতেন। ইসলামের প্রথম জিহাদ বদরে মুসলমানদের পতাকা ছিল কুরাইশের কিংবদন্তি যুবক আলি (রাদি.) এর হাতে। কথিত আছে, যুবকদের সাহসিকতার কারণেই বদর যুদ্ধে বিজয় সূচিত হয়েছিল। এ যুদ্ধকে যুবকদের যুদ্ধও (معركة الشباب) বলা হয়। তাবুক যুদ্ধে যুবকদের হাতেই ছিল স্ব স্ব গোত্রের পতাকা। প্রসিদ্ধ আল নাজ্জার গোত্রের পতাকা ছিল বিশিষ্ট সাহাবি যায়দ ইব্ন সাবিত (রাদি.) এর হাতে। উহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের আশঙ্কা সত্ত্বেও রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি নিজের ও জলিলুল কদর

---

[১] আল কুরআন ১৮;১৩।

[২] আল কুরআন ২;২৮২।

সাহাবায়ে কেরামের মতামতকে অগ্রাহ্য করে যুবকদের নিষ্ঠাপূর্ণ সাহস ও অদম্য স্পৃহাকে প্রাধান্য দেন। অথচ সমরনীতিতে একটি উক্তির বাহুল্য রয়েছে যে, ‘শত্রুকবলিত এলাকায় যুদ্ধ করে কেউ কখনো জয়ী হতে পারেনি’ (وما غزى قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا)। আয়িশা (রাদি.) এর বিরুদ্ধে আরোপিত মিথ্যা অপবাদের ঘটনায় আঠারো বছরের যুবক উসামা ইব্ন যাইদ (রাদি.) এর নিকট রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ করেন। তৎকালীন পরাশক্তি রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে উসামা ইব্ন যাইদকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাপতি হিসেবে মনোনয়ন দান করেন। অথচ আবু বকর, উমার, আবু উবাইদা ও সা’দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রাদি.) এর মতো শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম তার অধীনে সাধারণ সৈনিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাদি.) যুবকদের ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে দলে দলে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিয়ে আসতেন। হিজরতের পূর্বে মদিনায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ও সুদর্শন যুবক মুসআব ইব্ন উমাইর (রাদি.)। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবক ইতাব ইব্ন আসিদ (রাদি.) এর হাতে মক্কার আমির এর দায়িত্ব প্রদান করেন।

যুবসমাজের আত্মত্যাগের অনুপম ঘটনা

ইসলাম যৌবনের কমনীয় সময়কে ভালো কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং যুবসমাজের নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মযজ্ঞ সমীহের দৃষ্টিতে দেখে। মানবজীবনের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে যৌবন হলো সবার শীর্ষে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যৌবনকে মূল্যায়ন করার প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

> اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ، شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلُكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ
>
> “পাঁচ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার পূর্বে পাঁচটি অবস্থার মূল্যায়ন করো। যৌবনকে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে, সুস্থতাকে রুগ্ন হবার পূর্বে, ধনাঢ্যতাকে দরিদ্রতার পূর্বে, অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে, হায়াতকে মৃত্যুর পূর্বে।”[১]

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য সাহাবায়ে কেরাম সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। দীনের জন্য

---

[১] বাইহাকি, আহমদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলি ইব্ন মুসা, শুআবুল ঈমান, (রিয়াদঃ মাকতাবাহ আল রুশদ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ৪৭৬, হাদিস নং- ৯৭৬৭।

জীবন উৎসর্গকারী যুবকেরা এতই নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন যে, পুরো জীবনকেই ইবাদত-বন্দেগিতে কাটিয়ে দেয়ার সংকল্প ব্যক্ত করেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"একদা তিনজন যুবক রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গৃহে আগমন করে তাঁর ইবাদত-বন্দেগি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। রসূলের ইবাদতের বাস্তব খবর জানার পর তারা এটিকে খুবই অল্প মনে করেন। তারা মন্তব্য করে বলেন, আমরা কখনো একজন নবির সমকক্ষ হতে পারবো না। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তাদের একজন মন্তব্য করলো, আমি পুরো জীবনের সারা রাত ইবাদতের মধ্যেই কাটিয়ে দেবো। আরেকজন বললো, আমি সারাজীবনই রোযা রাখবো। কখনো রোযা ভাঙবো না। অন্যজন বললো, আমি নারীসঙ্গই ছেড়ে দেবো। জীবনে কখনো বিয়ে করবো না। এ কথা শোনার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা কি এ ধরনের মন্তব্য করেছো? জেনে রেখো, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশিই ভয় করি। এতদসত্ত্বেও আমি মাঝে-মধ্যে রোযা রাখি, আবার কখনো রোযা ভঙ্গও করি। রাতের কিয়দংশ নামাযে কাটাই, আবার নিদ্রাও যাই। বিয়ে-শাদিও করি। এটিই আমার সুন্নাহ। যে আমার সুন্নাহ'র প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করবে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়"।[১]

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৭, হাদিস নং- ৫০৬৩।

ইসলামের ইতিহাসে যুবকদের আত্মত্যাগের অনেক ঈর্ষণীয় ঘটনার কিংবদন্তি রয়েছে। তারা অল্লাহর পথে অল্প বয়সে জীবন উৎসর্গ করার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আবেদন জানিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي

"আমি চৌদ্দ বছর বয়সে উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য নিজেকে উপস্থাপন করলাম। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যুদ্ধের অনুমতি দেননি। আবার খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে আমি নিজেকে উপস্থাপন করলাম। তখন আমার বয়স ছিল পনেরো বছর। এবার তিনি আমাকে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দিলেন।"[১]

কুরাইশের অন্যতম দামাল যুবক আমর ইবনুল আস (রাদি.) এর পুত্র আবদুল্লাহ কুরআন চর্চাকে নিজের জীবনের মহান ব্রত হিসেবে বেচে নেয়ার সংকল্প করেছেন এবং যৌবনকে কুরআনের আলোকে উপভোগ করার যে অঙ্গীকার করেছেন, তা নিম্নের হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُهُ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ، وَأَنْ تَمَلَّ، فَاقْرَأْهُ فِي شَهْرٍ» . فَقُلْتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي عَشْرَةٍ» قُلْتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ» قُلْتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي فَأَبَى

"আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাদি.) বলেন, কুরআন সংকলন করার পর আমি একরাতেই পুরো কুরআন তেলাওয়াত করে সমাপ্ত করেছি। এ খবর শুনে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমার আশঙ্কা হয়

---

[১] ইব্ন মাজাহ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন য়াযিদ আল কাযভিনি, *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (কায়রো: দারু ইহয়া আল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ), খ. ২, পৃ. ৮৫০, হাদিস নং- ২৫৪৩।

জীবনের এক পর্যায়ে আল কুরআন তোমার জন্য বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং তুমি মাসে একবার আল কুরআন সমাপ্ত করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি আমার যৌবন ও শক্তিকে কাজে লাগাতে চাই। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে দশদিনে একবার সমাপ্ত করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে যৌবন ও শক্তি কাজে লাগাবার সুযোগ দিন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে সাতদিনে একবার সমাপ্ত করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার যৌবন ও শক্তি উপভোগ করার সুযোগ দিন। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতদিনের কমে আল কুরআন সমাপ্ত করার অনুমতি দেননি"।[১]

ইসলামে যুবকের মর্যাদা

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবসমাজের মর্যাদা যথাযথ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুমিন যুবকদের সম্মানার্থে আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতের প্রৌঢ় অধিবাসীদের যুবকের মর্যাদায় ভূষিত করবেন। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَهْلُ الْجَنَّةِ شَبَابٌ، جُرْدٌ، مُرْدٌ، كُحْلٌ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ، وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ

"আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জান্নাতের অধিবাসীরা হবে যুবক, যাদের শরীরে অযাচিত লোম থাকবে না। চক্ষুযুগল হবে কৃষ্ণবর্ণের, তাদের যৌবন কখনো নিঃশেষ হবে না। পরিধেয় বস্ত্র কখনো পুরনো হবে না"।[২]

যুবকদের উৎসাহ দেয়ার নিমিত্তে অনেক সময় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে ইমামতির মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগদান করতেন। আমর বিন সালামা (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

---

[১] ইব্ন মাজাহ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন য়াযিদ আল কাযভিনি, *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (কায়রো: দারু ইহয়া আল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ), খ. ১, পৃ. ৪২৮, হাদিস নং- ১৩৪৬।

[২] দারিমি, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *সুনানু দারিমি*, (সৌদি আরব: দারুল মুগনি লিন নাশরি ওয়াত তাওযি', ১৪১২ হি./২০০০ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৮৬৬, হাদিস নং- ২৮৬৮।

كُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ " يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ " وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين

"আমি কিশোর বয়সেই কুরআনের অধিকাংশ সূরা মুখস্ত করেছি। আমার পিতা স্বজাতির প্রতিনিধি হিসেবে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গমন করেন। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নামাযের শিক্ষা প্রদানপূর্বক বলেন, তোমাদের মধ্যে যে কুরআন সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী, সে নামাযের ইমামতি করবে। কুরআন সম্পর্কে আমার জ্ঞান বেশি থাকার কারণে গোত্রের লোকেরা আমাকে ইমামতির দায়িত্ব প্রদান করতো। সাত অথবা আট বছর বয়সে আমি আমার গোত্রে নামাযের ইমামতি করতাম"।[১]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদের প্রতি ছিলেন অতিশয় দয়ালু। তিনি তাদের আবেগ-অনুভূতি ও মনোভাব বোঝার চেষ্ঠা করতেন। তিনি যুবসমাজের পরিবার পরিজনের প্রতিও সদা সদয় থাকতেন এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতেন।

حَدَّثَنَا مَالِكٌ قالَ: أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

"মালিক ইবনুল হুয়াইরিস বর্ণনা করেন, আমরা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আগমন করলাম। তখন আমরা ছিলাম সমবয়সী

---

[১] আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্‌ন আশ'আস আল সাজিসতানি, *সুনানু আবি দাউদ*, (বৈরুত: মাকতাবাহ আল আল আসরিয়্যাহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ১৫৯।

যুবক। আমরা রসূলের দরবারে বিশ দিন অবস্থান করেছিলাম। তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত মমতাপূর্ণ আচরণ করেন। পরিবার পরিজনের প্রতি আমাদের আকৃষ্ট হওয়ার বিষয়ে জানার পর তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, পরিবারে আমাদের কে কে আছে? আমরা তাঁকে পারিবারিক সব বৃত্তান্ত অবহিত করলাম। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যাও এবং সেখানেই অবস্থান করো। তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ প্রদান করো। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এমন কিছু বিষয় আলোচনা করলেন, যার কিছু অংশ আমার স্মরণ আছে, আর কিয়দংশ ভুলে গিয়েছি। তিনি আরো বলেন, আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখেছো, তোমরাও সেভাবে নামায আদায় করবে। নামাযের সময় হলে একজন আযান দেবে এবং সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ইমামতি করবে।”[১]

কিছু মুমিন নারী-পুরুষকে আল্লাহ তা'য়ালা বিশেষ আমলের কারণে অভাবনীয় প্রতিদান দেবেন। এ ক্ষেত্রে যুবকদের মর্যাদা হলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সাত প্রকারের ব্যক্তি কিয়ামতের মহা সঙ্কটের দিন আরশের নিচে ছায়া লাভ করবেন। তারা হলেন, ন্যায়পরায়ণ শাসক, মসজিদে সর্বদা জামাত সহকারে নামায আদায়কারী ব্যক্তি, একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপনকারী এবং বিচ্ছিন্নকারী, যে পুরুষ একমাত্র আল্লাহর ভয়ে মর্যাদাবান ও সুন্দরী নারীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে, গোপনে দান-সদকাকারী ব্যক্তি এবং আল্লাহর আযাবের ভয়ে একাকী অশ্রুবিসর্জনকারী নারী-পুরুষ। এই সাত শ্রেণির সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ শাসকদের পরে যুবকদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। সহিহ বুখারি শরিফে আবু হুরাইরা (রাদি.) এর বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য।[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫২, হাদিস নং- ৬০৩।

[২] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৬২, হাদিস নং- ৬২৭।

تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদের অত্যন্ত সমীহ করতেন এবং তাদের অধিকার ও আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। যুব সমাজের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাদের আবেগ অনুভূতির প্রতি গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নের হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلاَمِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ؟»فقال الغُلاَمُ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ

"সাহল ইব্‌ন সা'দ (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একদা কিছু সুপেয় পানি হাদিয়া আসলো। তাঁর ডানপাশে ছিল এক যুবক। বামপাশে ছিলেন বর্ষীয়ান ব্যক্তিবর্গ। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকটিকে উদ্দেশ করে বললেন, তুমি অনুমতি দিলে আমি এ পানীয়ের বন্টন বয়স্কদের দ্বারা শুরু করতে পারি। যুবকটি বললো, আল্লাহর কসম! আপনার পরে পান করার যে অধিকার আমি সৌভাগ্যক্রমে লাভ করেছি, তাতে কাউকে অগ্রাধিকার দিতে রাজি নই। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির পাত্রটি তাকে দিয়ে বন্টন শুরু করলেন।"[১]

যুবসমাজের প্রতি ইসলামের নির্দেশনা

সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণে সচ্চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। চরিত্রমাধুর্য সমাজবিপ্লবে প্রভাবক ভূমিকা পালন করে। যুবসমাজ হলো সমাজ পরিবর্তনের মূল চাবিকাটি। চরিত্রবান যুবক সুশীল সমাজ বিনির্মাণের মূল কারিগর। যুব সমাজের উন্নত নৈতিক-চরিত্র গঠনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। তিনি যুবকদের উদ্দেশ করে বলেন,

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৩০, হাদিস নং- ২৪৫১।

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء،

"হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য আছে তারা যেনো বিয়ে করে। কেননা এটি দৃষ্টিশক্তি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই তারা যেন রোযা রাখে। কেননা এটি কামভাব নিয়ন্ত্রণ করে"।[১]

আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ঈমান, অবিচল আস্থা ও সুদৃঢ় বিশ্বাস মুমিন জীবনের প্রধান অবলম্বন। তিনি যুবক আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসকে (রাদি.) আল্লাহর প্রতি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস স্থাপনের উপদেশ দিয়ে বলেন,

يا غلام! إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك،

"হে বালক! তুমি আল্লাহর বিধি-নিষেধ অনুযায়ী জীবন যাপন করলে আল্লাহ তোমার হেফাজতের দায়িত্ব নেবেন। কোনো কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহর কাছেই করবে। কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে আল্লাহর নিকট চাইবে। হে বালক! জেনে রেখো, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ একত্রিত হয়ে তোমার কোনো উপকার করতে চাইলে আল্লাহর সিদ্ধান্তের বাইরে কেউ কোনো উপকার করতে পারবে না। আর পৃথিবীর সকল শক্তি একজোট হয়ে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাইলেও আল্লাহর ফায়সালার বাইরে কোনা ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না"।[২]

সাধারণ মানুষের সঙ্গে মুমিনের আচরণ হবে শালীন ও মাধুর্যপূর্ণ। আল্লাহভীরু ও পাপাচারমুক্ত যুবকদের সদাচরণ সমাজে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন

---

[১] মুসলিম, আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ. ২, পৃ. ১০১৮, হাদিস নং- ১৪০০।

[২] তিরমিযি, মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযি*, (বৈরুত: দারুল গারবিল ইসলামি, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৪৮, হাদিস নং- ২৫১৬।

করে। যুবক আবু যর (রাদি.) ও আবু মূসা আশ'আরিকে (রাদি.) রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়ে বলেন,

اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن

"তুমি যেখানেই থেকো আল্লাহকে ভয় করে চলবে। কোনো গুনাহের কাজ সংঘটিত হবার অব্যবহিত পর একটি ভালো কাজ করে নেবে। এতে ঐ গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করবে।"[১]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যৌবনের সূচনাপর্বেই যুবকদের সামাজিক রীতিনীতি ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেন। ব্যক্তিচরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে আদর্শ নাগরিক গঠনে তিনি ছিলেন বিশ্বমানবতার প্রধান শিক্ষক। তিনি বালক উমার ইব্‌ন আবি সালামাকে (রাদি.) নিজের সঙ্গে পানাহারের সুযোগ দিয়ে বাধিত করতেন এবং পানাহারের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিতেন। প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও শিষ্টাচার তালিম দিতেন। উমার ইব্‌ন আবি সালামার (রাদি.) বর্ণনা করেন,

كُنْتُ غُلاَمًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ

"আমি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গৃহে একজন অল্পবয়স্ক বালক হিসেবে বসবাস করতাম। আমি খাবারের পাত্রে এলোমেলোভাবে এদিক সেদিক থেকে আহার করতাম। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে বালক! আল্লাহর নাম সহকারে খাবার গ্রহণ করবে এবং ডানপাশ থেকে তোমার সামনে রক্ষিত খাবার আহার করবে। উমার ইব্‌ন আবি সালামা (রাদি.) বর্ণনা করেন, এরপর থেকে আমি এই পদ্ধতিতেই আহার করতাম"।[২]

মদিনায় একদল যুবক সাহাবি শাহাদতবরণ করেন। বয়সে তরুণ ও আল কুরআনে অভিজ্ঞ এ কাফেলার শাহাদতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[১] তিরমিযি, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযি*, (বৈরুতঃ দারুল গারবিল ইসলামি, ১৯৯৮ খ্রি), খ. ১, পৃ. ৬৬৮, হাদিস নং- ২৯৯৬।

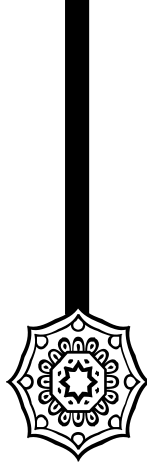
[২] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৬৮, হাদিস নং- ৫৩৭৬।

অত্যন্ত মর্মাহত হন। শত্রুদের হাজারো নির্যাতন দয়াল নবি মুখ বুঝে সহ্য করতেন। চরম শত্রুর জন্যও তিনি ছিলেন রহমতের আধার। তিনি কখনো কাউকে অভিশাপ দিতেন না। এতদসত্ত্বেও যৌবনোদ্দীপ্ত সাহাবিদের শাহাদতের কারণে পনেরো দিন পর্যন্ত ফজরের নামাজে শত্রুদের জন্য বদ-দোয়া করেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سَبْعِينَ رَجُلًا يُسَمَّوْنَ الْقُرَّاءَ قَالَ: كَانُوا يَكُونُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا أَمْسَوْا انْتَحَوْا نَاحِيَةً مِنَ الْمَدِينَةِ، فَيَتَدَارَسُونَ وَيصلونَ يَحْسِبُ أَهْلُوهُمْ أَنَّهُمْ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْسِبُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ أَنَّهُمْ عِنْدَ أَهْلِيهِمْ، حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي وَجْهِ الصُّبْحِ اسْتَعْذَبُوا مِنَ الْمَاءِ، وَاحْتَطَبُوا مِنَ الْحَطَبِ، فَجَاءُوا بِهِ فَأَسْنَدُوهُ إِلَى حُجْرَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا، فَأُصِيبُوا يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتَلَتِهِمْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ

“আনাস ইব্‌ন মালিক (রাদি.) বর্ণনা করেন, আনসারি সাহাবিদের মধ্যে সত্তরজন ব্যক্তি কারি হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তারা মসজিদেই অবস্থান করতেন। সন্ধ্যা হলেও মসজিদের এক কোণে গিয়ে শিক্ষ-দীক্ষায় নিয়োজিত থাকতেন অথবা নামায আদায় করতেন। তাদের পরিবারের সদস্যগণ মনে করতেন যে, তারা মসজিদে অবস্থান করছেন। মসজিদের নিয়মিত মুসল্লি সাহাবিগণ মনে করতেন, তারা পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গেছেন। এ সকল যুবক ভোর হবার পর স্বাভাবিক নিয়মে সুপেয় পানি পান করতেন এবং লাকড়ী সংগ্রহ করে তা রসূলের হুজরা মোবারকের সঙ্গে টেক দিয়ে রেখে দিতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আরবের এক গোত্রের শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন। কিন্তু মা'উনা কূপের পাদদেশে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পনেরো দিন পর্যন্ত নামাযরত অবস্থায় শত্রুদের জন্য বদ-দোয়া করেন।





ইসলামে পিতার মর্যাদা ও অধিকার

আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়েছে নারী, অর্ধেক তার নর।

কবি নজরুল নারী-পুরুষের অধিকার ও সাম্যের দিকটি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তার 'নারী' কবিতায়। নারী-পুরুষ কারো অবদানকেই ইসলাম খাটো করে দেখেনি। আদর্শ পরিবার গঠনের ক্ষেত্রেও কবির উক্তিটি যথার্থ। যা অনেকটা ইসলামি ভাবধারার প্রতিবিম্ব।

পরিবার গঠনে মাতাপিতার অবদান পরিপূরক

একটি আদর্শ পরিবার গঠনে মাতাপিতার অবদান পরিপূরক। উভয়ের মধ্যে কারো অবদান সন্তানের উপর কম নয়। দু'জন নারী-পুরুষের ধর্মীয় ও সামাজিক বন্ধনের মাধ্যমে একটি পরিবারের যে অসম্পূর্ণ যাত্রা সূচিত হয়, কালের পরিক্রমায় একদিন তারা পিতামাতায় পূর্ণতা লাভ করে। পিতা হয় সে পরিবারের

আদর্শিক ভিত্তি। মা হলো তার সর্বশেষ ও সুশীতল আশ্রয়। পিতার সাময়িক কঠোরতা ও মাতার অতুলনীয় মমত্ববোধ সন্তানের পরিচর্যায় ভারসাম্যপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। একটি পরিবারে মাতা হয় স্নেহ-মমতার মূল আধার। আর পিতা হলো সন্তানের ভবিষ্যতের স্বপ্ন সৌধ বিনির্মাণের মূল কারিগর। মাতা হলো একটি গৃহের জীবনীশক্তি ও প্রাণ-স্পন্দন। আর পিতা হলো সে পরিবারের উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রধান প্রকৌশলী। মাতা হলো একটি পরিবারে প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি। আর পিতা হলো সে প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি। নারী পুরুষ-জাতির মাতা হবার সুবাদে গৌরবান্বিত হলে, পুরুষ নারী-জাতির পিতার আসনে মহিমান্বিত স্থপতি। মায়ের গর্ভে পুরুষের জন্ম হলে, নারী-জাতির জন্ম হলো পিতৃ-পুরুষ আদম (আ.) এর ঔরসে।

অধিক সদাচরণ লাভের কে বেশি উপযুক্ত ?

মাতা-পিতার মর্যাদা...। তাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য...। কার বেশি ? অধিক সদাচরণ লাভের কে বেশি উপযুক্ত ? এ প্রশ্নের সাদামাটা উত্তর একটিই। মা...। সহিহ বুখারি ও মুসলিম শরিফ এর হাদিস দ্বারা সাধারণত মাতার অধিকার ও মর্যাদা বেশি হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অন্য হাদিসের বর্ণনা মতে, মাতার পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।

উপর্যুক্ত হাদিস দু'টির আলোকে মাতার অধিকার সম্পর্কে আমরা দীর্ঘ আলোকপাত করি। আর ইসলাম পিতাকে কী মহিয়ান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, সে বিষয়ে আমাদের আলোচনা হয় খুবই সংক্ষিপ্ত। আল কুরআন ও সুন্নাহর বিষদ বর্ণনায় পিতা স্বতন্ত্রভাবে মর্যাদার উচ্চ শিখরে অধিষ্টিত। যা অনেক উদাসীন পুরুষ ও কর্তব্যপরায়ণ পিতার নেপথ্যে-অগোচরে। কবির ভাষায় বলতে গেলে-

قیمت ہر چیز را دانی کہ کیست

قیمت خود را ندانی احمقیست

"পৃথিবীর সব কিছুর মূল্য-মান ভালোভাবে জেনে নিলে। আর নিজের মূল্য কতো বেশি, তা জানতে পারলে না। তুমি একজন আস্ত বোকা"।

মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ সম্পর্কীয় হাদিসসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়,

যে সকল হাদিস দ্বারা মাতার অবদান বেশি বলে প্রতিয়মান হয়। অন্য হাদিস দ্বারা সে ক্ষেত্রে পিতার অবদান ও অধিকার সাব্যস্ত হয়।

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الأمهات

"মাতার পায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত"।[১]

কূযা'য়ি ও খতিব বাগদাদি বর্ণিত এই হাদিসটি নাসায়ি, দারা কুতনি, ইব্ন হিব্বানসহ অনেকেই য'য়িফ বলে মন্তব্য করেছেন। তবে আবু দাউদ, নাসায়ি, আহমদ, তাবরানি, বায়হাকি, হাকিম ও দারা কুতনি বর্ণিত হাদিসে "মাতাপিতা উভয়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত" এ কথা বর্ণিত হয়েছে। মুহাদ্দিনগণ এ হাদিসকে 'সহিহ ও হাসান' বলেও অভিহিত করেছেন।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَشِيرُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَكَ وَالِدَانِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا

"মু'আবিয়া ইব্ন জাহিমা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জিহাদে যাবার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাদের বেশি বেশি সেবা করো। কেননা জান্নাত তাদের উভয়ের পদতলে"।[২]

মায়ের প্রতি অধিক সদাচরণের কারণ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ

---

[১] কুযা'য়ি, কাযি আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন সালামা, *মুসনাদ আশ শিহাব*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, ১৯৮৬/১৪০৭, দ্বিতীয় সংস্করণ), খ. ১, পৃ. ১০২।

[২] তাবরানি, আবুল কাসিম সুলাইমান ইব্ন আহমদ ইব্ন আইয়ুব, *আল মু'জামুল কাবির*, (কায়রো: মাকতাবা ইব্ন তায়মিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫ হি./ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৮৯, হাদিস নং-২২০২।

> আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, একজন লোক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, আমার সদাাচরণ পাবার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত কে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেলন, তোমার মা। লোকটি বলল, তার পর কে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবার দিলেন, তোমার মা। লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, তার পর কে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পিতা।[১]

উপর্যুক্ত হাদিসে মাতার সঙ্গে তিন বার সদাচরণের কথা বলা হয়েছে এবং চতুর্থবারে পিতার কথা উল্লেখ রয়েছে, মুহাদ্দিসগণ তার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন।

প্রথমত, সন্তানের জন্য মাতা এমন তিনটি কষ্ট ভোগ করে, যাতে একমাত্র অংশীদারিত্ব হলো মায়ের। এখানে পিতার কোনো দখল নেই।

ক. সন্তান গর্ভে ধারণ খ. সন্তান প্রসব গ. দুগ্ধদান।

এই তিনটি কষ্টের স্বীকৃতিস্বরূপ মায়ের প্রতি তিনবার সদাচরণের কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সন্তানের জন্য মাতা বেশি ঘনিষ্ট হবার কারণে অনেক ক্ষেত্রে তার প্রতি সদাচরণে সন্তানেরা অবহেলা করে থাকে। এ অবহেলা প্রতিরোধে মায়ের প্রতি অধিক ভালো ব্যবহার করার প্রতি তাগাদা দেয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত, জাহিলি যুগে নারীরা ছিল অধিকারের ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ। ইসলামে নারীর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে মায়ের সঙ্গে অধিক সদাচরণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

চতুর্থত, আবহমানকাল থেকে আধুনিক সভ্যতার উৎকর্ষতার যুগ পর্যন্ত মানব সমাজ পুরুষ-শাসিত। পুরুষপ্রভাবিত সমাজে নারীর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে মায়ের প্রতি তিনবার সদাচরণের কথা বলা হয়েছে।

---

[১] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ. ৪, পৃ. ১৯৭৪, হাদিস নং- ২৫৪৮।

পরিবারের জন্য পিতার অবদান

পরিবারের জন্য পিতার এমন অনেক অবদান রয়েছে, যাতে মাতার কোনো অংশীদারিত্ব নেই। একমাত্র পিতাই সে দায়িত্ব পালন করে। যুক্তির নিরিখে পিতার জন্যও শরি'য়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো পুরষ্কারের ঘোষণা থাকা বাঞ্ছনীয়। ইসলাম যেভাবে মাতার সঙ্গে অধিক সদাচারের শিক্ষা দিয়েছে, তেমনিভাবে পিতার একক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে বেহেশতের সর্বোত্তম দরজা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ

"আবুদ দারদা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, আমার এক স্ত্রী আছে। আমার মা তাকে তালাক দিতে বলে। আবুদ দারদা (রাদি.) বললেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। পিতা হলো বেহেশতের দরজাসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম দরজা। তুমি চাইলে এই দরজা ধ্বংসও করতে পারো, আবার রক্ষাও করতে পারো"।[১]

হাদিস বর্ণনাকারী ইব্ন আবি উমার বলেন, সুফ্য়ান ইব্ন উয়াইনা কখনো মায়ের কথা বলেছেন আবার কখনো পিতার কথা বলেছেন। এটি একটি সহিহ হাদিস।[২]

পিতার মর্যাদা সামগ্রিক, মায়ের মর্যাদার আঙ্গিক

সন্তানের সদাচরণ লাভের ক্ষেত্রে মাতা-পিতা উভয়ে সমান, নাকি এতে কোনো তারতম্য আছে। এ বিষয়ে অনেকেই মাতার অধিকারকে গুরুত্ব দিলেও ইমাম মালিক ও কাযি 'আয়ায বলেন, ভালো ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাতাপিতা উভয়েই সমান। কারো অধিকার বেশ বা কম নয়। পিতার মর্যাদা সম্পর্কীয় আল কুরআন এর আয়াত, হাদিসসমূহ এবং মৌলিক মানবাধিকারের বিয়ষয়টি সামনে রাখলে

---

[১] তিরমিযি, মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযি*, (বৈরুতঃ দারুল গারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৪৫, হাদিস নং- ১৯০০।

[২] প্রাগুক্ত।

বোঝা যায়, মায়ের অধিক মর্যাদার বিষয়টি আঙ্গিক ও শাখাগত। কিন্তু পুরুষ হবার সুবাদে পিতার মর্যাদা সামগ্রিক ও জাতিগত। আল্লাহ তা'য়ালা দু'টি কারণে পুরুষকে নারীর উপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দান করে সম্মানিত করেছেন। যার প্রথমটি হলো, আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও দান। যা নারীকে দান করেননি। যাকে আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ দ্বারা মর্যাদা দান করেন, নিজের কর্মপ্রচেষ্টায় কেউ তাতে পৌঁছতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয়টি হলো, পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব। এই দু'টি কারণে নারী জাতির উপর পুরুষ মৌলিকভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আল্লাাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

"পুরুষগণ নারীজাতির তত্ত্বাবধায়ক। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে অন্যদের উপর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। আর তারা পরিবারের জন্য অর্থব্যয় করে"।[১]

আল কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে,

﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾

"নারীদের উপর পুরুষের মর্যাদা এক ধাপ বেশি"।

ইউসূফ (আ.) এর স্বপ্নের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আল কুরআনের ভাষ্য হলো,

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾

"ইউসুফ (আ.) তার পিতাকে বললেন, আমি দেখেছি এগারোটি নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সিজদা করছে"। [২]

তাফসিরকারকদের মতে এখানে সূর্য বলে পিতা ও চন্দ্র বলে মাতা উদ্দেশ্য। একথা স্বতসিদ্ধ যে, সূর্যের মর্যাদা চন্দ্রের চেয়ে অনেকগুণ বেশি।

---

[১] আল কুরআন, ৪;৩৪।
[২] আল কুরআন, ১২;৪।

আল কুরআনে বর্ণিত পুরুষের এই মৌলিক মর্যাদা হাদিসের বিশেষ কোনো বর্ণনা দ্বারা কখনো খণ্ডিত বা সাংঘর্ষিক হতে পারে না। যা 'উসূল' এর নীতিমালারও পরিপন্থি।

কিয়ামতের দিন সন্তানদের পিতার নাম ধরে ডাকা হবে

ইসলামে পিতার মর্যাদা স্ব-মহিমায় ভাস্বর। সুন্দর নামের গুরুত্ব ইহকালের গণ্ডি পেরিয়ে বিভীষিকাময় বিচার দিবস পর্যন্ত বিস্তৃত। পিতার সম্মানার্থে আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন প্রতিটি বনি আদমকে তার নামের সঙ্গে পিতার নাম যুক্ত করে ডাকবেন। মাতার মর্যাদা যথাস্থানে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও কিয়ামতের দিন সন্তানের পরিচয় হবে পিতার নামে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতিকে উদ্দেশ করে বলেন,

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

"কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নিজেদের নাম ও পিতাদের নাম নিয়ে ডাকা হবে। অতএব তোমরা সন্তানের জন্য সুন্দর নাম নির্বাচন করো"।[১]

সন্তান ও তার যাবতীয় সম্পদের মালিক পিতা

পিতার অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণিত আর একটি হাদিস হলো,

জনৈক সন্তান তার পিতার বিরুদ্ধে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে অভিযোগ করে। পিতার বিরুদ্ধে সন্তানের নালিশের সমাধানপূর্বক তিনি বলেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا، وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا وَعِيَالًا، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي إِلَى مَالِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

---

[১] আবু দাউদ, সুলায়মান বিন আশ'আস আল সাজিসতানি, *সুনানু আবি দাউদ*, (বৈরুত: মাকতাবাহ আল আসরিয়্যাহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, তা/বি.) খ. ৪, পৃ. ২৮৭, হাদিস নং- ৪৯৪৮।

"জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে বলল, আমার সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আছে। আমার পিতারও অনুরূপ সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আছে। অথচ তিনি আমার সম্পদ কেড়ে নিতে চান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি এবং তোমার সম্পদ দু'টোই তোমার পিতার'।"[১]

পিতার মর্যাদা বিষয়ে আর একটি হাদিস হলো,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَبَرُّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ

"আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পিতার প্রতি সর্বাধিক সদাচরণ হলো, তার বন্ধুদের সঙ্গে সদাচরণ করা"।[২]

পিতার অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্টি

সর্বসাধারণে মাতার অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়, এমন ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু তিরমিযি শরিফ এর হাদিসে বর্ণিত আছে, পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়। পিতার অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়। হাদিসটি নিম্নরূপ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

"আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়। পিতার অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়।"[৩]

---

[১] তাহাভি, আবু জা'ফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামা, *মুশকিলুল আসার*, (বৈরুত:মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪৯৫ হি.), খ. ৪, পৃ. ২৭৯, হাদিস নং- ১৫৯৮।

[২] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ. ৪, পৃ. ১৯৭৯, হাদিস নং- ২৫৫২।

[৩] তিরমিযি, মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযি*, (বৈরুত: দারুল গারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.), খ.৩, পৃ. ৩৭৪।

এতিমের মর্যাদা পিতার মৃত্যুর কারণে

পিতার মৃত্যুর কারণে একজন শিশু গৌরবান্বিত হয়। সে এতিম বা অনাথ হিসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করে। কুরআন ও হাদিসে এতিমের অনেক ফজিলত ও মর্যাদা বর্ণিত আছে। মাতার মৃত্যুর কারণে কোনো শিশু এ সম্মানে ভূষিত হয় না। এতিমের মর্যাদার মূল কারণ হলো, পিতার মৃত্যুজনিত কারণে সন্তান জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সদাচার শেখার সুযোগ হারিয়ে ফেলে। সন্তানের লেখা-পড়া ও শিষ্টাচার শেখানোর এ দায়িত্ব একমাত্র পিতার দায়িত্বে ন্যস্ত। মাতার স্নেহ-মমতা সন্তানের আদর্শিক উৎকর্ষতায় বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে না। যা পারে পিতার যৌক্তিক শাসন ও মৃদু কঠোরতায়। এ জন্য আলি (রাদি.) বলেন,

لَيْسَ الْيَتِيْمُ الَّذِيْ قَدْ مَاتَ وَالِدُهُ

ان الْيَتِيْمَ يَتِيْمُ العلم وَالْاَدَبِ

"যে সন্তানের পিতা মৃত্যুবরণ করেছে, সে প্রকৃতপক্ষে এতিম নয়। বাস্তবে এতিম হলো ঐ ব্যক্তি, যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিষ্টাচার শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।"

স্বামীর মৃত্যুর কারণে স্ত্রী মর্যাদাবান হয়

পিতার মৃত্যুর কারণে শুধুমাত্র সন্তান মর্যাদাবান হয় তাই নয়, স্বামীর মৃত্যুর কারণে স্ত্রী নিজেও অনেক মর্যাদার অধিকারী হয়। হাদিস শরিফে বিধবা নারীর অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে স্ত্রীর মৃত্যুর কারণে স্বামীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না। বিধবা নারীকে সাহায্যের ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ

"আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, বিধবা নারী ও অসহায় ব্যক্তির সাহায্যকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়"।[১]

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫/২০০৪), খ.৭, পৃ. ৬২, হাদিস নং-৫৩৫৩।

অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, বিধবা নারীকে সাহায্যকারী অনবরত নামায-রোযা পালনকারী ব্যক্তির মতো মর্যাদা লাভ করবে"।

বিধবা নারীর মর্যাদায় অন্য হাদিসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ «امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ، وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا

"আউফ ইবনু মালিক (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে বিধবা নারী তার সন্তানের লালন-পালনে কঠোর সাধনার কারণে নিজের রূপ-লাবণ্য হারিয়ে ফেলেছে, আমি এবং সে কিয়ামতের দিন এভাবে থাকব। এই বলে ইয়াযিদ (হাদিস বর্ণনাকারী) মধ্যমা ও তর্জনি দ্বারা ইঙ্গিত করেন।"[১]

স্বামীর মৃত্যুর কারণে স্ত্রী মর্যাদাবান হবার ব্যাপারে নিম্নের হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الجَنَّةَ

"উম্মে সালামা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে যে স্ত্রী মারা যায় সে বেহেশতে প্রবেশ করবে"। এটি একটি হাসান ও গরিব হাদিস।"[২]

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, পিতার সার্বিক তত্ত্বাবধানের অভাবে সন্তান বিপথগামী হয় এবং তার সঠিক পরিচর্যায় সন্তান উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। পৃথিবীতে

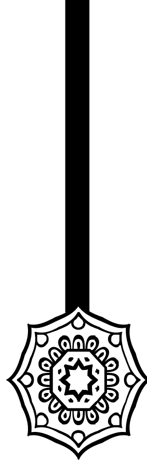
---

[১] আবু দাউদ, সুলায়মান বিন আশ'আস আল সাজিসতানি, *সুনানু আবি দাউদ*, (বৈরুত: মাকতাবাহ আল আসরিয়্যাহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, তা/বি.) খ. ৪, পৃ. ৩৩৮, হাদিস নং- ৫১৪৯।

[২] তিরমিযি, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযি*, (বৈরুত: দারুল গারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.), খ, ২, পৃ. ৪৫৭, হাদিস নং- ১১৬১।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে, অর্থ-বৈভবে কিংবা উন্নতির বিভিন্ন সেক্টরে যারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের পেছনে রয়েছে পিতার সযত্ন তত্ত্বাবধান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পারিবারিক আইনের আলোকে পিতাই সন্তানের বৈধ অভিভাবক হিসেবে স্বীকৃত। সন্তানের বংশপরিচয় পিতার মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয়। ইত্যাদি অনেক কারণে পিতার মর্যাদা মায়ের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। বরং ক্ষেত্রবিশেষে বেশি।





ভালোবাসার নিরঙ্কুশ অধিকার একমাত্র আল্লাহর

ঋতুরাজ বসন্তের প্রথম মাস ফাল্গুন। এ ঋতুতে প্রবাহিত হয় প্রাকৃতিক আবহ ও আল্লাহর অনুগ্রহের অনন্ত ফল্গুধারা। মহিমান্বিত ভাষা আন্দোলনের কারণে এ মাসের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম একটি দীনি আন্দোলন। ১৯৫২ সালে এ দেশের এক দল দীনদার শিক্ষাবিদের নেতৃত্বে এ আন্দোলনের সূচনা। বাংলা ভাষাভাষী জাতি-গোষ্ঠীর এ আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ ২১ ফেব্রুয়ারী আর্ন্তজতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত। পরিতাপের বিষয় হলো, গৌরবের এ মাসকে কলুষিত করার নিমিত্তে দীর্ঘদিন যাবত একটি ঘৃণ্য প্রয়াস লক্ষণীয়। সমাজে অশ্লীলতা প্রচারের সঙ্গে জড়িত একটি অভিশপ্ত গোষ্ঠী নারী-পুরুষের অনৈতিক-অবাধ মেলামেশাকে সামাজিকভাবে বৈধতা দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত। 'ভালোবাসা দিবস' নামে তারা একটি দিবসের প্রবর্তন করে। ইহকাল ও পরকালে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অবধারিত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'যারা মুসলিম সমাজে অশ্লীলতার ব্যাপকতা পছন্দ করে, দুনিয়া-আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ তা'য়ালা যা জানেন তোমরা তা জানো না'। (সূরা আল-নূর: ১৯) বক্ষমাণ প্রবন্ধে

ভালাবাসার স্বরূপ, প্রকৃতি ও অধিকার কুরআন-সুন্নাহ’র আলোকে আলোচনা করা হয়েছে।

কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি মনের আকর্ষণ ও টান হলো মহব্বত বা ভালোবাসা। ভালোবাসার অধিকার অবদানের ভিত্তিতে নির্ণেয়। যুক্তির বিচারে গাইরুল্লাহর প্রতি ভালোবাসার নিবেদন এক প্রকারের শির্ক। হাদিস শরিফে দুনিয়ার প্রতি ভালাবাসাকে সকল পাপের উপসর্গ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তবে অনুমোদনসাপেক্ষে এটি সীমিত আকারে বৈধ ও নিবেদনযোগ্য। এ ভালোবাসা পদে পদে নিয়ন্ত্রিত ও বিধিবদ্ধ। যখনই এটি আল্লাহর মহব্বতে অন্তরায় হয়, অথবা দীনের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তার বৈধতা অক্ষুণ্ন থাকে না। এ বিষয়ে আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾

> “যদি তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিজন, পাড়া-পড়শি, গচ্ছিত ধন-সম্পদ, লোকসানমুক্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পছন্দনীয় ঘর-বাড়ী তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল ও জিহাদ থেকে অধিকতর প্রিয় হয়, তবে আল্লাহর শাস্তির অপেক্ষা করো”।[১]

শরি‘য়তের বিধিমতে কিছু কিছু মহব্বত প্রশংসনীয়, আর কিছু নিন্দনীয়। কিছু ভালোবাসা স্বভাবজাত ও সৃষ্টিগত। আর কিছু স্বপ্রণোদিত ও অর্জিত। প্রথম প্রকারের মহব্বত মৌলিক ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় প্রকার ভালোবাসার চর্চা কর্দমাক্ত ও কলুষযুক্ত।

ভালোবাসা আল্লাহর রহমত এর অবিচ্ছেদ্য অংশ

রহমান ও রহিম আল্লাহর মহান দু’টি গুণবাচক নাম। ভালোবাসা (মাওয়াদ্দাত বা মহব্বত) তারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে রহমত শব্দটি উপর্যুক্ত শব্দ দু’টি থেকে ব্যাপক অর্থবোধক। যা মানবীয় গুণাবলিরও অংশবিশেষ। রহমতের অংশ হিসেবে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিজগতের প্রতি তার মহব্বত প্রকাশ করেন। তদুপরি

---

[১] আল কুরআন, ২৪;৯।

সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার মহব্বত একান্ত স্বাভাবিক। সহিহ বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيل، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي أَهْلِ الأَرْضِ

"আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরিলকে (আ.) ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি। সুতরাং তুমিও তাকে মহব্বত করো। অতঃপর জিবরিল আসমানের অধিবাসীদের নিকট এ ঘোষণা প্রচার করে দেন। এতে আসমানের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন। এভাবে পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতার সূচনা হয়"।[১]

আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা প্রসঙ্গে মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا، خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ

"আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রহমতকে একশ ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি নিজের জন্য ৯৯ টি রেখে দেন এবং একটি রহমত পৃথিবীতে বন্টন করে দেন। একটি রহমতের কারণে সৃষ্টিজগত পরস্পরের প্রতি মায়া-মমতা ও সম্প্রীতি প্রকাশ করে। যার কারণে জীব-জন্তু নিজ বাচ্ছার উপর বিপদের আশঙ্কায় স্বীয় পা উপরে তোলে তা

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫/২০০৪), খ. ৮, পৃ. ১৪, হাদিস নং- ৬০৪০।

প্রতিরোধের চেষ্টা করে"।[১]

অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, জিন, ইনসান, চতুষ্পদ জন্তু ও কীট-পতঙ্গ আল্লাহ প্রদত্ত একটি রহমতের কারণে পরস্পরের প্রতি মমত্বপূর্ণ আচরণ করে থাকে। তবে আল্লাহ তা'য়ালা নিজের জন্য ৯৯ টি রহমত রিজার্ভ রেখেছেন। যা তিনি কিয়ামতের দিন প্রকাশ করবেন।

সূরা আল-রুম এ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"তাঁর একটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি লাভ করো। তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা (মাওয়াদ্দাত) ও (রহমত) মায়া-মমতা দান করেছেন"।[২]

আল্লাহ ও তাঁর রসূল এর প্রতি মহব্বত একটি মৌলিক ইবাদত

আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা একটি মৌলিক ইবাদত। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর এটি ফরযে আইন। যা ঈমানের একটি পূর্বশর্তও বটে। গাইরুল্লাহ'র প্রতি অবাধ আকর্ষণ ও অনৈতিক ভালোবাসার নিন্দায় আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾

"কতিপয় মানুষ আল্লাহর বিপক্ষে কিছু অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। ঐ সকল শরিকদের প্রতি তাদের ভালোবাসা ঠিক আল্লাহকে ভালোবাসার অনুরূপ। আর মুমিনগণ ভালোবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়"। [৩]

---

[১] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ.৪, পৃ. ১৭, হাদিস নং- ২৭৫২।

[২] আল কুরআন, ২১;৩০ ।

[৩] আল কুরআন, ১৬৫;২।

বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ والناس اجمعين

"আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঐ সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা কখনো মুমিন হতে পারো না, যতক্ষণ না পিতা-মাতা, ছেলে-সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে আমার ভালোবাসা তোমাদের অন্তরে বেশি না হয়"।[১]

পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পরিক মহব্বত সহজাত ও জন্মগত

সহজাত বা সৃষ্টিগত ভালোবাসা হলো পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পরিক মহব্বত। যা মানুষের স্বভাবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রধান কারণ ও এক প্রকারের ইবাদত। আল্লাহ তা'য়ালা মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের ভালোবাসাকে নিজের আনুগত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾

"তোমার রব এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না। আর মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করো।"[২]

মাতাপিতার প্রতি সন্তানের মহব্বত তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নিবেদিত। আবার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার সহজাত ভালোবাসার কোনো তুলনা হয় না। এ বিবেচনায় সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও পালনকর্তা হিসেবে আল্লাহর প্রতি বান্দার মহব্বত জন্মগত ও স্বভাবগত হওয়াই ছিল বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বান্দার স্বাধীন সত্ত্বার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের পরিবর্তে আল্লাহ তা'য়ালা এটি বান্দার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। একটি মৌলিক ইবাদত হিসেবে আল্লাহ তা'য়ালা এটি জিন-ইনসানের উপর চাপিয়ে দেননি। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি মাখলুকের ভালোবাসা একান্ত ইচ্ছাধীন।

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫/২০০৪), খ. ১, পৃ. ১৯, হাদিস নং- ১৩।

[২] আল কুরআন, ১৭;২৩

ইবাদতের অংশ হিসেবে এটি চর্চা ও অনুশীলণের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। মাতা-পিতার প্রতি মহব্বত ইবাদতের অংশ হলেও এটিকে মানব স্বভাবের অংশীভূত করার নেপথ্য কারণ হলো, কঠিন বিষয়ের সহজিকরণ এবং মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বস্তুকে সহজলভ্য করা আল্লাহর বিধিবদ্ধ নীতি। শরি'য়ত বান্দার উপর সাধ্যাতীত কোনো বিধান প্রবর্তন করেনি। তবে তুলনামূলকভাবে কঠিন হুকুম পালনে বান্দার অপারগতার কারণে শরি'য়তের শাস্তি অত্যন্ত লঘু। সহজ বিধান পালনে অবহেলার অপরাধেই দণ্ডবিধি কার্যকর হয়। মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ সন্তানের স্বভাবের অংশ হওয়া সত্ত্বেও কেউ এতে অবহেলা করলে তার জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে এবং মাতা-পিতার প্রতি অবাধ্য হওয়াকে ৭টি কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পরিবার-পরিজনের প্রতি ভারসাম্যপূর্ণ ভালোবাসা

এ ভালোবাসা সহজাত হলেও ক্ষেত্রবিশেষে চর্চানির্ভর। মানুষ সাধারণত পরিবার পরিজনের প্রতি অন্তরের বিশেষ টান বা আকর্ষণ অনুভব করে। আবার স্ত্রী-পরিজন সুদর্শন, ধার্মিক অথবা সৎগুণাবলিসম্পন্ন হলে তার মাত্রা হয় আরো বর্ধিত। তেমনিভাবে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার মায়া-মমতাও জন্মগত। কোনো সন্তানের প্রতি পিতার অত্যধিক মহব্বত অথবা একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অন্তরের বিশেষ টান দোষণীয় নয়। পরিবারের সদস্য বা স্ত্রীর-পরিজনের প্রতি ভালোবাসা সহজাত হওয়ার কারণে এটি কারো আয়ত্বাধীন থাকে না। তবে সুযোগ-সুবিধা ও লেন-দেনসহ যে সকল বিষয় মানুষের একান্ত আয়ত্বাধীন, সেখানে কাউকে অগ্রাধিকার দেয়াই হলো অপরাধ। এমন ঘটনা স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ. قَالَ عَفَّانُ: وَيَقُولُ: " هَذِهِ قِسْمَتِي " ثُمَّ يَقُولُ: اللهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

“আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে রাত্রী যাপনের পালা বন্টন করতেন। বর্ণনাকারী আফ্ফান বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ! আমার আয়ত্বাধীন বিষয়ে সমতা ও ইনসাফ রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যে বিষয়টি (মনের টান) আমার আয়ত্বাধীন নয়, তাতে সমতার ক্ষেত্রে ত্রুটি

হলে আমাকে ক্ষমা করবেন”।[১]

ইমাম নাসায়ি ও হাকিম বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ

“আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার দু'টি স্ত্রী আছে। তাদের মধ্যে কারো প্রতি একপেশে আচরণ করলে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার একটি অঙ্গ এক পাশে হেলে পড়বে”।[২]

সন্তানের প্রতি ন্যায়বিচার বিষয়ে তিনি ইরশাদ করেন। ইমাম বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেন,

عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا وهو يَخْطُبُ على المنبرِ قَالَ: تصدَّق عليَّ أَبِي بصدقةٍ، فَقالتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: وهي أمُّ النعمانِ لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى بَشيرٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقال: إني تصدّقتُ على ابني بصدقةٍ، فقالت عَمرةُ بنتُ رواحةَ وهي أمُّ النعمانِ، لا أرضى حتى تُشهِدَ عليها رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قال «لَكَ بَنُونَ غَيْرُهُ؟» قال: نعم. قال: «فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ الَّذِي أَعْطَيْتَ هَذَا؟قال: لا. قال: هَذَا جَوْرٌ فَلا تُشْهِدْنِي عَلَيْهِ. اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَبَرُّوكُمْ» . قال: فرجع أبي في صدقتِه

“নু'মান ইব্‌ন বশির মিম্বরে খুতবা প্রদানরত অবস্থায় বলেন, আমার বাবা আমাকে একটি বিশেষ উপঢৌকন দিলেন, নু'মানের মা ‘আমরা বিনতু রাওয়াহা বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমোদন ছাড়া এটি আমি মানতে পারি না। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[১] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদ*, (রিয়াদ: মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, ১৪২১ হি./ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪২, পৃ.৪৬, হাদিস নং- ২৫১১১।

[২] নাসায়ি, আবু আবদির রহমান আহমদ ইব্‌ন শু'আইব ইব্‌ন আলি আল খোরাসানি, *সুনানু নাসায়ি*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, ১৪২৪ হি. /২০০৪ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৬৩, হাদিস নং- ৩৯৪২

বললেন, আপনার কি এছাড়াও আরো সন্তান আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদেরকেও কি আপনি অনুরূপ দাক্ষিণ্য প্রদান করেছেন? তিনি বললেন, না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা এক প্রকার জুলুম। এমন অন্যায় কাজে আমাকে সাক্ষ্য না রাখাই উত্তম। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সন্তানদের মাঝে বৈষম্যহীন ও ইনসাফ-পূর্ণ আচরন করো। যেভাবে তাদের নিকট থেকেও তোমরা বৈষম্যহীন আচরণ আশা করো"।[১]

যুবক-যুবতীর অনৈতিক ভালোবাসা

যাদের সঙ্গে বিয়ে-শাদি বৈধ, তাদের প্রতি ভালোবাসার নিবেদন শুধুমাত্র হারামই নয়; এমন পরিবেশে সহাবস্থানও হারাম। কোনো নারী-পুরুষের অন্তরে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুর্ঘটনাক্রমে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হলে তাদের করণীয় হলো, আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টি অবনত রাখা এবং গর্হিত কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। সুযোগ ও সামর্থ্য সাপেক্ষে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। অন্যথায় নিজের মনকে নিয়ন্ত্রনে রাখার চেষ্টা করা। যাতে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা যায়। এ ক্ষেত্রে সে সবর ও ধৈর্যধারণের পুরষ্কার লাভ করবে। আল্লাহর ভয়ে পাপ-পঙ্কিলতার পথ থেকে ফিরে আসাই হলো সবর। কুরআন-সুন্নাহ'য় সবরের পুরষ্কার হলো সব আমলের চেয়ে অধিক। হাদিস শরিফে এই বিষয়ে ধৈর্যধারণকারীদের শহিদের মর্যাদা দান করা হয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ। হাদিসটি ইব্ন আব্বাস (রাদি.) থেকে 'মওকূফ' (موقوف) এবং আয়িশা (রাদি.) থেকে 'মরফু' (مرفوع) বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইব্ন তাইমিয়া 'আমরাদুল কুলুব' (امراض القلوب) কিতাবে খতিব বাগদাদি এর বরাতে হাদিসটি বর্ণনা করেন, হাদিসটি নিম্নরূপ

مَن عشِقَ وكتَمَ وعَفَّ وصبَرَ؛ غفَرَ اللهُ له، وأدخَلَه الجَنَّةَ

"কোনো নারী-পুরুষ কারো প্রতি অকৃষ্ট হবার পর যদি তা গোপন রাখে এবং সততার পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"

---

[১] তাবরানি, আবুল কাসিম সুলাইমান ইব্ন আহমদ ইব্ন আইয়ুব, *আল মু'জামুল কাবির*, (কায়রো: মাকতাবাহ ইব্ন তায়মিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২১, পৃ. ৮০, হাদিস নং- ৭৬।

আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

> "কোনো নারী-পুরুষ কারো প্রতি প্রেমাসক্ত হবার পর যদি তা গোপন রাখে এবং নিষ্কলুষতার পথ অবলম্বন করে মৃত্যুবরণ করে, সে শহিদের মর্যাদা লাভ করবে"।

এ হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধের ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের বিপরীতধর্মী আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। মুহাদ্দিসগণের একটি অংশের পর্যালোচনায় আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাদি.) বর্ণিত 'মওকূফ' হাদিসটি 'যয়িফ' হলেও আয়িশা (রাদি.) বর্ণিত হাদিসটি 'সহিহ' হওয়ার বিষয়টি অগ্রাধিকার লাভ করে। ইমাম যারকাশি 'আল-তাযকিরাহ' (التذكرة) কিতাবে হাফিয বুরহানুদ্দিন আল বিকা'য়ি 'আসওয়াকুল উশশাক'(اسواق العشاق) কিতাবে এবং হাফিয আলাউদ্দিন মুগলাতায়ি (الوَاضِحُ المُبِيْنُ فِيْ ذِكْرِ مَنِ اسْتَشْهَدَ مِنَ المُحِبِّيْنَ) কিতাবে বিশুদ্ধতার দিকটি প্রধান্য দেন। ইমাম যুরকানি (المقاصد الحسنة) গ্রন্থে হাদিসটি 'হাসান' বলে অভিমত প্রকাশ করেন। বিশিষ্ট হাদিস গবেষক ও মিসরীয় মুহাদ্দিস আবুল ফয়েয আল-গুমারি (১৩২০-১৩৮০ হি.) হাদিসটির উপর নাতিদীর্ঘ গবেষণাপূর্বক এটির বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন। তিনি (درء الضعف عن حديث من عشق وكتم وعف) শীর্ষক হাদিসটির দুর্বলতার প্রতিকার নামে ১৪০ পৃষ্ঠার একটি গবেষণাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১]

এ হাদিসের উপর আবু আবদুর রহমান ইবনু আকিল আল জাহিরিও একটি গবেষণাকর্ম প্রকাশ করেন। তিনি 'মরফু' হাদিসটি 'যয়িফ' এবং 'মওকূফ' হাদিসটির বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন। মুহাদ্দিসগণের অভিমত হলো, হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধ যাই হোক না কেনো, মূলত এখানে মর্যাদাটি হলো ধৈর্য ও সবরের। আল্লাহর ভয়ে ও নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদপূর্বক সে এ মর্যাদায় উপণীত হয়েছে। আল্লাহর ভয়ে পাপকর্ম থেকে ফিরে আসার একমাত্র পুরষ্কার হলো জান্নাত। অর্থের বিবেচনায় হাদিসটির বিশুদ্ধতায় কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾

"যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং

---

[১] আল গুমারি, আহমদ ইব্‌ন সিদ্দিক, *দারউদ দু'ফ আন হাদিসি মান আশিকা ওয়া কাতামা ওয়া আফ্‌ফা*, (কায়রো: দারুল মুসতাফা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২), পৃ. ৭।

নিজের নফসের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, জান্নাতই হলো তার ঠিকানা”।[১]

অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে,

﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ﴾

“যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত”।[২]

যুবক-যুবতীর অবৈধ ভালোবাসার ক্ষেত্রে করণীয়

নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ সৃষ্টি হলে তাদের পারস্পরিক বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই হলো উত্তম ব্যবস্থা। ইমাম ইব্ন মাজা ইব্ন আব্বাস (রাদি.) থেকে বর্ণনা করেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَمْ يرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ

“দুই জন নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বা অন্তরের ভালোবাসা সৃষ্টি হলে, তাদের উত্তম চিকিৎসা হলো, উভয়ের মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা করা”। [৩]

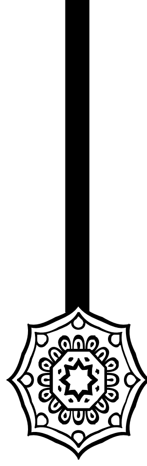
কোনো নারী-পুরুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি আকর্ষণবোধ করা এক প্রকারের মানসিক রোগ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূপ-লাবণ্যের মোহে এ রোগে আক্রান্ত হয়। এমন রোগে সাধারণত ঐ সকল মানুষই আক্রান্ত, যাদের অন্তর আল্লাহর মহব্বত-শুন্য থাকে। ভালোবাসা নামের এ সকল মনোরাগ এক প্রকারের জটিল ব্যাধি। যার নিরাময়ে ইসলামি শরি'য়ত নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের চেষ্টাসহ দৃষ্টি অবনত রাখা, এ বিষয়ে চিন্তামগ্নতা পরিহার করা, সামর্থ্যসাপেক্ষে বিয়ে করা। অন্যথায় রোযা পালন করা।



[১] আল কুরআন, ৭৯;৪০।

[২] আল কুরআন, ৫৫;৪৬।

[৩] ইব্ন মাজাহ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন য়াযিদ আল কাযভিনি, সুনানু ইব্ন মাজাহ, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (কায়রোঃ দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা/বি.), খ. ৩, পৃ. ৫৪, হাদিস নং- ১৮৪৭।



বিনোদন ইসলামের শাশ্বত অধিকার

ইসলাম একটি বর্ণাঢ্য ও প্রাণবন্ত জীবন বিধান। অন্য ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রমাণ হলো, এ ধর্ম সকল প্রকার কল্যাণকে স্বীকৃতি দেয় এবং মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির বিকাশে প্রতিবন্ধক নয়। আবেগ-অনুভূতি মানুষের জীবনের একটি অনিবার্য অধ্যায়। ইসলাম এটির স্বাভাবিক ও বৈধ বহিঃপ্রকাশকে কখনো বাধা প্রদান করে না। হাসি-কান্না, আনন্দ-আহ্লাদ প্রাণীজগতের প্রয়োজনীয় অংশ হলেও বিনোদন মানব জীবনেরই একটি ঘনিষ্ট অনুসঙ্গ। বিনোদন বিষয়ে ইসলাম কী বলে? এমন প্রশ্নের ঘুরপাক প্রতিটি মুসলিম-মানসে। বক্ষমাণ প্রবন্ধ সে বিষয়েরই কিঞ্চিত আলোকপাত।

আল কুরআনে ইউসূফ (আ.) এর ভ্রাতাদের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

"আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। সে তৃপ্তিসহকারে খাবে এবং খেলবে। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো"।[১]

[১] আল কুরআন, ১২:১২।

ইমাম জাসসাস ‘আহকামুল কুরআন’ গ্রন্থে এ আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে বলেন, ইয়াকূব (আ.) এর সন্তানেরা যে খেলাধূলার কথার উল্লেখ করেছিলেন, তা ছিল একান্ত বৈধ। নতুবা ইয়াকূব (আ.) কখনো এতে সম্মতি দিতেন না।[১]

ইবনু আশুরা ‘আত তাহরির ওয়াত তানভির’ গ্রন্থে বলেন, বিনোদন, শরীরচর্চা ও বিরক্তিভাব কাটানোর লক্ষ্যে বৈধ খেলাধূলা প্রত্যেক ধর্মে বৈধ ছিল। তবে শর্ত হলো, এটি যেন অভ্যাসে পরিণত না হয়।

ফকিহ আবুল লাইস সামারকান্দি ‘বাহরুল উলুম’ গ্রন্থে বলেন, এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কোনো মুসলিম নিজ শহর থেকে বের হবার পর শরি‘য়ত পরিপন্থি নয় এমন বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা দোষণীয় নয়। [২]

খেলাধুলা ও বিনোদন বৈধ হবার বিষয়ে আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য। ইমাম আহমদ সংকলিত ‘মুনাদ’ কিতাবে বর্ণিত আছে, ঈদের দিনে মসজিদে নববিতে আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া) মুসলিমগণ বিভিন্ন খেলাধূলা ও সামরিক কলা-কৌশল প্রদর্শন করছিলেন। এ ধরনের বিনোদনমূলক খেলাধূলার গুরুত্ব অনুধাবন করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لِيَعْلَمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارٰى أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً إِنِّي بُعِثْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ

“ইহুদি-খ্রিস্টানগণ যেনো জানতে পারে, আমাদের দীনে শরীরচর্চামূলক বিনোদনের সুযোগ রয়েছে। আমি এমন একটি দীন সহকারে প্রেরিত হয়েছি, যা অন্যন্ত সহজ-সরল । এখানে আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে”।

বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হিজরতের পর সাহাবায়ে কেরাম যখন দেখতে পেলেন, মদিনার অধিবাসীগণ বছরের নির্দিষ্ট দিনে তাদের আনন্দ উদযাপন করছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইসলামি ঐতিহ্য-নির্দেশক দু’টি ঈদের দিন নির্ধারণ করে দিলেন।

---

[১] জাসসাস, আহমদ ইব্‌ন আলি আল রাযি, *আকামুল কুরআন*, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৫ হি.), খ. ৪, পৃ. ৩৮১ ।

[২] সামারকান্দি, ফকিহ আবুল লাইস নাসার ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহিম, *বাহরুল উলুম*, (স্থান ও তা/বি, http://www.altafsir.com), খ. ২, পৃ. ১৮২।

তিনি বলেন, لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

"প্রত্যেক জাতির একটি ঈদ আছে। আর এটি হলো আমাদের ঈদ"।

একবার ঈদের দিনে আনসার এর দুইজন মুসলিম বালিকা আয়িশা (রাদি.) এর গৃহে পূর্বপুরুষদের কীর্তি ও ঐতিহ্য-সম্বলিত সঙ্গীত আবৃত্তি করতে লাগলেন। আবু বকর সিদ্দিক (রাদি.) এ কাজ শরি'য়তবিরোধী মনে করে তাদের বাধা প্রদান করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দিক (রাদি.) এর উদ্দেশ করে বললেন ,

'তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং পূর্বের মতো গাইতে দাও'।

হাদিস ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানুষের স্বাভাবিক ও সহজাত অনুভূতি প্রকাশে ইসলাম কখনো বাধা দেয়নি; বরং ক্ষেত্র-বিশেষে উৎসাহ দিয়েছে। সাহাবি কবি হাসসান ইব্‌ন সাবিত (রাদি.) এর জন্য কবিতা আবৃত্তির নিমিত্তে স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নবভিতে মিম্বর স্থাপন করে এ কথার প্রমাণ দিয়েছেন যে, বৈধ আনন্দ-আহ্লাদ ইসলামে দোষণীয় নয়।

ইসলামে আনন্দ প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট পরিধি রয়েছে। এ গণ্ডি অতিক্রম করা এবং লাগামহীন ও বেসামাল আনন্দ-স্ফুর্তিতে মত্ত হওয়া শরি'য়তে অনুমোদিত নয়। আনন্দ প্রকাশে শরি'য়তের নীতিমালা অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। আনন্দ প্রকাশের লাগামহীন যাত্রা কী বিপদ ডেকে আনে, সে বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাদি.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ ، فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ

"প্রত্যেক কাজের একটি বিনোদনমূলক দিক আছে। আবার প্রত্যেক আনন্দের একটি বিরতিমূলক সীমা রয়েছে। সুতরাং যার সীমা হবে আমার সুন্নাহ পর্যন্ত, সে সফলকাম হবে। আর যে এ সীমা অীতক্রম করবে, সে নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবে।"

ফেরেশতা কর্তৃক গোসলপ্রাপ্ত (غسيل الملائكة) সাহাবি হানযালা (রাদি.) এর উপলব্ধিতে রয়েছে মুসলমানদের বিনোদনবিষয়ক অনেক প্রশ্নের সদুত্তর। রসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘনিষ্ট ও মর্যাদাবান সাহাবি হিসেবে পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার মনে একবার এমন প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছিল যে, স্ত্রী-পরিজনের সঙ্গে খোশ-গল্প ও হাস্য-কৌতুক ইবাদত এর পরিপন্থিই নয়; এটি মুনাফেকিরই একটি বিশেষ পরিচয়। সহিহ বুখারি বর্ণিত হাদিসে মূল ঘটনাটি হলো,

একদা আবু বকর (রাদি.) হানযালাকে (রাদি.) প্রশ্ন করলেন, কেমন আছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি তো মোনাফেক হয়ে গেলাম। সিদ্দিকে আকবর অবাক বিস্ময়ে তাকে প্রশ্ন করলেন। আপনি এ কী বলছেন! তিনি বিষয়টি খোলাসা করে বললেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে যখন আমরা জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনায় মগ্ন থাকি, তখন আমাদের মনের অবস্থা থাকে এক রকম। আবার যখন স্ত্রী-পরিজন ও ধন-সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যাই, তখন মনের অবস্থা হয় অন্য রকম। আবু বকর (রাদি.) বললেন, আমারও তো ঠিক একই অবস্থা। তারা উভয়ে রসূল এর নিকট গিয়ে তাদের মনের অবস্থা বর্ণনা দেয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

> والَّذِي نَفْسِي بيدِہ، لو تَدومونَ علَى ما تكونونَ عندِي، وفي الذِّكرِ، لصافَحَتْكم الملائكةُ على فُرُشِكم وفي طُرُقِكم، ولكن يا حَنْظلةُ ساعةً وساعةً » ثلاثَ مرَّاتٍ
>
> "সে সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। আমার নিকট থাকাবস্থায় তোমাদের মনের যে অবস্থা থাকে, যদি সর্বদা তোমাদের অবস্থা এমন হতো, তবে পথে-প্রান্তরে তোমাদের সঙ্গে ফেরেশতারা মোসাফাহা করতো। কিন্তু হে হানযালা! তুমি মাঝে-মধ্যে কিছু সময় বিনোদন ও আনন্দ-আহ্লাদে কাটাবে। তিনি এ কথাটি তিন বার বললেন"।[১]

অবসর সময়ে ভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে হৃদয়ের জড়তা ও ক্লান্তি দূর হয়। মনে স্ফুর্তি ও প্রফুল্লতা আসে। কাজের শক্তিতে নতুন মাত্রা যোগায়। এ হাদিস দ্বারা এমন অর্থ গ্রহণ করা সমীচীন নয় যে, একজন মুসলমান পুরো দিন খেলা-ধূলায় মগ্ন থাকবে। অহেতুক কাজে সময় নষ্ট করবে। অথবা এমন বিনোদনে লিপ্ত থাকবে, যা মনের সুস্থ চিন্তাধারায় বিকৃতি ঘটায় এবং মন সর্বদা বিনোদনমূখী থাকে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ রাত পর্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। অধিকহারে কান্নাকাটি করতেন। তার পবিত্র যবান থাকত সর্বদা আল্লাহর যিকরে সিক্ত। তিনি থাকতেন প্রতিনিয়ত চিন্তামগ্ন। এতদসত্ত্বেও তিনি জীবনের প্রতিটি বস্তুর অধিকার

---

[১] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদ*, (রিয়াদঃ মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, ১৪২১ হি./ ২০০১ খ্রি.), খ. ৩১, পৃ. ৩৯০।

সম্পর্কে সবাইকে সদা সতর্ক করতেন। মানুষের মনের অধিকার ও চাওয়া-পাওয়াকে তিনি কখনো অবহেলা করেননি। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাদি.) এর সীমাতিরিক্ত ইবাদত করার কথা জানতে পেরে তিনি তাকে উদ্দেশ করে বলেন,

صُمْ وأَفْطِرْ،إنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

"তুমি রোযা রাখবে, আবার মাঝে-মধ্যে তাতে বিরতি দেবে। কেননা তোমার উপর তোমার রবের অনেক অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার মনেরও কিছু অধিকার আছে। তোমার পরিবারের উপরও তোমার অধিকার আছে। সুতরাং প্রত্যেককে তাদের অধিকার দিয়ে দাও"।[১]

সাহবায়ে কেরাম মুসলিম জীবনদর্শন সম্পর্কে ছিলেন সর্বাধিক অবগত। মুসলমানের বিনোদনের সীমা-সরহদ সম্পর্কে তারা ছিলেন সম্যক অবগত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সার্বক্ষণিক খাদেম আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাদি.) বলেন,

وإني أَتَخَوَّلُكُم بالمَوْعِظَةِ، كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَتَخَوَّلُنَا بها مَخَافَةَ السَّآمَةِ علينا

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে কল্যাণ কামনার মাধ্যমে আমাদের তত্ত্বাবধান করতেন, তেমনিভাবে আমিও তোমাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করি। তার কারণ হলো, সর্বদা একটি কাজে মনোনিবেশ করার কারণে যেন আমাদের একপেশে মানসিকতা ও বিরক্তিভাব না আসে"।[২]

তিনি বিনোদনকে মুসলিম জীবনের একটি প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

أغيثوا القلوب، فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَ عَمِيَ

"তোমরা মনকে সহযোগিতা করো। কেননা মনের উপর জবরদস্তি করা হলে

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫/২০০৪), খ. ৩,পৃ. ৩৮, হাদিস নং- ১৯৬৮।

[২] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫/২০০৪), খ. ১, পৃ. ২৫, হাদিস নং- ৭০।

তা অন্ধ হয়ে যায়"।[১]

তিনি আরো বলেন,

إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَإِقْبَالاً وَإِدْبَاراً، فخذوها مِنْ قِبَلِ شَهْوَتِهَا وَإِقْبَالِهَا، وذروها عند فترتها وإدبارها فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَ عَمِيَ

"মনের কিছু চাহিদা আছে। হৃদয়েরও আছে উত্থান-পতন। অন্তরের বিরতি ও স্থিরতার একটা সময় থাকে, তখন হৃদয় থাকে আয়ত্বাধীন। মন যখন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার লক্ষ্যে লাগামহীন হয়ে ওঠে, তখন তার লাগাম টেনে ধরো। আবার যখন মন পশ্চাদপদ বা বিরাম অবস্থায় থাকে, তখন তার লাগাম ছেড়ে দাও"।[২]

নবি পরিবারে দীক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবি চতুর্থ খলিফা আলি (রাদি.) বলেন,

أَجِمُّوا هذه القلوبَ، والتمسوا لها طرائفَ الحكمة، فإنّها تملّ كما تملّ الأبدان

"তোমরা অন্তরসমূহকে বিশ্রাম দাও। হৃদয়ের জন্য এমন কিছু বিষয় তালাশ করো, যা হবে চমৎকার ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। কেননা শরীরের মতো মনও ক্লান্তি বোধ করে"।[৩]

ছয় জন সাহাবি ছিলেন সকল ইসলামি জ্ঞানের সমাহার। এ বিজ্ঞ সাহাবিদের অন্যতম আবু দারদা (রাদি.) বলেন,

إنّي لأستجمّ نفسي بالشيء من اللّهو غيرِ المحرّم، فيكون أقوى لها على الحقّ

"আমি মনকে বৈধ খেলা-ধূলার জন্য সুযোগ দেয়াকে ভালা মনে করি। যেন সত্যের পক্ষে এটি শক্তি সঞ্চয় করতে পারে"।[৪]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে খেলা-ধূলা বা বিনোদন মৌলিক কোনো বিষয় ছিল না। বরং এটা ছিল মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক শক্তি মাত্র। আবার কখনো এটা শরীর চর্চা,

---

[১] ইব্‌ন আবদিল বার, আবু য়ুসুফ উমার ইব্‌ন আবদুল্লাহ, *বাহজাতুল মাজালিস*, পৃ. ১১৫ http://www.alwaraq.net|

[২] ইবনু আবদিল বারঃ , আবু য়ুসুফ উমার ইব্‌ন আবদুল্লাহ, বাহজাতুল মাজালিস, পৃ. ২০২ http://www.alwaraq.net |

[৩] ইব্‌ন আবদিল বার , আবু য়ুসুফ উমার ইব্‌ন আবদুল্লাহ, *জামিউ বায়বনিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, (সউদি আরব: দারু ইব্‌ন আল জাওযি, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৬৫৯।

[৪] ইব্‌ন কুতাইবা, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল মাজিদ, *তাভিলু মুখতালাফিল হাদিস*, (বৈরুত:আল মাকতাবুল ইসলামি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৯), পৃ. ২৭৬।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও প্রতিযোগিতামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। যেমনিভাবে অংশ নিয়েছেন আয়িশা (রাদি.)। এ ধরনের বিনোদনমূলক প্রতিযোগিতা অনেক সময় দীনের প্রচারে সহযোগী ভূমিকা পালন করে। কুস্তি খেলায় 'রুকানা' নামক বীর বিক্রমকে তিনি পরাস্ত করেছেন। যা ছিল তার ইসলাম গ্রহণের প্রধান কারণ।

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ فَقَالَ: ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا

"একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আসলাম' গোত্রের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন, তারা বাজারে তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। তিনি বললেন, হে ইসমাইল (আ.) এর বংশধর! তোমরা তীর আন্দাযি প্রতিযোগিতা অব্যাহত রেখো। কেননা তোমাদের পিতা ছিলেন একজন তীর আন্দায" ।[১]

উমার ইব্ন আবদিল আযিয ছিলেন পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদ। যিনি রসূল প্রদর্শিত পদ্ধতিতে (خلافة علي منهاج النبوة) ইসলামি খিলাফত পরিচালনা করেন। বিনোদন বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের পর তিনি ছিলেন সর্বাধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। বিনোদনের পরিধি বর্ণনা করতে তিনি গিয়ে বলেন,

لَا بَأْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْهُوَ وَيَمْرَحَ وَيَتَّفِكَهُ، عَلَى أَنْ لَا يَجْعَلَ ذٰلِكَ عَادَتَهُ وَخُلُقَهُ، فَيَهْزُلُ فِي مَوْضِعِ الجِدِّ، وَيَعْبَثُ وَيَلْهُو فِي وَقْتِ الْعَمَلِ

"আনন্দ-উল্লাস, খেলা-ধূলা বা বিনোদন করা মুসলমানের জন্য দোষণীয় হতে পারে না। কিন্তু এটাকে অভ্যাসে পরিণত করাই হলো নিন্দনীয়। বিনোদনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর দিক হলো, বাস্তবতার ক্ষেত্রে ঠাট্টা করা এবং কাজের সময় খেলা-ধূলা করা।"

তিনি আরো বলেন,

تُحَدِّثُوْا بِكِتَابِ اللهِ وَتُجَالِسُوْا عَلَيْهِ، وَإِذَا مَلَلْتُمْ فَحَدِيْثٌ مِنْ أَحَادِيْثِ الرِّجَالِ حَسَنٌ جَمِيْلٌ

"তোমরা আল কুরআনের আলোচনা করো। এতে গবেষণা করো। আর

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫/২০০৪), খ. ৪, পৃ. ৩৮, হাদিস নং- ২৮৯৯ ।

যখন এ বিষয়ে বিরক্তিভাব আসে, তখন ইতিহাসের সুন্দরতম অধ্যায়সমূহ আলোচনা করতে পারো"। [১]

সাহাবায়ে কেরামের জীবনে বিনোদনের প্রকৃতি ও পরিধি বিষয়ে তাঁর এ উক্তিটি সবিশেষ উদাহরণযোগ্য।

"সাহাবায়ে কেরাম কখনো একগুঁয়ে ও একপেশে আচার-আচরণ পছন্দ করতেন না। তারা বৈধ বিষয় বর্জনপূর্বক মৃত ব্যক্তির মতো জীবনযাপন করতেন না। তারা নিজেদের সভা-সমাবেশে কবিতা আবৃত্তি করতেন। জাহিলি যুগের বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। যখন তাদের মধ্যে কেউ দীনি বিষয়ে কোনো আলোচনা শুরু করতেন, তখন তাতে খুব গুরুত্ব প্রদান করতেন"।

দ্বিতীয় শতাব্দীর শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস ও জ্ঞানতাপস আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক। জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি তাঁর অবসর সময় কীভাবে কাটতো, তা নিম্নের উক্তি দ্বারা প্রতিভাত হয়।

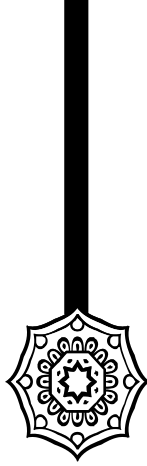
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ يَمْكُثُ فِيْ بَيْتِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ وَتِجَارَتِهِ، قَارِئًا لِتُرَاثِ السَّلَفِ، فَإِذَا مَا سُئِلَ: أَلَا تَسْتَوْحِشْ؟ أَجَابَ: كَيْفَ أَسْتَوْحِشُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ؟

"আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক দীনি ইলম ও ব্যবসায়-বাণিজ্য থেকে অবসর গ্রহণের পর পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য নিয়ে পড়া-শুনা করতেন। তাকে প্রশ্ন করা হলো, এ বিষয়টির প্রতি আপনার অত্যধিক ঝোঁক ও আগ্রহের কারণে কি এ আশঙ্কা হয় না যে, আপনি দীনি ইলম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবেন ? তিনি উত্তর দিলেন, আমি যখন যে অবস্থায় থাকি, রসূল ও তার সাহাবিদের সাথে থাকি।"[২]

---

[১] বাইহাকি: আবু বকর আহমদ ইব্‌ন হোসাইন ইব্‌ন আলি, *আস সুনান আল কুবরা*, (বৈরুত: দার আল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, সম্পাদনা: আবদুল কাদির আতা, ১৪২৪/২০০৩), খ. ৪, পৃ. ৩১৮ ।

[২] খতিব বাগদাদি, আবু বকর আহমদ ইব্‌ন আলি, *তারিখু বাগদাদ*, (বৈরুত: দারুল গারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৪১২), খ. ১০, পৃ. ১৫৪।



সুস্থ সংস্কৃতি মুসলিম সমাজের ন্যায্য অধিকার

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহর ইসলামি সংস্কৃতির রাজধানী হিসেবে ইউনিসেফের স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস সুপ্রাচীন। আরব্য মুসলিম বণিকদের মাধ্যমেই এ গৌরবগাঁথার গোড়াপত্তন। ইখতিয়ারুদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খালজির সুদক্ষ নেতৃত্বে এটি রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির মর্যাদা লাভ করে। সুদীর্ঘ ইতিহাসের পরিক্রমায় এ সংস্কৃতি বিকশিত হয় তিলে তিলে। সভ্যতাপ্রেমী মুসলিম জনগোষ্ঠী আবহমান কাল থেকে লালন করে আসছে এ সংস্কৃতির সুষমা। পরিতাপের বিষয় হলো, মুসলিম জনপদে লালিত এ সংস্কৃতি কালের আবর্তে বিকৃত রূপ ধারণ করে । পরমাগ্রহে ধারণকৃত এ সভ্যতার বাস্তব রূপ হয়ে পড়েছে নির্জীব, নিথর ও মুমূর্ষু। মফস্বল ও গ্রাম্যজীবনে অনাড়ম্বর ও জৌলুসহীনভাবে আচরিত এ সংস্কৃতি শান্তি, সম্প্রীতি ও শৌর্য-বীর্যের আধার হলেও গুলশান বনানীর মতো আলিশান বিপনীকেন্দ্রে ও উচ্চবিত্তের অভিজাত এলাকার পার্টি-অনুষ্ঠানে এটি অধরা, অপাংক্তেয় ও অস্পৃশ্য। বিত্তশালী, ধনাঢ্য ও কথিত এলিট সোসাইটির কিয়দংশই এটিকে মনে-প্রাণে লালন করে।

মূলত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামের ঘনিষ্টতা অত্যন্ত সুনিবিড়। ইসলাম

হলো মানবমুক্তির সর্বশেষ সনদ। কুরআন-সুন্নাহয় মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ যাবতীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনা বর্তমান। মুসলমানদের একমাত্র সংবিধান আল কুরআনে এ বিষয়ে বিষদ আলোচনা রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

"আমি আল কুরআনে কোনো বিষয় বাদ দেয়নি"।

মহানবির জীবনের প্রতিটি খণ্ডাংশ মুসলমানদের সামগ্রিক জীবনের একমাত্র আদর্শ। নবি প্রেরণের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

"আমি আপনার প্রতি আল কুরআন এ জন্য নাযিল করেছি, যাতে মানুষের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়সমূহ তাদের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।"[১]

কুরআন সুন্নাহর পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরামের জীবন এবং তাদের পরবর্তী যুগের মুসলিম মনীষীদের কার্যক্রমও আমাদের সংস্কৃতির অংশ। দীনের বীর সেনানী ও মিশনারী মুসলিম বণিকেরা বিজিত অঞ্চলে ইসলামি শরি'য়ার আলোকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কালচারাল ইনষ্টিটিউট ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর মজবুত ভিতও নির্মাণ করেছেন। নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও বিজিত অঞ্চলে প্রচলিত সুষ্ট ও সুকুমার কৃষ্টি-কালচারের সমন্বয়ে ইসলামি সভ্যতা পরিণত হয় এক বিশাল মহিরুহে। ইসলামের তাওহিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা রোম ও পারস্য সভ্যতাকে ধর্মীয় ভাবাবেগ, রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও সামরিক শক্তি দিয়ে পরাজিত করেছে তাই নয়; একটি অজেয় সাংস্কৃতিক দর্শনেও পরাভূত করেছে দুই পরাশক্তিকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের বীর মুজাহিদগণ রাষ্ট্রীয় সীমানা পাহারা দিয়েই ক্ষান্ত হননি; সাংস্কৃতিক চৌহদ্দিও রক্ষা করেছে। খেলাফত ব্যবস্থার অবর্তমানে ইহুদি-খ্রিষ্টান অক্ষ শক্তি ইসলামকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকেই বিতাড়িত করে ছাড়েনি; ইসলামি সংস্কৃতির মূল দর্শন থেকেও বিচ্যুত করেছে সুকৌশলে। ঔপনিবেশিক শাসনের দু'শো বছরের গোলামির জিঞ্জির এতদঞ্চলের মুসলমানদের ক্ষমতার মসনদ থেকেই বিদায় করেনি; ইসলামের

---

[১] আল কুরআন, ১৬;৪৪।

মৌলিক ধ্যান ধারণাও পাল্টে দিয়েছে। উপমহাদেশের ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে তাদের সাময়িক ছন্দপতন ঘটলেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর হিসেবে রেখে গেছে সাংস্কৃতিক অপছায়া, বস্তুবাদী চিন্তাধারা ও ভোগবাদী মানসিকতা। মূলত উপমহাদেশসহ পৃথিবীর অসংখ্য মুসলমান বর্তমানে আদমশুমারিতে মুসলিম হলেও আকার-অবয়ব, লেবাস-পোশাক ও চিন্তা-চেতনায় ইহুদি খ্রিষ্টান প্রভাবিত। মুসলিম জনপদে বৃটিশ শাসনের সাফল্যের পরিচিতি এবং পশ্চিমা প্রভাবিত কালচারের চিত্র তুলে ধরে ড. ইকবাল বলেন,

وضع میں تم ہو نصاری تو تمدن میں ہنود
یہ مسلمان ہیں جنھیں دیکھ کے شرمائے یہود

"তোমারা কৃষ্টি-কালচারে খ্রিস্টানের ন্যায়। সভ্যতায় তোমরা পৌত্তলিক। এমন মুসলিমদের দেখে ইহুদিরাও হাসে"।

একজন জার্মান পণ্ডিত এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

I have visited many countries in Eurup and Asia. I have found in Islamic countries muslims. but not islam. I have found in Eurup Islam. but not muslim.

"আমি এশিয়া ও ইউরোপের অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি, মুসলিম দেশে অনেক মুসলমান দেখলেও সেখানে ইসলামের বাস্তব প্রতিচ্ছবি দেখিনি। পক্ষান্তরে ইউরোপে মুসলমান না থাকলেও তাদের মধ্যে ইসলামের অনেক বিধি বিধানের বাস্তবায়ন দেখেছি"।

বস্তুত দীর্ঘদিনের খেলাফত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ও অমুসলিম শাসনের নাগপাশ মুসলমানদের বোধ-বিশ্বাসের মৌলিক কাঠামো ও বাস্তব দর্শন থেকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে। সাংস্কৃতিক গোলামি মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক গোলামি থেকে বহুগুণ মারাত্মক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ ও ড্রোন হামলার চেয়েও শতগুণ ক্ষতিকর হলো পাশ্চাত্য সভ্যতার সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। ইউরোপ-আমেরিকার সমন্বিত নেতৃত্বে পরিচালিত ৪০টি দেশের অক্ষজোট ন্যাটো দীর্ঘ একযুগ আফগানিস্তানে সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, মুসলমানদের সামরিক শক্তি দিয়ে পরাজিত করা কখনো সম্ভব নয়। নৈতিক পদস্খলন ঘটিয়ে তাদেরকে দুর্বল করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তাদেরকে নৈতিকভাবে পরাভূত করতে হলে সাংস্কৃতিক পর্যদুস্তিই

অবধারিত। আফগানিস্তান ত্যাগের পূর্বে তারা সেদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কাঠামো পুণনির্মাণের লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার রুপায়ণ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন করেছে। মধ্য এশিয়ার সম্ভাব্য, উদীয়মান ও দূর্বার ইসলামি শক্তি তালেবান যুবকদের প্রতিপক্ষ হিসেবে পাকিস্তানি ললনা মালালাকে নোভেল প্রাইজ দিয়ে বিশ্ব দরবারে পরিচিতি দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। হিসাব বিজ্ঞানে পারদর্শী এ জাতি বুঝতে পেরেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তিতে যেখানে সময় লেগেছে মাত্র পাঁচ বছর; সেখানে আফগানিস্তানে দুই যুগ যুদ্ধ করেও সফলতার কোন সম্ভাবনার দুয়ার খুলতে পারেনি। একজন মার্কিনীকে রণাঙ্গণে দাঁড় করাতে যেখানে মাথাপিছু ১০ লক্ষ ডলার খরচ হয়; সেখানে একজন মুজাহিদ অস্ত্র হাতে হাজির হয় নিজ খরচে। তারা শুধু স্বেচ্ছায় অর্থব্যয় করছে তা নয়; হৃদপিন্ডের তাজা খুনের নজরানাও দিচ্ছে। আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতার এমন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ইরাক আফগানিস্তানের সামরিক আগ্রাসনের পর সাংস্কৃতিক ধ্বংসযজ্ঞের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে মুসলিম বিশ্বের অনেক প্রান্তে। বিশ্বায়নের নামে ধ্বংসাত্মক এক অসম যুদ্ধ শুরু হয়েছে বাংলাদেশেও। তাওহিদি জনতার বিশাল আয়তনের এ ভূখণ্ড রয়েছে এ তালিকার শীর্ষস্থানে। সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের মানুষ আফগানিস্তানের পাঁচগুণ। এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সেক্যুলার সংস্কৃতিতে অবগাহণ করা গেলে তাদের গ্লোবাল ভিলেজ পরিকল্পনা স্বার্থক হবে। এ গ্লোবাল ভিলেজের পুঁতিগন্ধময় স্যেকুলার সংস্কৃতিতে অভিযাত্রার আশায় তাদের রয়েছে নিরন্তর প্রচেষ্টা।

পাশ্চাত্যের দিগম্বর সংস্কৃতি ও পৌত্তলিক সভ্যতার সম্মিলিত রূপায়ণ হল বাংলাদেশের গণমাধ্যম। পাশ্চাত্যের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা এদেশে ব্যয় করছে প্রচুর অর্থবিত্ত। তাদের প্রধান সহায়ক শক্তি হল, সুশীল সমাজখ্যাত কতিপয় মুখচেনা সেবাদাস। পঁয়তাল্লিশটি'র অধিক বেসরকারী টিভি চ্যানেল তাদের প্রতিনিধিত্ব করছে স্বার্থকভাবে। তাদের আর্থিক মদদ যোগাচ্ছে ভেসে আসা শেওলার মতো অনেক ভিনদেশী এনজিও। দেশের প্রথম সারির কয়েকটি প্রিন্ট মিডিয়া শহর ও মফস্বলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের জয়গান গেয়ে চলছে। সে সংস্কৃতি চর্চার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন দিবস উদযাপনের অন্তরালে পরকীয় সংস্কৃতির একটি বলয় গড়ে তোলেছে। বাংলা নববর্ষ, ভালবাসা দিবস, থার্টি ফার্স্ট নাইট ও বিজয় মেলার নামে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালায় ভারতীয় শিল্পী ও কলাকুশলীদের অহেতুক ও দৃষ্টিকটু

আনাগোনা দেশীয় সভ্যতার উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। উচ্চবিত্তের এক শ্রেণির পাশ্চাত্য শিক্ষিত তরুণ-তরুণীকে টার্গেট করে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কিছু মস্তিষ্কবিকৃত পরজীবি অন্তঃসারশুন্য ও যৌন সুঁড়সুঁড়িপূর্ণ সংস্কৃতির বিকাশ ও লালনের অতি ভয়ানক খেলায় মেতে উঠেছে।

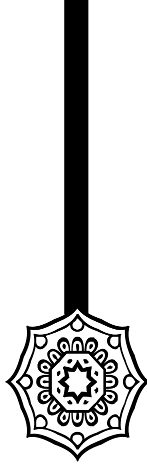
এ দেশে ঐশী, পরিমল ও পান্না মাস্টারের মতো কুলাঙ্গারদের জন্ম দিয়েছে এই সংস্কৃতিতে। পাপিয়া, পরিমণি, শাহেদসহ অগণিত নর্দমার কীটসমূহ আস্কারা পেয়েছে নষ্ট সংস্কৃতির আশ্রয়-প্রশয়ে। আবার জাতীয় কিছু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের নির্লজ্জ মায়াকান্নাও লক্ষ্য করা যায় তাদেরই অশুভ পতনে।

হিন্দুদের অনুকরণে মঙ্গল প্রদীপ হাতে নিয়ে শোভা যাত্রা বের করা, রবীন্দ্র সঙ্গীতকে ইবাদতের সাথে তুলনা করা, শরী'য়া আইনকে মানবতা বিরোধী ও বর্বর আইন জ্ঞান করা, বেসরকারী টিভি চ্যানেলসমূহের প্রত্যক্ষ পৃষ্টপোষকতায় তৃণমূল পর্যায়ে নাচিয়ে ও গায়ক তৈরি করা, লাক্স সেরা সুন্দরী নির্বাচনসহ বিভিন্ন পণ্যের এ্যড দিয়ে সুদর্শনা নারীদের পণ্যায়ণ, মেধা বিকাশে সহায়তার নামে শিক্ষার্থী নারীদের সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন, সর্বজনীন বাঙালিয়ানার লেবেল এটে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে নারী পুরুষ পরস্পরের মুখে উল্কি আঁকা, মাটির সাঁনকিতে ইলিশ পান্তা সাজিয়ে হতদরিদ্র মানুষের সাথে উপহাস করা, দূর্গাপূজা ও ঈদ উৎসবকে সর্বজনীন অনুষ্ঠানের স্লোগান দিয়ে ধর্মীয় পরিচয় বিলুপ্ত করা ইত্যাদি ঢাকাকে ইসলামি সংস্কৃতির রাজধানী ঘোষণার সাথে ঠাট্টা করার নামান্তর।।

দেশজ সংস্কৃতির বিপরীতে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশে প্রধান হাতিয়ার হলো দেশের কতিপয় গণমাধ্যম বা মিডিয়া জগত। একত্ববাদী চেতনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া একটি শক্তিশালী অস্ত্র। সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্ঠীর চিন্তা চেতনার বিরুদ্ধে তারা অনবরত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে বুদ্ধিজীবি নামক একশ্রেণীর শেকড় ও মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিদের পুতুলের মত নাচানো হচ্ছে। অর্থাৎ ঘুরেফিরে তাদের মতামত ও বক্তব্যকেই ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের স্বাধীন মনোভাব ও চিন্তাধারা প্রকাশের এতে কোন সুযোগ নেই। বরং সংখ্যালঘিষ্ট মানুষের চিন্তাধারা চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চলে আসছে অতি সন্তর্পনে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের আবেগ অনুভূতির বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণার কারণে দেশের মানুষ ফুঁসে উঠছে দীর্ঘদিন যাবত। এ ধরনের একচেটিয়া কীর্তিকাণ্ড সাধারণ মানুষের উপর মানসিক অবিচার ও জুলুম

নির্যাতনের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। পশ্চিমাদের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন ও স্বদেশীয় তাওহিদী সভ্যতার মূলোৎপাটনে তাদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এখনই সতর্ক না হলে ঈমান আকিদা হারানোর পাশাপাশি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হারানোরও সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।





ইসলামে পূর্বপুরুষের স্মৃতিচারণের অধিকার

পৃথিবী নামক অতি ক্ষুদ্র এ গ্রহ হাজারো কীর্তিমান পুরুষের গৌরবময় স্মৃতির অম্লান স্মারক। বর্ণাঢ্য এ বসুন্ধরার বিস্তৃত আকাশ লক্ষ-কোটি মনীষীর নিঃস্বার্থ সেবায় স্নিগ্ধ-কৃতার্থ । আলো ঝলমল জ্যোৎস্না ও দীপ্তিমান আবহ তাদের পরশে ধন্য ও গৌরবান্বিত। স্বজাতির তরে অনেকের আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয়। দেশ ও জাতির কল্যাণে আধুনিক বিশ্বের নেতৃবর্গ অকথ্য জেল-জুলুম সহ্য করে । কেউ হয় বিতাড়িত। আবার কেউ হয় দেশান্তরিত। জাতির ঘাড়ে বিজয়ের মালা পরিধান করার পর আমাদের সিংহভাগ নেতা আত্মত্যাগের সুদাসলে বদলা নেয় । পক্ষান্তরে এ বসুন্ধরা এমন কতিপয় মহৎ ব্যক্তির ইতিহাসে ভাস্বর, যারা জাতির জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন মাত্র; গ্রহণ করেননি, অবদান রেখেছেন; প্রাপ্ত হননি। এমন ব্যক্তি ও পরিবার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয়। তাদের নীতি ও স্মৃতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট বরণীয়। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর পরিবার ঐ সকল মহা-মনীষীর মধ্যে অন্যতম। আলে ইমরান, আলে দাউদ ও আলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরিবার। শান্তিপ্রিয় ও সভ্য জনগোষ্ঠীর নিকট তাদের নীতি-আদর্শ এক বর্ণাঢ্য অধ্যায় ও প্রাণবন্ত ইতিহাস। স্রষ্টা ও সৃষ্টিজীবের নিকট যুগপৎ সমাদৃত এমন

কতিপয় পরিবার প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা আদম, নূহ, আলে ইবরাহিম ও আলে ইমরানকে বিশ্বজগতের উপর বাছাই করেছেন'।[১]

পূর্বপুরুষদের স্মৃতিচারণ ও তাদের নীতি-আদর্শের সংরক্ষণ ইসলামে একটি স্বীকৃত বিষয়। বক্ষমাণ প্রবন্ধে মুসলিম উম্মাহ'র প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ ইবরাহিম (আ.), আলে ইবরাহিম ও তাদের সুযোগ্য উত্তরসূরী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আলে মুহাম্মদ এর বরকতময় স্মৃতি প্রসঙ্গে নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করা হলো।

নবি-রসূলদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন একটি ইবাদত

আল্লাহর প্রতি ইবরাহিম (আ.) ও আলে ইবরাহিম এর সর্বাত্মক আত্মসমর্পণ ও আত্মোৎসর্গের অপূর্ব ঘটনা শুধুমাত্র স্বীয় রবের নিকট পছন্দনীয় তাই নয়; বিশ্বজগতের প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠীর নিকটও সমাদৃত। যার ফলে এ পরিবারের স্মৃতিবিজড়িত অনেক কীর্তিগাঁথা পরবর্তী উম্মাহ'র উপর আল্লাহ তা'য়ালা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। 'মানাসিকুল হজ' তথা হজের যাবতীয় বিধি-বিধান এই পরিবারের গৌরবদ্বীপ্ত স্মৃতিচারণ। হজের প্রধান রুকন আরাফায় (উকূফ) অবস্থান করা আদি পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার স্মৃতির নিরবচ্ছিন্ন রোমন্থন। এটি তাওবা করার পর আদি পিতা-মাতার পুনর্মিলনের কথাও মনে করিয়ে দেয়। তাওয়াফ করার বিধান পূর্বকাল থেকে প্রচলন থাকলেও ইবরাহিম ও ইসমাইল (আ.) কর্তৃক বাইতুল্লাহর পুনঃনির্মাণের পর থেকেই পুরোদমে চালু হয়। সাফা-মারওয়ার সা'ই মুসলিম জাতির মাতা হাজেরা এর আন্তরিক ত্যাগ ও নিঃশর্ত হুকুমতামিলের স্মৃতিময় সৌধ। 'যমযম' ইসমাইল (আ.) ও তাঁর পরিবারের প্রতি আল্লাহর কুদরতি অনুদানের জ্বলন্ত নযির। মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপ পিতা-পুত্রের শত্রু মোকাবেলার প্রতিকী দৃষ্টান্ত। আর কুরবানি হলো প্রভুর সমীপে বান্দার অকৃত্রিম ও নিষ্কলুষ প্রেমের নযরানা।

পূর্বপুরুষের এ সকল স্মৃতিচারণ ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতিচর্চার অংশ হিসেবে পালিত হয় তাই নয়; শরি'য়তের মৌলিক ইবাদত ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান হিসেবেও

[১] আল কুরআর, ৩;৩৩।

গণ্য। হজ ও উমরা আদায়ের ক্ষেত্রে এ সকল নুসুক শরি'য়ত অনুমোদিত অত্যাবশ্যকীয় আমল ও আবশ্যকীয় প্রসঙ্গ। নতুবা আরাফার মাঠে আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া করা ব্যতীত মৌলিক কোনো কর্মসূচি নেই। তেমনিভাবে মুযদালিফায় অবস্থান, শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ, সাফা মারওয়া সাঈ করার মধ্যে স্মৃতিচারণ ব্যতীত মৌলিক কোনো ইবাদত নেই। পূর্বপুরুষের ইয়াদ-স্মরণই এখানে মৌলিক ইবাদতের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। হজের সময় কঙ্কর নিক্ষেপকে ইসলামি শরি'য়তে মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসরণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাদি.) বলেন,

الشَّيْطَانَ تَرْجُمُونِ وَمِلَّةَ أَبِيكُمْ تَتَّبِعُونَ

"শয়তানের প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপ মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম (আ.) এর পবিত্র স্মৃতির সগৌরব রোমন্থন"।[১]

পিতা-পুত্রের স্মৃতিচারণপূর্বক পাথর নিক্ষেপের ফজিলত ও তাৎপর্য বর্ণনায় ইব্‌ন উমার (রাদি.) বলেন,

وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ؛ لا يَدْرِي أَحَدٌ مَا لَهُ حَتَّى يُوَفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"পাথর নিক্ষেপকারীকে কেয়ামতের দিন ন্যায্য পুরস্কার পরিপূর্ণভাবে পরিশোধ করার পর বুঝতে পারবে তাতে কী প্রতিদান রয়েছে"।[২]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকবার কঙ্কর নিক্ষেপের মাধ্যমে একটি মারাত্মক কবিরা গুনাহ মার্জনা হবার সুসংবাদ প্রদান করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,[৩]

وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا تَكْفِيرُ كَبِيرَةٍ مِنَ الْمُوبِقَاتِ

ইসমাঈল (আ.) তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে শত্রুর মোকাবেলা করতেন। জীবিকানির্বাহ কিংবা প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রেও তীর-ধনুকের বহুল

---

[১] বাইহাকি, আহমদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলি ইব্‌ন মুসা, *আল সুনান আল কুবরা*, (বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২৫০, হাদিস নং- ৯৬৯৩।

[২] ইব্‌ন হিব্বান, আবু হাতিম মুহাম্মদ ইব্‌ন হিব্বান ইব্‌ন আহমদ, *সহিহ ইব্‌ন হিব্বান*, (বৈরুত: মুয়াসসাসা আল রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ হি.), খ. ৫, পৃ. ২০৭, হাদিস নং- ১৮৮।

[৩] বায্যার: আবু বকর আহমদ ইব্‌ন আমর *মুসনাদ*, (মদিনা মুনাওয়ারাহ: মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, প্রথম সংস্করণ, ২০০৯খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ৩১৭, হাদিস নং- ৬১৭৭।

প্রচলন করতেন। অধঃস্তন পুরুষদের এ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ارْمُوا بَنِي إسماعيل، فإن أَبَاكُم كان رَامِياً،

"হে ইসমাইল এর বংশধর! তোমরা তীর চালনার চর্চা করো। কেননা তোমাদের পিতা ছিলেন একজন দক্ষ তীর-আন্দায" ।[১]

আলে মুহাম্মদ এর স্মৃতিচারণ

ইবরাহিম (আ.) এর সুযোগ্য বংশধর নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আহলে বাইত ও তাঁর সাহাবিদের ঐকান্তিক ইমান, বাতিলের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও আত্মবিসর্জনের গৌরবময় ইতিহাস পিতৃবংশের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এ উম্মতের পর অন্য কোনো জাতির অভ্যুদয়ের সুযোগ থাকলে তাদের উপরও উম্মতে মুহাম্মদিয়ার আমল-আখলাকের স্মৃতিচারণ ফরজ-ওয়াজিবের মর্যাদা লাভ করতো। মক্কার প্রতিটি পাদদেশ ও পবিত্র মদিনার প্রতিটি গলি-পথ মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্মৃতি-স্মারক। মক্কা মদিনার আলো–বাতাস সাহাবায়ে কেরামের পদ-ধূলিতে একাকার। সুনানু নাসায়ি, মুসনাদে বায্যায ও তাবরানিসহ অনেক হাদিসের কিতাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মে'রাজ এর প্রাক্কালে পূর্ববর্তী নবি-রসূলদের পূণ্যভূমির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও বরকত হাসিলের অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

নাসায়ি শরিফে বর্ণিত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

انْزِلْ فَصَلِّ فَفَعَلْتُ. فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطَيْبَةَ وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ، ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ. فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْمٍ حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

"জিবরিল (আ.) আমাকে বলেন, আপনি বোরাক থেকে অবতরণ করুন এবং নামায আদায় করুন। নামায আদায়ের পর জিবরিল (আ.) আমাকে বলেন, আপনি কী

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), খ. ৪, পৃ. ৩৮, হাদিস- ১২৮৩ ।

জানেন কোথায় নামায আদায় করেছেন? তিনি নিজেই উত্তর দিলেন, আপনার হিজরতের স্থান পবিত্র মদিনায়। একটু পর তিনি আমাকে আবার নামায আদায় করার অনুরোধ করেন। আমি নামায আদায় করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, আপনি কী জানেন কোথায় নামায আদায় করেছেন? তিনি নিজেই উত্তর দিলেন, আল্লাহর সঙ্গে মূসা (আ.) এর কথোপকথনের স্থান সিনাই উপত্যকার তুর পাহাড়ে। একটু পর তিনি আমাকে আবার নামায আদায় করার অনুরোধ করেন। নামায আদায়ের পর তিনি আমাকে বললেন, আপনি কী জানেন কোথায় নামায আদায় করেছেন? তিনি নিজেই উত্তর দিলেন, ঈসা (আ.) এর জন্মভূমি বেথেলহামে (বাইতুল লাহাম)।”[১]

তেমনিভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শু‘আইব (আ.) এর বাসস্থান ও ইবাদতগাহ ‘মাদয়ান’ এ নামায আদায় করা এবং পূণ্যময় স্থানসমূহ পরিদর্শনপূর্বক বরকত হাসিল করার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসটি বায়হাকি, যুরকানি, নশরুত তিব, সিরাতুল মোস্তাফা, সিরাতে কুবরা’সহ হাদিস ও সিরাতের বিভিন্ন কিতাবে গুরুত্বসহকারে বর্ণিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, ইবনুল কাইয়িম রচিত ‘যাদুল মা‘আদ’ কিতাবে হাদিসটি সহিহ নয় বলে মন্তব্য করার কারণে অনেক সিরাত রচয়িতা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন।

উমার (রাদি.) এর বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের প্রাক্কালে মসজিদে আকসার নির্দিষ্ট স্থানে নামায আদায় করার মাধ্যমেও পূণ্যময় স্থান দ্বারা বরকত হাসিল করার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ইহুদি ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণকারী কা‘বে আহবার এর নিকট মে‘রাজের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায আদায় নামাযের স্থান (قبة الصخرة) নির্ণয়ের ব্যাপারে জানতে চাইলেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের যে স্থানটি অন্যান্য জায়গা থেকে অধিকতর মর্যাদাবান। কা‘বে আহবার উমার (রাদি.) এর জন্য স্থানটি চিহ্নিত করলে তিনি সেখানেই নামায আদায় করেন। এ বিষয়ে ইব্‌ন কাসির এর বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য।[২]

ثُمَّ جَاءَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَاسْتَدَلَّ عَلَى مَكَانِهَا مِنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ وَأَشَارَ عَلَيْهِ كَعْبٌ أَنْ يَجْعَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ وَرَائِهِ

[১] নাসায়ি, আবু আবদির রহমান আহমদ ইব্‌ন শু‘আইব ইব্‌ন আলি আল খোরাসানি, *সুনানু নাসায়ি*, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, ১৪২৪ হি. /২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২১, হাদিস নং -৪৫০।

[২] ইবনু কাসির, আবুল ফিদা ইসমাইল বিন উমার, *আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া*, (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খ্রি.), খ.৭, পৃ. ৫৬।

ইব্‌ন কাসির এর অপর বর্ণনা মতে উমার (রাদি.) এর নামায আদায়ের স্থানটি ছিল দাউদ (আ.) এর মেহরাব।"[১]

إِنَّهُ لَبَّى حِينَ دَخَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَصَلَّى فِيهِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ بِمِحْرَابِ دَاوُدَ

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাদি.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্মৃতি-চিহ্নের অনুসন্ধানকে নিজের জন্য বরকতময় আমল হিসেবে গণ্য করতেন। তিনি তন্ন তন্ন করে খোঁজ নিতেন, কোথায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেছেন। আলো-বাতাস গ্রহণ করেছেন। গাছের ছায়া গ্রহণ করেছেন। কোন গাছের তলায় উট ছিলেন।

ইবনুল আসির (৫৫৫-৬৩০) বর্ণনা করেন,

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ كَثِيْرُ الْاِتِّبَاعِ لِآثَارِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى إِنَّهُ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، وَيُصَلِّي فِي كُلِّ مَكَانٍ صَلّٰى فِيْهِ، وَحَتّٰى إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَكَانَ عُمَرُ يَتَعَاهَدُهَا بِالْمَاءِ لِئَلَّا تَيْبَسَ

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাদি.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নীতি-আদর্শ ও স্মৃতিচিহ্ন অধিকহারে খোঁজ করতেন। তিনি অক্ষরে অক্ষরে ও কদম ব-কদম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুকরণ করতেন। এমনকি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে অবতরণ করেছেন, তিনিও বাহন থেকে সেখানে অবতরণ করতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে নামায পড়েছেন, তিনিও সেখানে নামায আদায় করতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আস্তাবলে নিজের উট বাঁধতেন।"[২]

বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে গাছের নিচে অবস্থান গ্রহণ করেন, ইব্‌ন উমার (রাদি.) সেখানে পানি দিয়ে গাছটি সতেজ রাখার চেষ্টা করতেন।

---

[১] ইবনু কাসির, আবুল ফিদা ইসমাইল বিন উমার, *আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া*, (বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খ্রি.), খ.৭, পৃ. ৫৫।

[২] ইবনুল আসির, ইয্‌যুদ্দিন, আবুল হাসান আলি বিন আবিল কারাম, *উসদুল গাবা*, (বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, ১৪০৯ হি./ ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২৩৭।

পূণ্যভূমি দ্বারা বরকত হাসিল করা মুস্তাহাব

পূর্বের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, পূণ্যভূমি দ্বারা বরকত হাসিল করা ইসলামি শরি'য়তে একটি প্রামাণ্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম নববি মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইতবান ইব্‌ন মালিক এর হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

وَفِيْ حَدِيْثِ عِتْبَانَ هٰذَا فَوَائِدُ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا التَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِيْنَ وَآثَارَهُمْ وَالصَّلاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلُّوْا بِهَا وَطَلَبَ التَّبْرِيْكَ مِنْهُمْ

> "নেককার বান্দা ও তাদের স্মৃতিচিহ্ন দ্বারা বরকত হাসিল করা এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। নেককার বান্দাগণ যে স্থানে নামায আদায় করেছেন, তা পূণ্যভূমির মর্যাদা লাভ করে। সেখানে নামায আদায়পুর্বক বরকত গ্রহণ করা শরি'য়তে অনুমোদিত।"

আলে ইবরাহিম এর স্মৃতি যেভাবে আল্লাহ তা'য়ালা কুদরতিভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, আলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্মৃতি সংরক্ষণ করাও এই উম্মতের উপর অপরিহার্য কর্তব্য। মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে, যারা নেককারদের স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এমন কি মক্কা-মদিনায় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও পরিবারের সর্বশেষ স্মৃতি বিলুপ্ত করার চিন্তায় মগ্ন। ১৩৩৪ হিজরিতে মক্কায় সৌদি সরকারের উদ্যোগে বিশ্বের উলামায়ে কেরামের একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। হুসাইন আহমদ মাদানি (রহ.) এর নেতৃত্বে ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ এর উলামাদের একটি প্রতিনিধি দল এ সব ভ্রান্ত আকিদা পোষণকারীদের সামনে উপর্যুক্ত দলিল-প্রমাণ তুলে ধরলে তাদের অনেকের বোধোদয় হয়। তারা 'তাবাকাতে ইবনু সা'দ' এ বর্ণিত উমার (রাদি.) কর্তৃক বৃক্ষ কর্তনের হাদিস তাদের পক্ষে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। অথচ হাদিসটির সনদ মুনকাতি (منقطع) । এতদসত্ত্বেও উপমহাদেশের আলিমগণ বলেন, এটি ছিল উমার (রাদি.) এর নিজস্ব ইজতিহাদ ও মতামত। এটি ফিকহি মাসআলা বা সিদ্ধান্তমূলক বিষয় ছিল না। শির্‌ক-বিদা'তের দ্বার সমূলে উৎপাটনের লক্ষে তিনি এ বৃক্ষ কর্তন করেছিলেন। নবি-রসূলদের বরকতময় স্মৃতি মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে নয়। তদুপরি 'বাই'আতে রিদওয়ান' এর স্মৃতিসৌধ হিসেবে বিবেচিত বৃক্ষটি নির্ধারণের ব্যাপারে সাহাবিদের মধ্যে ঐকমত্য ছিল না। যার সঙ্গে সন্দেহযুক্ত একটি বস্তুকে অযথা সম্মান প্রদর্শনের একটি বিষয় জড়িত। কনফারেন্সে উপস্থিত সৌদি আলিমগণ বলেন, বুজুর্গানে দ্বীনের স্মৃতিচিহ্ন দ্বারা বরকত হাসিল করা দুই

প্রকার। এক. তাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বরকত হাসিল করা। যা সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পশম মুবারক দ্বারা বরকত হাসিল করা। কিন্তু বুজুর্গানে দ্বীনের পূণ্যভূমি দ্বারা বরকত হাসিল করা সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়। এর উত্তরে উপমহাদেশের প্রতিনিধিগণ বলেন, সহিহ বুখারি শরিফে বর্ণিত আছে,

أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ، وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ» قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ البَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ» قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَّنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ

"বদরে অংশগ্রহণকারী আনসারি সাহাবি ইতবান ইব্‌ন মালিক (রাদি.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এই মর্মে আবেদন পেশ করলেন যে, আমি ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন একজন ব্যক্তি। আমি আমার গোত্রে নামাযের ইমামতি করি। প্রচণ্ড বৃষ্টি ও প্লাবনের কারণে তাদের মসজিদে জামাতে শরিক হতে না পারলে গোত্রের লোকদের নিয়ে নামায আদায় করি । আমার বড় আশা, আপনি যদি আমার বাড়িতে এসে একদিন নামায আদায় করেন, বরকত মনে করে স্থানটিকে নামাযের জায়গা হিসেবে নির্ধারণ করবো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ চাইলে একদিন এটি করবো। ইতবান (রাদি.) বলেন, একদিন সকালবেলা সূর্যোদয়ের পর আবু বকরসহ (রাদি.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাড়িতে উপস্থিত হন। তিনি গৃহে প্রবেশ করে বসার পূর্বেই আমাকে বললেন, ঘরের কোন জায়গায় নামায আদায় করবো? আমি গৃহের একটি কোণের দিকে ইশারা করলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে তাকবিরে তাহরিমা বললেন। আমরাও তার পেছনে দাঁড়িয়ে কাতারবন্দি হলাম। তিনি দুই রাকাত নামায আদায়

করে সালাম ফেরালেন।”[১]

এ হাদিস দ্বারা পূণ্যভূমি দ্বারা বরকত হাসিল করা ও বরকত চাওয়া উভয়টিই প্রমাণিত।

মক্কা-মদিনার পূণ্যভূমি

মক্কা-মদিনায় এমন অনেক বরকতময় পূণ্যভূমি রয়েছে, যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত। খদিজা (রাদি.) এর বাসগৃহ মক্কার অন্যতম পূণ্যভূমি। বর্ণিত আছে, জিবরিল (আ.) খদিজা (রাদি.) এর গৃহে চব্বিশ হাজার বার ওহি নিয়ে অবতরণ করেন। যেটি ছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাতাশ বছরের আবাসভূমি। ফাতেমা (রাদি.) এখানে জন্মগ্রহণ করেন। হেরা পর্বতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘদিন আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। একাগ্রচিত্তে আল্লাহর মা'রিফাত ও ইবাদতের সাধনা করেছেন। বনু আমির উপত্যকায় অবস্থিত আবু তালিব এর বাড়ি, যা আলি (রাদি.) এর বাসস্থান। মক্কার অন্যান্য পূণ্যভূমির মধ্যে রয়েছে, বনু তালিব উপত্যকা, যেখানে বনু হাশিমসহ সকল মুসলমান প্রায় তিন বছর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করেন। মুশরিকদের পক্ষ থেকে অমানবিক আচরণের শিকার হয়েছেন। ‘দারুল আরকাম’ মুসলমানদের অন্যতম স্মৃতিময় স্থান। যেখানে নব-দীক্ষিত মসলমানগণ দীনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। যা উমার (রাদি.) এর ইসলাম গ্রহণের স্মৃতিবহ ঐতিহাসিক স্থান। আবু সুফ্য়ানের বাসস্থানও সেখানে অবস্থিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুই রাকাত নামায আদায়ের একটি স্থান সাহাবায়ে কেরামের নিকট যেখানে আজীবন বরকতের বিষয়, সেখানে সাতাশ বছরের ইবাদত-বন্দেগির জায়গা ও ছব্বিশ হাজার বার ওহি অবতরণের স্থানটি কত বরকতময় যথেষ্ট বিবেচনার বিষয়। মক্কায় বাইতুল্লাহর পর খদিজা (রাদি.) এর বাসস্থান সবচেয়ে পূণ্যময় ও মর্যাদাবান স্থান বলে ইমাম তাবরানি উম্মতের ইজমা নকল করেছেন।[২] সাধারণ মুসলিম নর-নারীর নিকট এটি এখন অখ্যাত ও অজ্ঞাত স্থান।

নবি-রসূলদের জীবদ্দশায় তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন উম্মতের জন্য যেমনিভাবে

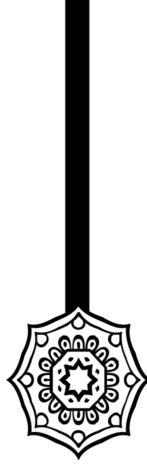
---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫/২০০৪), খ. ১, পৃ. ২৩৪, হাদিস নং- ৪১৩।

[২] বিজনুরি, মাওলানা সাইয়িদ আহমদ রেজা, *মলফুজাতে মুহাদ্দিস কাশ্মিরি*, (দেওবন্দ: বায়তুল হিকমাহ, ১৪০৯ হি.), পৃ, ১৮৪।

ওয়াজিব ছিল, ইন্তেকালের পর তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনও তেমনিভাবে উম্মতের জন্য আবশ্যক। এ বিষয়টি উম্মতের একটি সর্ববাদি সিদ্ধান্ত। শুধুমাত্র ইমাম ইব্ন তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। মুসলিম উম্মাহ'র আরেকটি মাসআলা হলো, একজন নেককার ব্যক্তির কোনো স্থানে শুধুমাত্র অবস্থানের কারণে ঐ স্থানের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ইবাদত-বন্দেগি ও রিয়াজত মোজাহাদার কারণে তার মর্যাদা অনেকগুণ বর্ধিত হয়। যার প্রমাণ হলো, ইবরাহিম (আ.) যে পাথরে দাড়িয়ে কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন, তার পাশে দুই রাকাত নামায আদায় করা তাওয়াফকারীদের জন্য সুন্নাত। যা ইবরাহিম (আ.) এর স্মৃতির প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন। খলিফা উমার (রাদি.) নবি স্বভাবের সাহাবি হবার কারণে তার ইচ্ছার অনুকূলে আল্লাহ তা'য়ালা এ বিধান জারি করেন।





ধনীর সম্পদে গরিবের অধিকার

রমজান মুমিন জীবনের একটি উৎসবমুখর মৌসুম। বৈচিত্র্যময় ইবাদতের বর্ণাঢ্য মাস। সাধারণত দীর্ঘায়িত উৎসবের প্রস্তুতি হয় সময়সাপেক্ষ। আমাদের সমাজে বিয়ে শাদির মতো ব্যয়বহুল আয়োজনের জন্য দীর্ঘ কয়েক বছরের প্রস্তুতি ও আয়োজন দেখা যায়। বাস্তবতার এমন নিরিখে রজব-শা'বান দুই মাস রামাদানের প্রস্তুতির মাস। রামাদানের প্রস্তুতির মর্মার্থের বিষয়ে সাধারণ মানুষ বহুবিধ ভ্রান্তির শিকার। রামাদানের প্রস্তুতি মানে কি? দীর্ঘ এক মাসের পানাহারের জন্য সুস্বাদু ও মুখরোচক খাবারের সংস্থান ? ইফতারির মুখরোচক ও মজাদার আইটেমের সমাহার? সেহরির ভোজন-বিলাসে বাহারি আয়োজন? ঈদের নতুন জামা-কাপড়ের জন্য অর্থের যোগান? গৃহের পুরনো আসবাবপত্রের নবায়ন? গহনা-অলঙ্কারের পুরনো সেটের নব সজ্জায়ন?

দীর্ঘ প্রস্তুতির পর রামাদানের শেষে মুসলিম উম্মাহর সামনে উদিত হয় ঈদুল ফিতরের নতুন চাঁদ। এদিন সচ্চছ মুসলিম নর-নারী ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উপর সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হয়। সদাকা ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি। ইসলামের প্রতিটি বিধিবিধানের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক সুনিবিড়। ইসলামের মৌলিক

ও অবশ্য পালনযোগ্য হুকুম আহকামের সম্পর্ক রাষ্ট্রের সাথে একান্ত প্রাসঙ্গিক ও অবিচ্ছেদ্য। সালাতের মূল উদ্দেশ্য হলো, সকল প্রকার পাপাচার ও গর্হিত কাজ থেকে মানবসমাজের সুরক্ষা। রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানেই এটি পূর্ণতা লাভ করে। সিয়ামের লক্ষ্য হলো, তাকওয়াভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ। যা নিয়মিত অনুশীলণ ও পরিশীলণের বিষয়। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এর বাস্তব প্রতিফলন সম্ভব। হজের মূল আহ্বান হলো, মুসলিম উম্মার ঐক্য ও সংহতি। খেলাফত ব্যবস্থার পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে ইসলামি সংহতির প্রকৃত ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

ইসলামের সদকা দর্শনের মৌলিক চেতনায় রয়েছে দারিদ্র্য বিমোচন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

> "আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের উপর সদকা ফরজ করেছেন, যা ধনীদের নিকট থেকে আদায় করে দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হবে"।[১]

ধনীদের উদ্বৃত্ত সম্পদ গরিবদের মাঝে বন্টনের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ হলো সদকা ব্যবস্থাপনা। দারিদ্র্য বিমোচন বা নাগরিকের মৌলিক চাহিদার যোগান সরকারী কর্মকৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং প্রাগ্রসর নৈতিক দায়িত্ব। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটির নিরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

রমজানের প্রস্তুতি ও সাদাকাতুল ফিত্‌র

মূলত রামাদানের প্রস্তুতির অর্থ হলো, দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার অতীব প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সহজলভ্যকরণ। ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলমানগণ ছিলেন অনেকটা সচ্ছল। সমাজের কিছু মানুষ ছিল ধনাঢ্য আর কিছু হতদরিদ্র। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভাব লাঘবের নিমিত্তে ধনীদের সম্পদে যাকাত-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই মুসলমানগণ রামাদানের পূর্বে যাকাত আদায়ে উৎসাহবোধ করতেন। যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী রামাদান মাসে কঠোর পরিশ্রমের পরিবর্তে হালকা কাজকর্মে জীবিকা নির্বাহ করে সিয়াম পালনের সুযোগ লাভ করতে পারে। রোযা রেখে ভারি ও কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত থাকা

---

[১] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ৫০, হাদিস নং- ১৯।

কষ্টসাধ্য। যার ফলে আমাদের সমাজে কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত শ্রমিকেরা রোযা পালন করে না। এ শ্রেণির মানুষকে সিয়াম পালনে সহযোগিতা করা মুসলিম সমাজের সামষ্টিক দায়িত্ব। প্রয়োজনে কঠোর পরিশ্রম থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ে 'রোযা পালনের নিমিত্তে ভাতা' কর্মসূচি'র আওতায় আনা ইসলামি রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। সিয়াম সাধনার মাসে মুসলিম নর-নারীর জন্য দিনের বেলায় ভারি কাজকর্ম বন্ধ রাখা অথবা রাতের বেলায় কষ্টসাধ্য কাজ করার ব্যবস্থা রাখা দরকার। সৎকাজে সহযোগিতা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"তোমরা সৎ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো। পাপ ও অবাধ্যতায় সহযোগিতা করো না"।[১]

ঈদ সিয়াম সাধনার একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ

শেষ রামাদানের সন্ধ্যাকালে পশ্চিমাকাশে শাওয়াল এর বাকাঁ চাঁদ দৃশ্যমান হলেই পরবর্তী দিন ঈদুল ফিতর অবধারিত। নতুন জামা-কাপড় থাকুক বা না থাকুক, শাওয়ালের প্রথম দিনে কোনো মুসলমানের জন্য রোযা রাখার অনুমতি নেই। ইহতিসাব এর সঙ্গে রোঝা পালন না করে একজন সাধারণ মুসলমান আলীশান অট্টালিকায় জমকালো জামা-কাপড় পরিধান করে ঈদের যে পুলক অনুভব করে না, জীর্ণ কুটিরের শীর্ণ পোশাকে একজন মুত্তাকি মুমিনের ঈদ উৎসব হয় তার চেয়ে বেশি প্রাণবন্ত। সফলভাবে সিয়াম-কিয়াম পালনের অনাবিল আনন্দের কারণে ঈদুল ফিতরের সামগ্রিক আনন্দ-উৎসব তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। অবশ্য যে রোযা পালন করেনি, বাহারি ও জৌলুশপূর্ণ কাপড় কেনার ব্যর্থতার কারণে তার ঈদ উৎসব হয় অনেকটা বিবর্ণ ও পানসে। মুসলিম সমাজে ইব্‌ন রজব (৭৩৬-৭৯৫) হাম্বলি (রহ.) এর এ প্রবচনটির কিংবদন্তি রয়েছে,

لَيْسَ الْعِيْدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيْدَ إِنَّمَا الْعِيْدُ لِمَنْ أَمِنَ الْوَعِيْدَ

"ঐ ব্যক্তির জন্য ঈদ নয়, যে বাহারি ও দামি পেশাক পরিধান করেছে। যে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছে তার জন্যেই ঈদের প্রকৃত আনন্দ"।

সারকথা হলো, ইফতারি-সেহরির মজাদার পানাহার ও নতুন জামা-কাপড়ের

---

[১] আল কুরআন, ৫;২।

সঙ্গে ঈদুল ফিতরের সম্পর্ক অতীব গৌণ। ঈমান ও ইহতিসাব সহকারে সিয়াম ও কিয়াম পালনই হলো মুখ্য। ঈদের নির্মল আনন্দ প্রকাশে ইসলাম কোনো ধরনের বাধা প্রদান করে না; বরং অনেক ক্ষেত্র উৎসাহ যোগায়। যার কারণে কৌলিন্য পরিহারপূর্বক নতুন জামা-কাপড় পরিধান করে ঈদের সালাত আদায় করা ইসলামের একটি শাশ্বত সুন্নাহ। ইব্‌ন উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

فَقَدْ كَانَ يَلْبِسُ أَجْمَلَ شَيْءٍ عِنْدَهُ مِنَ الثِّيَابِ فِي يَوْمِ الْعِيْدِ

"তিনি ঈদের দিন সর্বাধিক সুন্দর কাপড়টি পরিধান করতেন"।

সাদাকাতুল ফিত্‌র: একটি বিজ্ঞানসম্মত আর্থিক ইবাদত

ঈদ উৎসবে দরিদ্র মুসলমানদের শরিক করবার নিমিত্তে সামর্থ্যবানদের উপর 'সাদাকাতুল ফিত্‌র' আদায় করা ওয়াজিব। যার প্রয়োগবিধি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবানুগ। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৃতদাস-স্বাধীন, নারী-পুরুষ ও ছোট-বড় প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য হিসেবে এক সা' খেজুর ও যব সাদকা ফিত্‌র নির্ধারণ করেছেন এবং ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন"।[১]

সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায়ে এমন একটি নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে, যা কিয়ামত অবধি সকল যুগ ও সময়ের সাথে সঙ্গতিশীল। ইসলামের নবি তৎকালীন আরবে প্রচলিত মুদ্রার ভিত্তিতে তার মূল্যমান নির্ধারণ করেননি; বরং কয়েকটি খাদ্যপণ্য নির্দিষ্ট পরিমাণে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আরবের সহজপাচ্য, পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাদ্যপণ্য খেজুরকেই ঘোষণা করা হয়েছে প্রধান উপকরণ হিসেবে। কিসমিস, পনির, গম, যব ও আটাও সদাকা হিসেবে আদায়যোগ্য। যা পৃথিবীর যে কোনো দেশে সহজলভ্য। মুদ্রার পরিবর্তে খাদ্যপণ্য দ্বারা নেসাব নির্ধারণে

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি), খ. ২, পৃ. ১৩০, হাদিস নং- ১৫০৩।

নবিজির বিজ্ঞান মনষ্কতার অকপট পরিচয় মেলে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটি দেশের মুদ্রা অন্য দেশে সাধারণভাবে প্রচলনের রেওয়াজ নেই। বর্তমান পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত আন্তর্জাতিক মুদ্রাটির নাম হলো ডলার। এ ডলারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুদ্রার মান নির্ণয় হয়। নির্ধারিত খাদ্য-পণ্য দ্বারা সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায় ইসলামি শরি'য়তের আর্ন্তজাতিকীকরণের পরিচয় বহন করে। আধুনিক সভ্যতার ডলার এ ধারণা পরিপুষ্ট করে। এ বিধান থেকে ইসলামের সর্বাধুনিক চিন্তাধারার ধারণা পাওয়া যায়। স্বর্ণ-রূপা দ্বারা যাকাতের নিসাব নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ইসলামি আইনের স্থায়িত্বের প্রমাণ বহন করে। স্বর্ণ-রূপা এমন দু'টি খনিজদ্রব্য, যা পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহারযোগ্য এবং তার মূল্যমান সর্বজনগ্রাহ্য।

সাদাকাতুল ফিতরের নেসাবের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সর্বাধিক প্রণিধানযোগ্য তা হলো, এখানে নির্ধারিত পণ্যসমগ্র খাদ্যরুচি ও মূল্যমানের ক্ষেত্রে স্থান, কাল ও পাত্র বিশেষে পরিবর্তনশীল। যা আদায়কারী ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য সুবিধাজনক। খেজুর ও কিসমিস ছিল আরবে নিত্য ও সর্বসাধারণ্যে ব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্য। সহজলভ্য হিসেবে তার মূল্যমানও ছিল কম। দুষ্প্রাপ্য ও ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে আটা ও গম ছিল তৎকালীন আরবে অতি মূল্যবান খাদ্যসামগ্রী। পক্ষান্তরে আমাদের সমাজে আটা ও গম হলো অতি সাধারণ ও সহজলভ্য। তুলনামূলকভাবে খেজুর ও কিসমিস অতি মূল্যবান ও মানসম্পন্ন পণ্য। তৎকালীন আরবে রুটির ম্যূল্যমান ও দুষ্প্রাপ্যতার বিষয়ে বর্ণিত আছে,

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ، ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَارٌ. فَقُلْتُ يَا خَالَةُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ قَالَتِ الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَلْبَانِهِمْ، فَيَسْقِينَا

"উরওয়া আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণনা করেন, আয়িশা (রাদি.) তাকে বলেন, হে ভাগিনা! আমরা লাগাতার তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। এই দীর্ঘ দুই মাস পর্যন্ত রসূলুল্লাহ'র ঘরে রুটি তৈরির আগুন জ্বলতো না। আমি প্রশ্ন করলাম, হে খালাম্মা! আপনারা কী দিয়ে জীবন নির্বাহ করতেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমাাদের একমাত্র

আহার্যবস্তু ছিল দু'টি কালো বস্তু। খেজুর ও পানি। তবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কিছু আনসারি প্রতিবেশি ছিলেন, তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট দুধ হাদিয়া পাঠাতেন, যা আমরা পান করতাম" ।[১]

সাদাকাতুর ফিত্‌র এর ভারসাম্যপূর্ণ নেসাব

সাদাকাতুর ফিত্‌রের আরেকটি বৈজ্ঞানিক ও অত্যাধুনিক দিক হলো, এখানে দাতার স্তরভেদে তিনটি পরিমাণ (নেসাব) নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক. নিম্নমান সম্পন্নঃ- যব, গম ও আটা

খ. মধ্যমান সম্পন্নঃ- খেজুর

গ. উচ্চমান সম্পন্নঃ- কিসমিস ও পনির

উপরের যে কোনো একটি পরিমাণে সাদাকাতুল ফিতর আদায়ে একজন মুসলমান দায়মুক্ত হয়। ইসলাম সদকা আদায়ের ক্ষেত্রে সর্বদা দাতার চেয়েও গ্রহীতার লাভালাভকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। যেভাবে স্বর্ণ ও রূপার দু'টি নিসাবের মধ্যে কারো রূপার নেসাব পূর্ণ হলে প্রাগ্রসর ফকিহদের মতে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। আবার স্বর্ণ ও রূপা উভয়ে মিলে রূপার নেসাব পূর্ণ হলেও যাকাত দিতে হয়। সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায়ের ক্ষেত্রেও উচ্চবিত্তের মুসলমানের জন্য পনির ও কিসমিসের নিসাবে এক সা' হিসেবে আদায় করলে গ্রহীতার স্বার্থ অধিক সংরক্ষিত হয়। যার বর্তমান আনুমানিক বাজার দর (500x3.50 কেজি=) ১৭৫০ টাকা। মধ্যবিত্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে খেজুরের অর্ধ সা' পরিমাণে সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায়ে দাতা গ্রহীতা উভয়ের উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যার বর্তমার বাজারমূল্য (মধ্যমমানের খেজুর) (500x3.50 কেজি =1750) টাকা। আর সাধারণ মুসলমানের জন্য আটা বা গমের মূল্যমানে সাদাকা আদায় করতে কেনো দোষ নেই। যার বর্তমান বাজার দর, (50x1.750 কেজি=) 75 টাকা। (সূত্র:মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা)

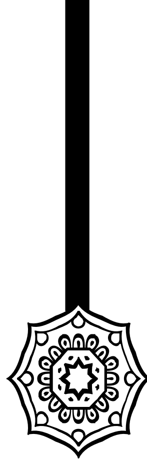
আমাদের সমাজে বিভিন্ন মসজিদ ও প্রতিষ্ঠান থেকে সাদাকাতুল ফিত্‌রের যে মূল্যমান নির্ধারণ করা হয়, তাতে বারবার নিম্নবিত্তের নেসাবটিই আলোচনাই

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি), খ. ৩, পৃ. ১৫৩, হাদিস নং- ২৫৬৭।

আসে। এতে দরিদ্র ও গ্রহীতার অধিকার কতটুকু সংরক্ষিত হয়, তা গভীরভাবে বিবেচনায় আনা দরকার। বর্তমান পণ্যদ্রব্যের দুর্মূল্যের বাজারে ৬০/৭০ টাকা দিয়ে ঈদ উৎসব পালন করা নিতান্তই অসম্ভব ও হাস্যকর। ইসলাম বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী জীবনবিধান হিসেবে সাদাকাতুল ফিতরের মূল্যমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফকিহ, আলিম ও খতিবদের সূতীক্ষ্ণ বিবেচনা ও ধীমান সিদ্ধান্ত ইসলামের বাস্তবানুগ প্রয়োগবিধান আরো গতিশীল হতে পারে।





মুমিন নারী-পুরুষের উপর আল কুরআনের অধিকার

রমজান মাস মহিমান্বিত কুরআন নাযিলের বরকতময় মাস। এ মাসের আগমনে কুরআনের চর্চা বেড়ে যায় অধিকমাত্রায়। কুরআন চর্চার নিমিত্তে এ মাসে তারাবিহ নামাযে পবিত্র কুরআন একবার খতম করা সুন্নাত। রমজান মাসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরিল (আ.) এর সঙ্গে কুরআনের দাওর করতেন। আল কুরআনের তেলাওয়াত একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক ইবাদত। অন্যের নিকট থেকে কুরআন শোনেও তেলাওয়াতের সমান সওয়াব লাভ করা যায়। তেলাওয়াত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। নিছক তেলাওয়াত বা আক্ষরিক পাঠ কুরআন নাযিলের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। শুধুমাত্র শব্দ-পঠনে এ উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। আল কুরআনের পূর্ণাঙ্গ চর্চার মাধ্যমেই এ লক্ষ্য অর্জিত হয়।

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য

কুরআন নাযিলের নানাবিধ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আল কুরআনেই বিবৃত হয়েছে সুনিপুণ

উপস্থাপনায়। এটি মানুষের হেদায়ত ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরুপণ করে। কুরআন নাযিলের লক্ষ্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾

"এটি এমন এক বরকতময় কিতাব, যা আপনার উপর নাযিল করেছি, যাতে তারা আল্লাহর আয়াতসমূহে চিন্তা-গবেষণা করতে পারে"।[1]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾

"কিছু নিরক্ষর মানুষ শুধুমাত্র কুরআনের নিরেট তেলাওয়াত সম্পর্কে অবগত। তারা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করে পরিচালিত হয়"।[2]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"আমি আপনার নিকট আল কুরআন নাযিল করেছি, যাতে মানুষের জন্য নাযিলকৃত এ কুরআন তাদের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং তারা এতে চিন্তা-গবেষণা করতে পারে"।[3]

কুরআন চর্চার পদ্ধতি

তেলাওয়াত ছাড়াও কুরআন চর্চার বিধিবদ্ধ কিছু পরিভাষা রয়েছে। এ সকল পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে কুরআন নাযিলের বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ক্বিরাত, তারতিল, হিফজ, দরস, তাফাক্কুর ও তাদাব্বুর কয়েকটি কুরআনিক পরিভাষা। আল কুরআনের চত্রে চত্রে এ সকল পদ্ধতি বারবার আলোচনা করা হয়েছে।

[1] আল কুরআন, ৪৭;২৪।
[2] আল কুরআন, ২;৭৮।
[3] আল কুরআন, ১৬;৪৪।

কিরাতুল কুরআন

কিরাতুল কুরআন আল কুরআন চর্চার একটি অন্যতম পদ্ধতি। আল কুরআনে কিরাত শব্দটি দ্বি-বিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক. নিছক পাঠ করে শোনানো। যেখানে আমল করা উদ্দেশ্য হয় না। শ্রোতাকে শোনানোই এখানে প্রধান লক্ষ্য।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ﴾

"আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে, যেনো আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হই এবং কুরআন তেলাওয়াত করি"।[১]

কাফেরদের উদ্দেশ করে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এ নির্দেশ পালনার্থে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের সামনে আল কুরআন তেলাওয়াত করতেন। যাতে আমল উদ্দেশ্য ছিল না। কাফেরদের সামনে কুরআনের মু'জিযা প্রদর্শন ও তার প্রভাব বিস্তারই ছিল এ তেলাওয়াতের মূল লক্ষ্য।

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "বলুন, আল্লাহ চাইলে আমি তোমাদের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করব না এবং তোমাদেরকে এ বিষয়ে জ্ঞাতও করবো না"।[২]

দুই. কিরাতুল কুরআন এর দ্বিতীয় অর্থ হলো, কুরআন এর বিধান অনুযায়ী আমল করা। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাদি.) আল কুরআনের আয়াত يتلونه تلاوته حق এর তাফসির প্রসঙ্গে বলেন, يتبعونه حق اتباعه অর্থাৎ যারা কুরআনের হুকুম আহকাম যথাযথ অনুসরণ করে।

তারতিলুল কুরআন

তারতিল শব্দের অর্থ হলো, তাজভিদের বিধি অনুসরণপূর্বক এত ধীরে-সুস্থে কুরআন পাঠ করা, যাতে পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের নিকট কুরআনের অন্তর্নিহিত ভাবধারা বোধগম্য হয়। আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং তার নবিকে কুরআন শিক্ষার পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন,

---

[১] আল কুরআন, ২৭:৯১-৯২

[২] আল কুরআন, ১০:১৬।

﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾

"আপনি তারতিল সহকারে কুরআন তেলাওয়াত করুন"।[১]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾

"এ কুরআন আপনার প্রতি এজন্য নাযিল করেছি, যাতে তা মানুষের জন্য ধীর-স্থিরভাবে পাঠ করেন"।[২]

দরসুল কুরআন

দলবদ্ধভাবে কুরআনের পাঠ গ্রহণ করা কুরআন চর্চার একটি সুন্দর পদ্ধতি। এ পদ্ধতির অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে হাদিসের বিভিন্ন গ্রন্থে। মুসলিম শরিফে বর্ণিত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ , يَتْلُونَ كِتَابَ اللهُ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمْ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَه

"আবু হুরাইরা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কুরআনের তেলাওয়াত ও দরস গ্রহণের লক্ষ্যে মসজিদে কোনো জামাত একত্রিত হলে, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে। তাদের কথা আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশতাদের নিকট আলোচনা করেন"।[৩]

হুজাইফা ইবনুল য়ামান (রাদি.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কুরআন তেলাওয়াতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

---

[১] আল কুরআন, ৭৩;৪।

[২] আল কুরআন, ১৭;১০৬।

[৩] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ২৭৯, হাদিস নং- ২৬৯৯।

عن أبي عبد الله حُذَيْفَةَ بنِ اليمانِ -رضي الله عنهما- قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ ليْلَةٍ، فَافَتَتَحَ الْبقرة، فقُلْت يرْكَعُ عِندَ المائة، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْت يُصلِّي بِهَا في رَكْعةٍ، فَمَضَى فَقُلْت يَرْكَع بهَا، ثمَّ افْتَتح النِّسَاءَ، فَقَرأَهَا، ثمَّ افْتتح آلَ عِمْرانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إذَا مرَّ بِآيَةٍ فِيها تَسْبِيحُ سَبَّحَ، وإِذَا مَرَّ بِسْؤالٍ سَأل، وإذَا مَرَّ بِتَعَوذٍ تَعَوَّذَ

"এক রাতে আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেছনে নামায আদায় করলাম। তিনি সূরা বাকারা দিয়ে নামায শুরু করলেন, আমার ধারণা ছিল, একশত আয়াত তেলাওয়াতের পর তিনি রুকু করবেন। তিনি কিরাত অব্যাহত রাখলেন। আমি মনে করলাম, এক রাকাতে হয়তো এ সূরা সমাপ্ত করবেন। তিনি কিরাত অব্যাহত রাখলেন এবং সূরা আলে ইমরান ও নিসা শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। তিনি খুব ধীর-স্থিরভাবে তেলাওয়াত করতেন। প্রার্থনামূলক কোনো আয়াতে পৌঁছুলে আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন। তাসবিহসম্বলিত কোনো আয়াত আসলে তাসবিহ পাঠ করতেন। আশ্রয় প্রার্থনার কোনো আয়াত আসলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন"।[১]

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ (যাদের নিকট আমি কুরআন নাযিল করেছি, তারা এটির যথাযথ তেলাওয়াত করে) এ আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাদি.) বলেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه! إِنَّ حَقَّ.تِلَاوَتِه أَنْ يُحِلَّ حَلَالَهُ، وَيُحَرِّمَ حَرَامَهُ، وَيَقْرَأُهُ كَمَا أَنْزَلَهُ اللهُ، وَلَا يُحَرِّفَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه، وَلَا يَتَأَوَّلَ مَنْهُ شَيْئاً عَلٰى غَيْرِ تَأْوِيْلِه

"আল্লাহর কসম! কুরআন তেলাওয়াতের হক হলো, হালালকে হালাল বলে মনে করা এবং হারামকে হারাম হিসেবে মান্য করা। যেভাবে এটি নাযিল হয়েছে সেভাবে তেলাওয়াত করা। কুরআনের শব্দাবলির স্থান পরিবর্তন না করা। বাস্তব অর্থের বিপরীত ব্যাখা-বিশ্লেষণ না করা"।[২]

---

[১] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ.১, পৃ. ৫৩৬।

[২] ইব্ন কাসির, আবুল ফিদা ইসমাইল ইব্ন উমার, *তাফসিরুল কুরআনিল কারিম*, (রিয়াদ:দারু তাইয়িবা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২০ হি.), খ. ১, পৃ. ৪০৩ ।

তিনি আরো বলেন,

"আমাদের নিকট আল কুরআন এর শব্দাবলি মুখস্ত করা কঠিন হলেও সেমতে আমল করা সহজ। আমাদের পরবর্তী যুগের মানুষের জন্য আল কুরআন হেফজ করা সহজ, কিন্তু সেমতে আমল করা হবে কঠিন"।[১]

তাদাব্বুরুল কুরআন

তাদাব্বুর কুরআন চর্চার একটি অন্যতম পরিভাষা। এ পদ্ধতিতে কুরআন চর্চার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে। কুরআনের বিধি-বিধান মতে নিজের আমল আখলাক সংশোধনের নাম হলো তাদাব্বুর। তাদাব্বুর এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হাসান বসরি বলেন,

والله ما تدبُّرهُ بِحِفْظِ حُرُوفِهِ وإضاعةِ حُدُودِه، حتى إنّ أحدَهُم ليقول: قرأت القرآن كله، ما يُرى له القرآنُ في خُلُق ولا عمل

"আল্লাহর কসম! কুরআনের শব্দাবলি মুখস্ত করার নাম তাদাব্বুর নয়। আমল আখলাক সংশোধন না করে সমগ্র কুরআন মুখস্ত জানার কোনো স্বার্থকতা নেই"।[২]

তাফাক্কুরুল কুরআন

আল কুরআন নাযিলের একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো, এতে চিন্তা-গবেষণা করা। সুষ্ঠু মস্তিষ্কের সঠিক চিন্তা সর্বাঙ্গীন সাফল্যের চাবিকাটি। বিশ্ব মানবতার চূড়ান্ত মুক্তির লক্ষে আল্লাহ তা'য়ালা আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তাফাক্কুর এর প্রসঙ্গ টেনেছেন। এ প্রসঙ্গে ইব্ন হিব্বান বর্ণিত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য।

لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا: ﴿**إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ**﴾ الآية كلها

"এই রাত্রে আমার উপর এমন একটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যে ব্যক্তি এটি পাঠ

---

[১] কুরতুবি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবি বকর, *আল জামি' লি আহকামিল কুরআন*, (কায়রো: দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৯।

[২] ইব্ন কাসির, আবুল ফিদা ইসমাইল ইব্ন উমার, *তাফসিরুল কুরআনিল কারিম*, (রিয়াদ:দারু তাইয়িবা, দ্বিতীয় সংকরণ, ১৪২০ হি.), খ. ৭, পৃ. ৬৭।

করে তাতে চিন্তা-গবেষণা করবে না তার জন্য দুর্ভোগ।”[১] আয়াতটি এই- {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} الآية كلها

নামাযে কুরআন তেলাওয়াতের ফজিলত

কুরআন তেলাওয়াতের বহুবিধ ফজিলতের বর্ণনা রয়েছে হাদিসের বিভিন্ন কিতাবে। অবস্থাভেদে এটির সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। নামাযে কুরআন তেলাওয়াত ও তা শোনার মাধ্যমে সর্বাধিক সওয়াব লাভ করা যায়। আরবের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ লাল উটের চেয়েও যার মর্যাদা বেশি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ " فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ

“বাড়িতে ফিরে মোটাসোটা হৃষ্ট-পুষ্ট তিনটি উট লাভ করলে কি তোমরা খুশি হবে না? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, অবশ্যই। তিনি বললেন, নামাযে দাঁড়িয়ে তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করা হৃষ্ট-পুষ্ট তিনটি মোটা উট লাভ করার চেয়েও উত্তম”।[২]

অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে,

مَنْ حَافَظَ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ القانتين

“যে ব্যক্তি ফরয নামাযসমূহ যত্ন সহকারে আদায় করবে, সে অলসদের (الغافلين) অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যে ব্যক্তি রাত্রীকালীন নামাযে দাড়িয়ে একশত আয়াত

---

[১] ইব্ন হিব্বান, আবু হাতিম মুহাম্মদ, *সহিহ ইবনু হিব্বান*, (বৈরুত: মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হি.), খ. ২, পৃ. ৩৮৭, হাদিস নং- ৬২০।

[২] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ.১, পৃ.১, হাদিস নং- ৮০২।

তেলাওয়াত করবে তার নাম আনুগত্যশীলদের (القانتين) তালিকার্ভুক্ত হবে"।[১]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে কুরআন চর্চা করতেন

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাদি.) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কুরআন তেলাওয়াতের বাস্তব প্রতিভূ। তিনি চারজন বিশিষ্ট সাহাবি থেকে কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তারা হলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, উবাই ইব্ন কা'ব, মু'আয ইব্ন জাবাল ও আবু হুজাফা'র আযাদকৃত গোলাম সালিম। তাদের তেলাওয়াত এতো মনোমুগ্ধকর ছিল যে, স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট থেকে তেলাওয়াত শুনতেন। উবাই ইব্ন কা'ব (রাদি.) ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ করে বলেন,

إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ قَالَ آللهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ " اللهُ سَمَّاكَ لِي قَالَ فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكِي

"আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে আপনার নিকট থেকে কুরআন শুনতে আদেশ দিয়েছেন। উবাই (রাদি.) বললেন, আল্লাহ কি আমার নাম নিয়ে বলেছেন? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ এ ব্যাপারে আপনার নাম নিয়ে বলেছেন। এ কথা শুনে উবাই (রাদি.) কাঁদতে লাগলেন"।[২]

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাদি.) থেকে বর্ণিত,

قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأْ عَلَيَّ القُرْآنَ»، قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ، قَالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ

"একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কুরআন শোনাতে বললেন, আমি বললাম, কুরআন আপনার উপরই নাযিল হয়েছে। আর আপনি আমার নিকট থেকে তা শুনবেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি অন্যের নিকট থেকে তা শুনতে

---

[১] বাইহাকি, আবু বকর আহমদ ইব্ন হোসাইন ইব্ন আলি, শু'আবুল ঈমান, (রিয়াদ: মাকতাবাহ আল রুশদ: সম্পাদনা: আহমদ নাদাভি, সাহিবুদ দার আল সালাফিয়্যাহ, মুম্বাই), খ. ৩, পৃ. ৪৯২, হাদিস নং- ২০০২।

[২] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ. ১, পৃ. ৫৫০, হাদিস নং- ৭৯৯।

পছন্দ করি।”

তিনি সূরা আন নিসা পাঠ শুরু করলেন,

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾

আয়াত পর্যন্ত পৌঁছার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এবার থামো। ইব্ন মাসউদ (রাদি.) তাকিয়ে দেখলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চোখ দু'টি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে।[১]

কুরআন চর্চায় সাহাবায়ে কেরামের নীতি

আল কুরআনের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত নীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাদি.) বলেন,

كانَ الرجل مِنَّا إذا تعلَّم عَشْر آياتٍ لم يجاوزهُنّ حتى يعرف معانيهُنَّ، والعملَ بهنَّ

“সাহাবায়ে কেরাম দশটি আয়াত শেখার পর তার অর্থ অনুধাবন করে তদনুযায়ী আমল করা পর্যন্ত সামনের দিকে অগ্রসর হতেন না”।[২]

কুরআনের অর্থ অনুধাবন করার লক্ষ্যে আমর ইবনুল আসকে (রাদি.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিনের কমে আল কুরআন শেষ করতে বারণ করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাদি.) এর সূরা বাকারা শিখতে আট বছর সময় লেগেছিল। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাদি.) থেকে বর্ণিত আছে, তাঁর পিতা উমার (রাদি.) বারো বছরে সূরা বাকারা'র পাঠ সমাপ্ত করেন। এটি শেষ করে তিনি একটি উট জবাই করেন।[৩]

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাদি.) কুরআন চর্চার পদ্ধতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

لَا تَهُذُّوا الْقُرْآنَ، كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَلَا تَنْثُرُوهُ نَثْرَ الدَّقَلِ، وَقِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ، وَحَرِّكُوا

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫/২০০৪), খ. ৬, পৃ. ১৯৫।

[২] কুরতুবি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবি বকর, *আল জামি' লি আহকামিল কুরআন*, (কায়রো: দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি.), খ. ১, পৃ. ৮০।

[৩] যাহাবি, শামসুদ্দিন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, *নুযহাতুল ফুদালা তাহযিবু সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, (জিদ্দা:দারুল আন্দালুস আল খাজারা, তা/বি.), পৃ. ৩৫, খ. ১।

بِهِ الْقُلُوبَ ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة

"কবিতা আবৃত্তির মতো কুরআন তেলাওয়াত করো না। নষ্ট খেজুরের মতো এটিকে বিক্ষিপ্তভাবে ফেলে রেখো না। কুরআনের বিস্ময়কর আলোচনার সময় থামো, এটি দ্বারা অন্তরকে নাড়া দাও, সূরাটি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যেনো তোমাদের লক্ষ্য না হয়"।[১]

রমজান মাসে কুরআন চর্চা

"মানুষের হেদায়তের জন্য রমজান মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। যাতে রয়েছে হেদায়তের সুস্পষ্ঠ দলিল-প্রমাণ এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্য। (আল বাকারা:১৭৫)। সহিহ বুখারি শরিফে বর্ণিত আছে,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে বেশি দানশীল। তিনি রমজান মাসে অধিক পরিমাণে দান করতেন । যখন জিবরিল (আ.) তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রতি রাতে কুরআনের দাওর করতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন কল্যাণকর কাজে প্রবাহমান বায়ূর চেয়েও অধিক বদান্য"।[২]

ইব্‌ন রজব হাম্বলি বলেন, উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিস দ্বারা রমজান মাসে কুরআনের দরস দেয়া, দরসের জন্য সমবেত হওয়া ও কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ব্যক্তির নিকট কুরআন শোনানো মুসতাহাব প্রমাণিত হয়। তবে অর্থ না বুঝে কুরআনের নিছক তেলাওয়াতপূর্বক বারবার কুরআন খতম করা সালাফের নীতি ছিল না। এ সম্পর্কে আয়িশাকে (রাদি.) প্রশ্ন করা হলো,

إِنَّ رِجَالًا يَقْرَأُ أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، قَالَتْ: أُولَئِكَ قَرَؤُوا وَلَمْ يَقْرَؤُوا، كُنْتُ أَقُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ التَّامِّ فَيَقْرَأُ بِالْبَقَرَةِ

---

১ ইব্‌ন আবি শাইবা, আবু বকর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহিম, *মুসান্নাফ*, সম্পাদনা: ফাহিম মুহাম্মদ শালদুত, (জিদ্দা: তারিখুল মদিনা, ১৩৯৯ হি.), খ. ২, পৃ. ৫২১।

২ বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫/২০০৪), খ. ১, পৃ. ৮।

وَآلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءِ، فَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا اسْتِبْشَارٌ دَعَا، وَرَغِبَ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ دَعَا وَاسْتَعَاذَ

"রাতের বেলায় কয়েকবার আল কুরআন খতম করার ব্যাপরে আপনার মত কি? তিনি উত্তর দিলেন, তারা কুরআন তেলাওয়াত করেও করে নি। আমি রমজান মাসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে কিয়ামুল লাইল করতাম। তিনি সূরা বাকারা, আলে ইমরান ও নিসা পাঠ করতেন। যখন সুসংবাদসম্বলিত কোনো আয়াত আসতো, তিনি দু'আ করতেন এবং আগ্রহান্বিত হতেন। ভয়-ভীতিসম্বলিত কোনো আয়াত আসলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রর্থনা করতেন"।[১]

আল কুরআন একটি প্রভাব বিস্তারকারী কিতাব

আল কুরআন একটি প্রভাবশালী আসমানি কিতাব। যা ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার উপর প্রভাব বিস্তার করে। নাযিল হবার সময়কাল থেকে অদ্যাবধি এটি সমানভাবে ক্রিয়াশীল। মুমিনের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে আল কুরআন বলেন,

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ﴾

"আল্লাহ তা'য়ালা সর্বোত্তম বাণীসম্পন্ন একটি কিতাব নাযিল করেছেন। যা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ ও বারবার পঠিত। যারা আল্লাহকে ভয় করে কুরআনের প্রভাবে তাদের ত্বকের পশম খাড়া হয়ে যায় ও অন্তর নরম হয়"[২]।

অমুসলিমদের উপরও এ কুরআন সমানভাবে ক্রিয়াশীল। হাদিস ও সিরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে এ ধরনের অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। কুরআন ও রসূলের সাথে শত বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা আল কুরআনের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে নি।

মক্কার কুরাইশ নেতারা দিনের বেলায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে বিরোধিতায় মগ্ন থাকলেও রাতের বেলায় চুপিসারে তাঁর কুরআনের তেলাওয়াত শুনে নিজেদের আত্মা শীতল করতো। এ প্রসঙ্গে ইব্ন ইসহাক এর বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য।

---

[১] সিয়ূতি, জালালুদ্দিন আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর, *আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, (মিসর: আল হাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ আল আম্মাহ, ১৩৯৪ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৬০।

[২] আল কুরআন, ৩৯;২৩।

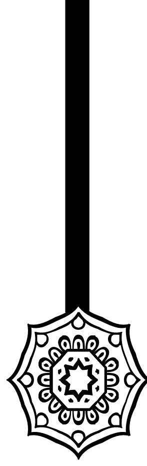
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ حُدِّثَ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَأَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَالْأَخْنَسَ بْنَ شَرِيقِ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ الثَّقَفِيِّ، حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ، خَرَجُوا لَيْلَةً لِيَسْتَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فِي بَيْتِهِ، فَأَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَجْلِسًا يَسْتَمِعُ فِيهِ، وَكُلٌّ لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِ صَاحِبِهِ، فَبَاتُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ تَفَرَّقُوا.فَجَمَعَهُمْ الطَّرِيقُ، فَتَلَاوَمُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ :لَا تَعُودُوا، فَلَوْ رَآكُمْ بَعْضُ سُفَهَائِكُمْ لَأَوْقَعْتُمْ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا، ثُمَّ انْصَرَفُوا. حَتَّى إِذَا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ، عَادَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَى مَجْلِسِهِ، فَبَاتُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ تَفَرَّقُوا، فَجَمَعَهُمْ الطَّرِيقُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مِثْلَ مَا قَالُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ انْصَرَفُوا. حَتَّى إِذَا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ أَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَجْلِسَهُ، فَبَاتُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ تَفَرَّقُوا، فَجَمَعَهُمْ الطَّرِيقُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ :لَا نَبْرَحُ حَتَّى نَتَعَاهَدَ أَلَا نَعُودَ: فَتَعَاهَدُوا عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا.فَلَمَّا أَصْبَحَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ أَخَذَ عَصَاهُ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى أَبَا سُفْيَانَ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ :أَخْبِرْنِي يَا أَبَا حَنْظَلَةَ عَنْ رَأْيِكَ فِيمَا سَمِعْتَ مِنْ مُحَمَّدٍ؟ فَقَالَ :يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ وَاَللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ أَشْيَاءَ أَعْرِفُهَا وَأَعْرِف مَا يُرَادُ بِهَا، وَسَمِعْتُ أَشْيَاءَ مَا عَرَفْتُ مَعْنَاهَا وَلَا مَا يُرَادُ بِهَا، قَالَ الْأَخْنَسُ :وَأَنَا الَّذِي حَلَفْتَ بِهِ قَالَ :ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى أَتَى أَبَا جَهْلٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ، فَقَالَ:يَا أَبَا الْحَكَمِ، مَا رَأْيُكَ فِيمَا سَمِعْتَ مِنْ مُحَمَّدٍ؟ فَقَالَ :مَاذَا سَمِعْتُ، تَنَازَعْنَا نَحْنُ وَبَنُو عَبْدِ مَنَافٍ الشَّرَفَ، أَطْعَمُوا فَأَطْعَمْنَا، وَحَمَلُوا فَحَمَلْنَا، وَأَعْطَوْا فَأَعْطَيْنَا، حَتَّى إِذَا تَجَاذَيْنَا عَلَى الرَّكْبِ، وَكُنَّا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ، قَالُوا :مِنَّا نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنْ السَّمَاءِ، فَمَتَى نُدْرِكُ مِثْلَ هَذِهِ، وَاَللهِ لَا نُؤْمِنُ بِهِ أَبَدًا وَلَا نُصَدِّقُهُ .قَالَ فَقَامَ عَنْهُ الْأَخْنَسُ وَتَرَكَهُ

"ইব্‌ন ইসহাক ইমাম যুহরি থেকে বর্ণনা করেন, আবু জাহাল, আবু সুফয়ান ও আখনাস বিন শরিক একদিন বিচ্ছিন্নভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাত্রীকালীন নামাযের তেলাওয়াত শোনার নিমিত্তে তাঁর গৃহের চারপাশে অবস্থান নেয়। সকালবেলা ফিরতি পথে কাকতালীয়ভাবে তাদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ হয়ে

যায়। এহেন গর্হিত কাজে লিপ্ত থাকার জন্য তারা একে অপরকে র্ভৎসনা করে এবং এ কাজের পুনরাবৃত্তি না করার শপথ গ্রহণপূর্বক স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। কেননা এতে তাদের অধীনস্ত অনুসারীদের মনে তাদের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হবার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। দ্বিতীয় দিনেও তারা বিচ্ছিন্নভাবে গোপনীয়তার সঙ্গে আবারো কুরআন শুনতে অবস্থান নেয় এবং সকাল বেলা পুনরায় তাদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ ঘটে যায়। তারা গত রাতের মতো আবারো ওয়াদাবদ্ধ হয়ে গৃহে ফিরে যায়। তৃতীয় দিনেও একই ঘটনা ঘটে। এবার তারা চূড়ান্ত ওয়াদা করে বাড়ির পথ ধরে। তারা পারস্পরিক আলোচনায় আল কুরআনের অলৌকিকতা ও তার অপরিসীম প্রভাবের কথা স্বীকার করে”।[১]



[১] মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, *আল সিরাতুন নাবাভিয়্যাহ*, (বৈরুত: দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৮ হি.), পৃ. ১৭০, খ. ৪।



সাধারণ মুমিনগণের উপর উলামায়ে কেরামের অধিকার

সাধারণ মুসলমানের কুৎসা রটনা ও দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ ইসলামে নিষিদ্ধ ও গর্হিত। উলামায়ে কেরাম হলেন জাতির সূর্য সন্তান ও উম্মতের বিবেক। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী তারাই আল্লাহকে অধিকতর ভয় করে। কুরআন-সুন্নাহর বিস্তারে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার কারণে তারা নবির ওয়ারিশ হবার গৌরব অর্জন করেছেন। এ মুবারক জামাতের সমালোচনা একটি জঘন্যতম মহাপাপ। এমনিতেই সাধারণ মুসলমানের গিবত করাকে আল কুরআনে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মুসলমান ভাইয়ের গিবত দুনিয়া-আখিরাতের সমূহ ক্ষতির কারণ। উলামায়ে কেরামের সমালোচনা ও তাদের গিবত করা মৃত্যুর সময় ইমান-হারা হবার মতো অশুভ পরিণাম ডেকে আনতে পারে। ইমাম ইবনু আসাকির বলেন, 'উলামায়ে কেরামের নিন্দাবাদ ও সমালোচনা খুবই বিষাক্ত'। (لُحُوم الْعلمَاء مَسْمُومَة)

ইসলামি শরি'য়তে মুমিনের মর্যাদা

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুসলমানের নিকট অপর মুসলমানের

রক্ত-মাংস, ধন-সম্পদ ও মান-ইজ্জত অতীব মর্যাদাবান বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বিদায় হজের প্রাক্কালে আরাফাতের মাঠে ঘোষণা করেন,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

"আরাফাতের দিন, জিলহজ মাস ও মক্কা নগরী যেভাবে সম্মানিত, মুসলমানের ধন-সম্পদ ও ইজ্জত সম্মানও ঠিক তেমন মর্যাদাবান"।[১]

ইসলামে একজন সাধারণ মুসলমানের ইজ্জত-সম্মান বাইতুল্লাহ'র ইজ্জতের চেয়েও অধিকতর মর্যাদাবান। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাদি.) বর্ণনা করেন।

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ: مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةً مِنْكِ، مَالُهُ وَدَمُهُ

"আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কা'বা তাওয়াফ করার সময় দেখেছি, তিনি কা'বাকে সম্বোধন করে বলছেন, "হে কা'বা! তুমি কতো পবিত্র! তোমার আলো-বাতাস কতো মনোরম! তুমি কতো মহান! তোমার সম্মান কতো মহান! মুহাম্মদ এর জীবন যার হাতে সে আল্লাহর কসম! আল্লাহর নিকট তুমি অতি সম্মানিত। তবে মুমিনের ইজ্জত আল্লাহর নিকট তোমার সম্মানের চেয়ে অধিক। তার ধন-সম্পদ ও রক্ত-মাংসও তেমন মর্যাদাবান"।[২]

যারা সদা-সর্বদা মানুষের দুর্নাম করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾

"যারা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে মানুষের নিন্দাবাদ করে তাদের জন্য দুর্ভোগ"।[৩]

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫/২০০৪), খ. ১, পৃ. ৫৫।

[২] ইবনু মাজাহ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন য়াযিদ আল কাযভিনি, *সুনানু ইব্‌ন মাযাহ*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (কায়রো: দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা/বি.), খ. ২, পৃ. ১২৯৭, হাদিস নং- ৩৯৩২।

[৩] আল কুরআন: ১০৪; ১।

উলামায়ে কেরামের মর্যাদা

ইসলামি শরি'য়তের রক্ষণাবেণের দায়িত্ব উলামায়ে কেরামের হাতে ন্যস্ত। এ সুবাদে নবি-রসূলের পর তারাই অধিকতর মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত্যের পর উলামায়ে কেরামের অনুগত্যের বিষয়ে আল কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

"তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও উলামায়ে কেরামের অনুগত্য করো"।[১]

একত্ববাদ ও সত্যের সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের সাথে উলামায়ে কেরামকে সংযুক্ত করে স্বয়ং রব্বুল আলামিন বলেন,

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾

"আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আর আহলে ইলমগণ ন্যায়বিচারের উপর অধিষ্ঠিত"।[২]

যারা উলামায়ে কেরামের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়, ইসলামি শরি'য়তে তারা এ উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّه

"যারা বড়দের সমীহ করে না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং উলামায়ে কেরামের ইজ্জত করে না, তারা আমার দলভুক্ত নয়"।[৩]

যারা আল্লাহর অলিদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'য়ালা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন মর্মে হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আছে। আল্লাহর বন্ধু ও অলি হবার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের চেয়ে কেউ বেশি হকদার হতে পারে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

---

[১] আল কুরআন: ৪; ৫৯।

[২] আল কুরআন: ৩; ১৮।

[৩] তাবরানি, আবুল কাসিম সোলাইমান ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আইয়ুব, *মাকারিমুল আখলাক*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৯ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৬৭, হাদিস নং- ১৪৭।

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

"যারা আমার অলি'র সাঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে, তাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করলাম"।[১]

মুসলমানদের শেষ রাতে নামাযের জন্য জাগ্রত করার কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোরগের তিরস্কার করতে নিষেধ করেছেন। আর যে সকল উলামায়ে কেরাম দীনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে সার্বক্ষণিক মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানায়, তাদের সমালোচনার কী পরিণতি হতে পারে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا تَسُبُّوا الدِّيْك فإنه يُوْقِظ للصلاة

"তোমরা মোরগকে গালমন্দ করো না। কেননা মোরগ মানুষকে নামাযের জন্য জাগ্রত করে"।[২]

উলামায়ে কেরামের মান-মর্যাদা প্রসঙ্গে হাসান বাসরি বলেন,

الدُّنْيَا كُلُّهَا ظُلْمَةٌ إِلا مَجَالِسَ الْعُلَمَاءِ

"আলিমদের মজলিস ব্যতীত সমগ্র পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন"।[৩]

ইমাম তাহাভি বলেন,

وعُلماء السَّلف من السابقين، ومَنْ بَعْدَهُم من التَّابعين-أَهْلِ الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر- لا يُذْكَرُون إلا بالجميل، ومَنْ ذَكَرَهم بسوء، فهو على غَيْرِ السَّبِيلِ

"পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম, তাদের অনুসারীগণ, উম্মতের চিন্তাশীল ও কল্যাণকামী সকল ফকিহ উলামায়ে কেরামকে সুন্দর অভিধায় স্মরণ করেছেন। যারা তাদেরকে

---

১ বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশঃ মুয়াসসসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫/২০০৪), খ. ৮, পৃ. ১০৫।

২ আবু দাউদ, সুলায়মান ইব্‌ন আশ'আস আল সাজিসতানি, *সুনানু আবি দাউদ*, (বৈরুতঃ মাকতাবাহ আল আসরিয়্যাহ, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, তা/বি.),খ. ৪, পৃ. ৩২৭।

৩ কুরতুবি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আবি বকর, *জামি'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, (সউদি আরবঃ দারু ইবনিল জাউযি, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ.২৩৬।

মন্দ বিশেষণে আলোচনা করে তারা বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট”।[১]

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল থেকে বর্ণিত,

لُحُوم الْعلمَاء مَسْمُومَة فَمن شمها مرض وَمن اكلها مَاتَ

“উলামায়ে কেরামের দুর্নাম ও নিন্দাবাদ খুবই বিষাক্ত। যে এ বিষের ঘ্রাণ নেবে সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে, আর যে এ বিষ ভক্ষণ করবে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী”।[২]

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন,

مَن استخفَّ بالعلماء ذهبَت آخرتُه، ومَن استخفَّ بالأمراء ذهبَت دنياه، ومَن استخفَّ بالإخوان ذهبَت مروءتُه

“যারা উলামায়ে কেরামকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে তাদের আখিরাত নষ্ট হয়ে যাবে, যারা রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের তিরস্কার করবে তাদের দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যারা নিজ ভ্রাতৃবর্গের নিন্দাবাদ করবে তাদের মানবিকতায় ধস নামবে”।[৩]

ইমাম আহমদ বিন আযরা'য়ি বলেন,

الْوَقِيْعَةُ فِيْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا سَيِّمَا اَكَابِرُهُمْ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوْبِ

“আহলে ইলমদের গিবত করা বিশেষত এই উম্মতের অগ্রবর্তী উলামায়ে কেরামের কুৎসা রটনা করা কবিরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত”।[৪]

উলামায়ে কেরামের কুৎসা রটনাকারীদের শাস্তি

উলামায়ে কেরাম নবি'র উত্তরসূরী ও শরি'য়তের হেফাজতকারী। তাদের অপমান ও অসম্মান করা নবি-রসূলদের অসম্মান করার সমতুল্য। তাদের সঙ্গে বেয়াদবির পরিণাম অশুভ ও ভয়াবহ। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল বর্ণনা করেন, রসূল

---

[১] তাহাভি, আবু জা'ফর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা, *আল আকিদাতুত তাহাভিয়্যাহ*, (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামি, টীকা: নাসিরুদ্দিন আলবানি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), খ. ২, পৃ. ৭৪০।
[২] আবদুল বাসিত আল দিমাশকি, শরহু আল মুঈদ ফি আদাবিল মুফিদ ওয়াল মুসতাফিদ,
[৩] যাহাবি, শামসুদ্দিন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, (কায়রো: দারুল হাদিস, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৭ হি.), খ. ৪, পৃ. ৪০৭।
[৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ, *আল রাদ্দুল ওয়াফির*, (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৩ হি.), পৃ. ১৯৭।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

خِيارُ عِبادِ اللهِ الَّذِينَ إذا رُؤُوا ذُكِرَ اللهُ، وشِرارُ عِبادِ اللهِ المَشّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ، المُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأحِبَّةِ، الباغُونَ البُرَآءَ العَنَتَ

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। সর্বনিকৃষ্ট বান্দা হলো, যারা চোগলখোরি করে, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে এবং নেককার লোকদের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে। অন্য বর্ণনা মতে- এ দুষ্ট-চক্রটি পুত-পবিত্র সম্ভ্রান্ত লোকদের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে"।[১]

দরসে নেজামি'র প্রবক্তা নেজামুল মুল্ক তুসি তালিবে ইলমদের ভাতা প্রদানের জন্য বাদশাহর নিকট একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। বাদশাহ তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। মন্ত্রী নেজামুল মুল্ক একটিমাত্র বাক্যে বাদশাহকে এমন জবাব দেন, যাতে বাদশাহর চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং এক কথায় তিনি কুপোকাত হয়ে যান।

أَقَمْتُ لك جُنْدًا لا تُرَدُّ سِهامُهم بالأَسْحار فاستَصْوَبَ فعلَه، وساعدَه عليه

"আমি এ পরিকল্পনার মাধ্যমে আপনার পক্ষে এমন একটি বাহিনী প্রস্তুত করতে চাই, যাদের শেষ রাত্রীর তীরসমূহকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না। বাদশাহ মন্ত্রীর এ পরিকল্পনা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ও সঠিক সিদ্ধান্ত বলে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।[২]

মুখাল্লাদ বর্ণনা করেন, আমার এক বন্ধু বলেন, হাসান ইব্ন যাকওয়ান এর নিকট একজন আলিম এর কটূক্তি করা হলে উত্তরে তিনি বলেন,

مَهْ! لَا تُذَكِّرِ الْعُلَمَاءَ بِشَيْءٍ، فَيُمِيْتُ اللهُ قَلْبَكَ

"থামো! আলিমদের মন্দভাবে উপস্থাপন করো না। এর পরিণতিতে আল্লাহ তোমার অন্তরের মৃত্যু ঘটাতে পারেন"।

---

[১] আহমদ, আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদ*, (রিয়াদ: মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, ১৪২১ হি./ ২০০১ খ্রি.),খ.৬, পৃ.১৭১।

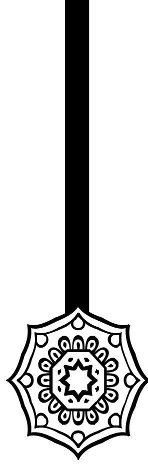
[২] আলি ইব্ন ইবরাহিম, *তুহফাতুত তালিবিন*, (জর্দান: আল দার আল আসরিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৭ হি.), পৃ. ১১৫।

উলামায়ে কেরামের সমালোচনাকারীদের মৃত্যুকালীন পরিণাম

শাফি'ই মাযহাবের বিশিষ্ট ফকিহ কাযি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল যাবিদি। যিনি ৭১০ হি. জন্মগ্রহণ করে দরস ও ফতোয়া প্রদানে সু-খ্যাতি অর্জন করেন। যার ফলে ইয়েমেনে তার শিষ্যের বিশাল একটি জামাত তৈরি হয়। তিনি চব্বিশ খণ্ডে 'আল তানবিহ' এর ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জামাল মিসরি বর্ণনা করেন, মৃত্যুর সময় মুখ থেকে তার জিহ্বা বের হয়ে ঝুলে পড়ে এবং কালো বর্ণ ধারণ করে। মানুষের ধারণা হলো, শাইখ মুহিউদ্দিন নাবাভি'র কূটসা রটনার কারণে তার এই পরিণতি হয়েছিলো।[১]



[১] আসকালানি, আহমদ ইব্‌ন আলি ইব্‌ন মুহাম্মদ, ইব্‌ন হাজার, *আল দুরার আল কামিনাহ*, (হায়দারাবাদ: মজলিসু দায়িরাতুল মা'আরিফ আল উসমানিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯২ হি.), খ. ৪, পৃ. ১০৬।



ইসলামি আইনে জনকল্যাণের অধিকার

কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা-কিয়াস ইসলামি শরি'য়তের মূল উৎস। এই উৎসমূলের পাশাপাশি শরি'য়তের এমন কয়েকটি দলিল রয়েছে, যার ভিত্তিতে ফকিহ-মুজতাহিদগণ শরি'য়তের অনেক বিধান উদ্ভাবন করছেন। মাসালিহ মুরসালাহ (مصالح مرسله) বা জনকল্যাণ বিবেচনা ইসলামি আইন প্রণয়নে প্রভাবক ভূমিকা পালন করে। আরবি 'মাসলাহা' শব্দের বহুবচন হলো মাসালিহ। অর্থাৎ মঙ্গল, কল্যাণ ও স্বার্থ ইত্যাদি। মুরসালাহ অর্থ মুতলাক, তথা মুক্ত বা সাধারণ। ব্যবহারিক দিক থেকে এই যৌগিক শব্দটি জনকল্যাণ, গোষ্ঠীস্বার্থ ও কল্যাণচিন্তা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১] مصالح مرسله বলতে এমন কল্যাণকে বুঝায়, যে বিষয়ে শরি'য়তপ্রণেতার পক্ষ থেকে কোনো অকাট্য ও স্পষ্ট দলিল নেই, অথবা এটির এমন কোনো মূল ভিত্তিও নেই, যার উপর নির্ভর করে কিয়াস করা যায়। তবে তা গ্রহণে মুসলিম উম্মাহ'র ক্ষতির কোনো আশঙ্কা থাকে না; বরং বহুবিধ

---

[১] খন্দকার মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ, *মাকাসিদ আশ্ শরী'আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য*, (ঢাকা: মুক্তদেশ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৪৮।

কল্যাণের নিশ্চয়তা থাকে। ফিক্‌হবিদগণ এমন কল্যাণ (مصالح) গ্রহণের পক্ষে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে শর্ত হলো, তা অকাট্য ও স্পষ্ট দলিলের বিরোধী হতে পারবে না এবং ইজমা'রও পরিপন্থি হবে না।

মুহাম্মদ আমিন শানকিতি (১৯০৫-১৯৭৪ খ্রি.) বলেন, জনকল্যাণের উপর ইসলামি শরি'য়তের অনেক বিধি-বিধান নির্ভরশীল। তিনি এটিকে তিনভাগে ভাগ করেন,

الأولى منها: ردء المفاسد، وهي المعروف عند الأصوليين بالضروريات والثانية: جلب المصالح وهو المعروف عند الأصوليين بالحاجيات والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق، وأحسن العادات، وهو المعروف عند الأصوليين بالتحسينيات، والتتميميات

১.জনসমস্যা লাঘব করা। এটিকে উসূল শাস্ত্রবিদগণ (ضروريات) জরুরিয়াত বলে অভিহিত করেন।

২.প্রয়োজন সাধন করা। উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে যা (حاجيات) হাজিয়াত নামে পরিচিত।

৩.শোভাবর্ধক ও সম্পূরক সামাজিক রীতি-নীতির অনুসরণ। যাকে উসূলে ফিকহ এর পরিভাষায় (تحسينيات وتتميميات) তাহসিনিয়াত ও তাতমিমিয়াত বলা হয়।[১]

ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়া 'মাসালিহ মুরসালাহ'র সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন,

"মুজতাহিদগণ যদি মনে করেন, কোনো কাজের মধ্যে প্রাধান্যযোগ্য ও অগ্রাধিকারমূলক কল্যাণ নিহিত আছে এবং শরি'য়তে উক্ত কাজের পরিপন্থি কোনো নির্দেশনা বিদ্যমান না থাকে, তাকে মাসালিহ মুরসালাহ বা জনকল্যাণ বলে"।[২]

[১] শানকিতি, মুহাম্মদ আমিন ইব্‌ন মুহাম্মদ আল মুখতার, *আল মাসালিহ আল মুরসালাহ*, (মদিনা মুনাওয়ারা: জামিয়া ইসলামিয়া, ১৪১০ হি.). পৃ. ৬।

[২] ইব্‌ন তাইমিয়া, *মাজমুয়াতুর রাসায়িল ওয়াল মাসায়িল*, (কায়রো: লাজনাতুত তুরাসিল আরবি ,তা/বি), খ. ৩, পৃ. ২২।

মুজতাহিদ ইমামগণ জনকল্যাণ বিবেচনার জন্য যে শর্তাবলি নির্ধারণ করেছেন তা হলো,

১. শরি'য়ত অনুমোদিত জনকল্যাণের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।

২. জনস্বার্থের নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অনিশ্চিত কল্যাণের সম্ভাবনায় এ বিবেচনা কার্যকর হবে না।

৩. দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণ বিবেচনায় রাখতে হবে।

ইসলামি আইন প্রণয়নে জনকল্যাণের প্রভাব সম্পর্কে ইমাম শাতিবি (৫৩৮-৫৮৯ হি.) এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

الشريعة مبنية على اعتبار المصالح وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك لا من حيث إدراك المكلف إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه و سلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله.

"মানব কল্যাণের উপরই শরি'য়তের ভিত্তি। শরি'য়তপ্রণেতার নির্ধারিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের উপর এটি নির্ভরশীল। মানুষের বোধ-জ্ঞানের উপর নয়। স্থান-কাল-পাত্রের ভিন্নতার কারণে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও বৈচিত্র্যময় হয়। অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণিত, মানব কল্যাণের তিনটি স্তর রয়েছে। এ সকল স্তরে উন্নীত হবার পর মানব-বিবেক শরি'য়তপ্রণেতার প্রতিটি অধ্যায়ের সকল শাখা-মাসআলার মূল উদ্দেশ্য বোঝার যোগ্যতা অর্জন করে। শিক্ষা, প্রজ্ঞা ও ফতোয়ায় নবির প্রতিনিধির স্থলে অভিষিক্ত হবার সুবাদে মানুষ এ গুণ অর্জন করে। এ যোগ্যতা একমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত"।[১]

রসুলুল্লাহ'র যুগে জনকল্যাণের ভিত্তিতে শরি'য়তের বিধান উদ্ভাবনের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাদি.) বর্ণনা করেন,

---

[১] শাতিবি, ইবরাহিম ইব্ন মুসা ইব্ন মুহাম্মদ, *আল মুয়াফাকাত*, সম্পাদনা: আবু উবাইদা মাশহুর, (কায়রো: দারু ইব্ন আফ্ফান, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১০৬।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা মক্কায় সকল প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ করেছেন। আমার পূর্বে কারো জন্য এখানে যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না। পরেও কারো জন্য জায়েয হবে না। কিন্তু একটি দিনের নির্দিষ্ট সময়ে তা আমার জন্য হালাল করা হয়েছিল। সুতরাং এখানকার ঘাস ও গাছ-পালা কর্তন করা যাবে না। শিকারী জন্তুকে ভয় দেখানো যাবে না। মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো পতিত বস্তু কুড়িয়ে নেয়া যাবে না। এ হাদিস শোনার পর আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাদি.) বলেন, কিন্তু 'ইযখার' নামক ঘাস কাটার অনুমতি দিলে জনস্বার্থ প্রাধান্য পেতো। কারণ এ ঘাস আমাদের বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি এবং লাশ সমাহিত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তা কাটার অনুমতি দেয়া গেলো"।[১]

এখানে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাদি.) নিষিদ্ধ উদ্ভিদসমূহের মধ্যে 'ইযখার' নামক নির্দিষ্ট উদ্ভিদ কর্তনকে জনকল্যাণের ভিত্তিতে বাদ দেয়ার আবেদন করেন। যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমর্থন করেন। কারণ এ উদ্ভিদ সাধারণ মানুষের কাজে ব্যবহৃত হয়।

ইমাম ইব্ন তাইমিয়া আরো বলেন, ইসলামি শ'য়িতের মূল ভিত্তি হলো, মানবতার কল্যাণ সাধন করা ও জনদুর্ভোগ লাঘব করা। সুতরাং আল্লাহর বিধি-নিষেধের আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে মানবতার সামগ্রিক কল্যাণ। শরি'য়তের নির্দেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়াই মানব জীবনের দুর্বিষহ ক্ষতির প্রধান কারণ। দু'টি কল্যাণকর অথবা দু'টি ক্ষতিকর বিষয়ের মুখোমুখী হলে মুমিনদের প্রতি ইসলামি শরি'য়তের বিধান হলো, উভয়টির মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব হওয়া সাপেক্ষে কম ক্ষতিকর ও অধিক কল্যাণকর বিষয়টি গ্রহণ করা। একসঙ্গে দু'টি ক্ষতির প্রতিরোধ সম্ভব না হলে তুলনামূলক কম হিতকর ও অধিক ক্ষতিকর বিষয়টি বর্জন করা। ইসলামি শরি'য়তে এমন ব্যক্তিদের মান্যবর,

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৯২, হাদিস নং- ১৩৪৯।

নির্ভরযোগ্য ও নেতৃস্থানীয় মনে করা হয়, যারা দু'টি কল্যাণের মধ্যে অধিক কল্যাণকর এবং দু'টি মন্দের মধ্যে অধিকতর ক্ষতিকর বস্তুর পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। এমন যোগ্যতাসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম প্রতিভার অধিকারী মহামনীষীগণ ইসলামি শরি'য়তে ফকিহ-মুজতাহিদ হিসেবে খ্যাত। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন। পাপাচারী খলিফার আনুগত্য করা ও বেদা'তপন্থি-ফাসেক ইমামের পেছনে নামায আদায় করা একটি মন্দ কাজ। পাপিষ্ঠ খলিফার বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিরোধ-সংগ্রামে অংশগ্রহণ না করা এবং অনুপযুক্ত ইমামের পেছনে নামায আদায় না করে জামাত বর্জন কারও ইসলামের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর ও নিন্দনীয় কাজ। এমতাবস্থায় পাপাচারী খলিফার আনুগত্য সহ্য করা ও বেদা'তপন্থি ইমামের পেছনে জামাত বর্জন না করে জামাতে শরিক হওয়াই ইসলামের নির্দেশনা। সুতরাং দু'টি ক্ষতিকর কাজের মধ্যে তুলনামূলক অধিকতর ক্ষতিকর কাজকে বর্জন করে কম ক্ষতিকর বিষয়টি গ্রহণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে বুদ্ধিমত্তার কাজ। রসূলুল্লাহ'র মর্যাদাবান ও জলিলুল কদর সাহাবায়ে কেরাম জনকল্যাণের ভিত্তিতে ও মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে জালেম গভর্নর হাজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফ[১] ও মুখতার সাকাফির[২] পেছনে নামায আদায় করেছেন এবং তাদের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছেন।

জালেম শাসক হাজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফ এর বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রসঙ্গে হাসান বসরি' (রহ.) এর অভিমতটির পর্যালোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বাসারা'র প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ

---

[১] রক্তপিপাসু ও অত্যাচারী শাসক হাজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফ ৪০ হিজরিতে তায়েফে জন্মগ্রহণ করে। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক এর শাসনামলে সে সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব লাভ করে। বিভিন্ন অভিযানে তার নেতৃত্বে প্রায় এক লাখ মানুষ মারা যায়। তার হাতে তিনজন সাহাবি শাহাদতবরণ করেন। সে খলিফা আবদুল মালিক এর নির্দেশে বিশিষ্ট সাহাবি আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরকে (রাদি.) প্রতিহত করার জন্য দীর্ঘ সাতমাস পর্যন্ত মক্কা অবরোধ করে রাখে। বাইতুল্লাহ'র বিপুল ক্ষতি সাধন করে এবং আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরকে (রাদি.) ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে। জীবনের শেষ পর্যায়ে সে প্রখ্যাত সাহাবি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহকেও হত্যা করে। এর পর সে পাগল হয়ে যায়। পেটে পোকার উৎপাতের কারণে সে মর্মান্তিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া খ.১০, পৃ.১৬৩)।

[২] মুখতার সাকাফি ৬৮৭ খ্রি. হেজাযের অন্তর্গত তায়েফ নগরীতে জন্মগ্রহণ করে। সে অত্যন্ত ধূর্ত, প্রতারক ও প্রবঞ্চক পরিচয়ে নিজের কর্মজীবন শুরু করে। উমাইয়াবিরোধী আন্দোলনে প্রথমে সে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাদি.) এর পক্ষাবলম্বন করে। কূফায় গিয়েও সে বিভিন্ন প্রতারণার আশ্রয় নেয়। সে আবদুল্লাহ ইব্ন মুতিকে অপসারণ করে কূফার ক্ষমতা দখল করে। একপর্যায়ে সে নুবুওয়াতের মিথ্যা দবিও করে। এরপর থেকে সে কায্যাব তথা মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচয় লাভ করে। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাদি.) স্বীয় ভ্রাতা মুসআব ইব্ন যুবাইরকে মুখতার সাকাফির মোকাবেলায় প্রেরণ করেন। অভিযানের এক পর্যায়ে সে মুসআব ইব্ন যুবাইর এর হাতে পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর পর তার অনুসারীগণ শিয়া আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কায়সানিয়া নামে পরিচয় লাভ করে।

ও অগ্রস্থানীয় তাবি'ই হাসান বসরি (রহ.) এর দরবারে হাজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফ এর জুলুমের প্রতিকার বিষয়ে তৎকালীন যুগের উলামায়ে কেরামের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তারা মুসলিম উম্মাহ'র স্বাসবুদ্ধকর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বলেন, জালেম গভর্নর হাজ্জাজ নিরীহ জনগণের উপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে জব্দ করছে ও নামায পরিত্যাগ করছে। এ ধরনের অপকর্ম প্রতিকারে আপনার মতামত কি? উত্তরে তিনি বলেন,

'আমি তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকারে যাওয়া ভালো মনে করি না। কেননা যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের উপর কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হয়ে থাকে, তবে তোমরা তরবারির মাধ্যমে তা প্রতিহত করতে পারবে না। আর যদি হাজ্জাজ কোনো বিপদ হিসেবে আপতিত হয়, তবে উত্তম বিচারকের ফায়সালা পর্যন্ত অপেক্ষা করো' (فاصبر حتي يحكم الله بيننا و هو خير الحاكمين)

ফতোয়া তলবকারীগণ তার কথা অগ্রাহ্য করে হাজ্জাজ এর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়। যার তিক্ত অভিজ্ঞতা ও অযাচিত ফলাফল ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত। হাজ্জাজ এর কর্মকাণ্ড এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, শরি'য়তের বিধান অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা সকল মুসলমানের জন্য জরুরি ছিল। মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে,

> من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
>
> "তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখলে, সর্বশক্তি দিয়ে তা পরিবর্তনের চেষ্টা করবে। শক্তিপ্রয়োগে সক্ষম না হলে মুখে প্রতিবাদ করবে। অপারগতায় অন্তরে হলেও প্রতিরোধের চেষ্টা করবে। এটি দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।"[১]

হাজ্জাজ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সম্ভাব্য ফলাফল বিবেচনা করে হাসান বসরি চিন্তা করেন, তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সাধারণ মানুষের যে পরিমাণ ক্ষতি অপেক্ষা করছে, তা হবে ভয়াবহ বিপর্যয় ও অকল্পনীয় দুর্ভোগ। তিনি উপর্যুক্ত হাদিসকে সাধারণ অর্থে প্রয়োগ করার পরিবর্তে সর্বসাধারণের

---

[১] মুসলিম, আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ. ১ পৃ. ৬৯।

কল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে প্রয়োগ করতে ইজতিহাদ করেন। তার ইজতিহাদের মূলনীতি ছিল এই, হাজ্জাজ এর বিরুদ্ধে জিহাদ করার মূল লক্ষ্য হলো, সর্বসাধারণের শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা। যা হাজ্জাজ এর কারণে বিঘ্নিত হয়েছিল। হাজ্জাজ এর বিরুদ্ধে প্রতিকার কর্মসূচিতে লিপ্ত হলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ও মহা ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হবার প্রবল আশঙ্কা ছিল। যাতে সুফলের চেয়ে ক্ষতির পাল্লাই ভারি হবে। যার কারণে তিনি হাজ্জাজ এর বিরুদ্ধে জিহাদ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন নি। তিনি জালেম শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ করা জায়েয হবার জন্য এ শর্ত আরোপ করেন যে, জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত সুফল বর্তমান অবস্থার চেয়ে প্রবল হবার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। যদি জিহাদের কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পায়, তবে প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

তেমনিভাবে আবু সুফ্য়ানপুত্র য়াযিদ এর বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইন (রাদি.) এর প্রতিরোধ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ থেকে সিংহভাগ সাহাবায়ে কেরাম বিরত থেকেছেন। বরং আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেই তাঁকে কূফায় না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। অথচ তৎকালীন সময়ে আবদুল্লাহ ইব্ন উমারসহ (রাদি.) অনেক জলিলুল কদর ও মর্যাদাবান সাহাবি জীবিত ছিলেন। তাদের কেউ য়াযিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কর্মসূচির অনুমতি প্রদান করেননি। তারা মুসলিম উম্মাহ'র বৃহত্তর স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে য়াযিদ এর মতো পাপিষ্ঠ ব্যক্তির খেলাফত মেনে নিয়েছেন এবং তার সকল অপকর্ম সহ্য করেছেন। এখানে সাহাবায়ে কেরামের প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল, জনকল্যাণ ও বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা। য়াযিদ এর প্রতিরোধে যে সুফল ও কল্যণের আশা ছিল, তার চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কা ছিল ঢের বেশি। যে বাস্তবতার জ্বলন্ত স্বাক্ষী হলো ইতিহাসের ধারা ও নবি-প্রেমিকদের অশ্রুধারা। য়াযিদবিরোধী প্রতিকার কর্মসূচিতে আহলে বাইতের বিপুলসংখ্যক সদস্যের শাহাদতের কারণে মুসলিম উম্মাহ'র যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তা পূরণ করা কিয়ামত পর্যন্তও সম্ভব হবে না।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় জনকল্যাণের ভিত্তিতে মহৎ কর্ম বর্জন করার অনেক নজির রয়েছে। ইবরাহিম (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মূল কাঠামোর উপর বাইতুল্লাহর পুনঃনির্মাণের বিষয়টি জনকল্যাণের ভিত্তিতে বর্জন করেছিলেন স্বয়ং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আয়িশাকে (রাদি.) উদ্দেশ করে বলেন,

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألم تر أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم» قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت

"কা'বা নির্মাণের প্রাক্কালে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ বাজেট সঙ্কটে ভুগছিল। যার ফলে তারা বাইতুল্লাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ হাতিমকে (حطيم) বাইরে রেখে কা'বাঘর নির্মাণ করেছিল। আয়িশা (রাদি.) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি বাইতুল্লাহকে ইবরাহিম (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পূর্ব-কাঠামোর ভিত্তিতে পুনঃনির্মাণ করতে চান? রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মক্কাবাসীগণ সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। এমন না হলে আমি অবশ্যই ইবরাহিম (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মূল কাঠামোর উপর বাইতুল্লাহর পুণঃনির্মাণের কাজটি সম্পন্ন করতাম।"[১]

ইবরাহিম (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মূল কাঠামোর ভিত্তিতে বাইতুল্লাহর পুনঃনির্মাণ মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি কল্যাণকর মহৎকর্ম। কিন্তু এর ফলে ইসলামে নবদীক্ষিত মক্কার অধিবাসীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ভুল ধারণা সৃষ্টির প্রবল আশঙ্কা ছিল। বাইতুল্লাহর প্রতিবেশী মুসলমানদের একটি প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীর বিরূপ ধারণার অপনোধন বাইতুল্লাহর পুনঃনির্মাণের মতো মহৎ কাজের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার ফলে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম উম্মাহ'র বৃহত্তর স্বার্থকে প্রধান্য দিয়ে তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এড়িয়ে গেছেন। ইমাম নববি বলেন, বিপরীতধর্মী একাধিক মহৎকর্মের সমাবেশ হলে অথবা দু'টি ক্ষতিকর ও লাভজনক বিষয় একত্রিত হওয়ার পর উভয়ের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব না হলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। আয়িশা (রাদি.) বর্ণিত উপর্যুক্ত হাদিস থেকে ইসলামি শরি'য়তের আইন প্রণয়নের অনেক মূলনীতি পাওয়া যায়। ইমাম নববির উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।[২]

وفي هذا الحديث: دليل لقواعد من الأحكام، منها: إذا تعارضت المصالح، أو تعارضت

---

[১] মুসলিম, আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরি, *সহিহ মুসলিম*, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, তা/বি.), খ. ২.পৃ.৯ ৬৯, হাদিস নং-৩৯৯।

[২] নববি, আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দিন য়াহয়া ইব্ন শরফ, *আল মিনহাজ শারহু সহিহ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, (বৈরুত: দারু ইহয়া আল তুরাসিল আরবি, ১৩৯২ হি.), খ. ৯. পৃ. ৪৯।

مصلحة ومفسدة، وتَعَذَّر الجمع بين فِعْل المصلحة وترك المفسدة بُدِئ بالأهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردَّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم - عليه السلام مصلحة، ولكن تُعارضه مفسدة أعظم منه، وهي: خوف فتنة بعض مَنْ أسلم قريبًا، وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيمًا، فتَرَكها صلى الله عليه وسلم

স্মর্তব্য যে, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাদি.) মক্কার মুসলমানদের খলিফা হওয়ার সুবাদে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং ইবরাহিম (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর ভিত্তিতে বাইতুল্লাহর পুনঃনির্মাণ করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাদি.) এর শাহাদতের পর উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান যখন মক্কার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন, পুনরায় বাইতুল্লাহকে পূর্বের কাঠামোতে ফিরিয়ে নেন। পরবর্তীতে আব্বাসি খলিফা মাহদি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আকাঙ্ক্ষার আলোকে কা'বার পুনঃনির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন সময়ে মদিনার প্রধান ফকিহ মালিক ইব্ন আনাস (রহ.) এর নিকট এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। ইমাম মালিক খলিফার এই উদ্যোগে সমর্থন দেননি। যার ফলে বাইতুল্লাহর কাঠামো কুরআইশনেতাদের নির্মিত ভিত্তির উপর অদ্যাবধি বহাল রয়েছে এবং হাতিম (حطيم) কা'বার বাইরেই থেকে যায়। ইমাম ইব্ন কাসির ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন,

وقد هم ابن المنصور المهدي أَنْ يُعِيدَهَا عَلَى مَا بَنَاهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَاسْتَشَارَ الْإِمَامَ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ فِي ذَلِكَ، فقال: إِنِّي أكره أن يتخذها الملوك لعبة، يَعْنِي يَتَلَاعَبُونَ فِي بِنَائِهَا بِحَسْبِ آرَائِهِمْ فَهَذَا يَرَى رَأْيَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَهَذَا يَرَى رَأْيَ عبد الملك بن مروان، وهذا يرى رأياً آخر

"ইমাম মালিক বলেন, আল্লাহর ঘরকে নিয়ে রাজা-বাদশাহগণ চিনিমিনি খেলবে তা আমি সাপোর্ট করতে পারি না। কেউ ইব্ন যুবাইর এর দোহাই দিয়ে, কেউ আবদুল মালিক এর মতামত নিয়ে, কেউ অন্য যুক্তি উপস্থাপন করে কা'বাকে

খেলনায় পরিণত করবে এটা হতে পারে না"।[১]

ইতোপূর্বে বাদশাহ হারুনুর রশিদও ইমাম মালিকের নিকট একই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। যাতে তিনি হাজ্জাজ কর্তৃক নির্মিত বাইতুল্লাহকে ভেঙ্গে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রাদি.) এর আদলে পুনঃনির্মাণ করার অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। বাদশাহকে ইমাম মালিক যে লোমহর্ষক জবাব দিয়েছিলেন তা ইব্‌ন বাত্তাল (মৃ.৪৪৯ হি.) এর ভাষায় এভাবে ব্যক্ত হয়েছে,

وقد روى أن هارون الرشيد ذكر لمالك بن أنس أنه يريد هدم ما بناه الحجاج من الكعبة، وأن يرده إلى بنيان ابن الزبير، فقال له: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناه، فتذهب هيبته من صدور الناس

"হে আমিরুল মুমিনিন! আমি আপনাকে কসম দিয়ে বলছি, এই ঘরকে রাজা-বাদশাহদের খেলনায় পরিণত করবেন না। ভাঙ্গা-গড়ার মারপ্যাচে পতিত হলে ক্রমান্বয়ে মানুষের অন্তর থেকে এটির মহিমা বিলুপ্ত হয়ে যাবে"।[২]

একটি মহৎ কর্মে মুজতাহিদ ইমামগণের সমর্থন না দেয়ার পেছনেও জনকল্যাণকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কারণ বাইতুল্লাহর মতো মহিমান্বিত একটি স্থাপনার ভাঙ্গা-গড়ার এই ধারা অব্যাহত থাকলে মুসলমানদের অন্তরে বিরাজমান বাইতুল্লাহর মর্যাদা ও মহিমা নষ্ট হয়ে যাবে। এতে মুসলিম উম্মাহর উন্নতি ও কল্যাণের পরিবর্তে দুর্ভোগ ও ক্ষতির মাত্রাই বর্ধিত হবে।

জনকল্যাণ ও মুসলিম উম্মাহ'র স্বার্থ বিবেচনায় সাহাবায়ে কেরাম যে সকল যুগান্তকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদাহরণ হলো, কুরআন সংকলন, খেলাফতের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন বিভাগের প্রবর্তন, জেলখানা স্থাপন, জুমুআ'র নামাযের জন্য প্রথম আযান প্রবর্তন, মসজিদে নবভিতে মুসল্লি সংকুলানের নিমিত্তে সন্নিহিত

---

[১] ইব্‌ন কাসির, আবুল ফিদা ইসমাইল ইব্‌ন উমার, *আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া*, (কায়রো: দারুল ফিকর, ১৪০৭ হি./ ১৯৮৬ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ২৭৫।

[২] ইব্‌ন বাত্তাল, আবুল হাসান আলি ইব্‌ন খালাফ ইব্‌ন আবদুল মালিক, *শারহু সহিহ আল বুখারি লি-ইব্‌ন বাত্তাল*, তাহকিক: আবু তামিম য়াসির ইব্‌ন ইবরাহিম, (রিয়াদ: মাকতাবাহ আল রুশদ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৬৪।

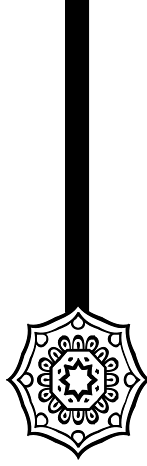
ভূমির অধিগ্রহণ ইত্যাদি।

শরি'য়তের উপর্যুক্ত বিধানসমূহ উদ্ভাবনে সাহাবায়ে কেরামের সামনে কুরআন-সুন্না'হর কোনো নস উপস্থিত ছিল না। নিছক জনস্বার্থ বিবেচনায় উপর্যুক্ত আইনসমূহ প্রণয়ন করেন। অতএব নির্দ্বিধায় বলা যায়, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে জনস্বার্থ বিবেচনায় আইন প্রণয়নের বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১]

মানবকল্যাণই ইসলামি শরি'য়তের প্রতিপাদ্য। জনকল্যাণ সাধন ও জনদুর্ভোগ লাঘব মৌলিক মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। মুজতাহিদ ইমামগণ শরি'য়তের মূল উৎসে গভীর তত্ত্বানুসন্ধান করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিশ্ব মানবতার কল্যাণ সাধনই হলো শরি'য়তের প্রধান লক্ষ্য। কুরআন-সুন্নাহ'র বিভিন্ন স্থানে শরি'য়তের এ লক্ষ-উদ্দেশ্য বিঘোষিত হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ করে বলেন, وما أرسلناك الا رحمة للعا لمين 'আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি'।[২]



[১] সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি আইন ও আইন বিজ্ঞান*, (ঢাকা: ই.ফা.বা, ২০১১ খ্রি.), প. ১৪৩।
[২] আল কুরআন, ২১; ১০৭।



ইসলামি শরিয়তে এক ব্যক্তির অনধিক জানাযার অধিকার

মৃত্যুর পর মুমিন নারী-পুরুষের মাগফিরাতের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে যে নামায আদায় করা হয়, তাকে 'সালাতুল জানাযা' বা জানাযার নামায বলা হয়। এই নামায মুমিন নারী-পুরুষের সর্বশেষ বিদায় সংবর্ধনা, যা অত্যন্ত ভাবগম্ভীর ও অনাড়ম্বর পরিবেশে আদায় করা হয়। ফরজে কেফায়া হওয়ার সুবাদে পুরুষদের উপর এই নামায একটি ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্বও বটে। জানাযার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত সুন্নাহসম্মত উপায়ে ও যথাযথ নিয়মে আদায় করা শরিয়তের অন্যতম মৌলিক বিধান। তদুপরি যে সকল ক্ষেত্রে সুন্নাহর একাধিক পদ্ধতি বর্ণিত আছে, সেখানে সমাজে প্রচলিত সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করলে ইসলামের ঐক্য ও সংহতি রক্ষিত হয়। মৃত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে জানাযার নামায অদায় করা এবং একাধিকবার নামায পড়ার পক্ষে ফকিহ ও মুজতাহিদগণের বিচ্ছিন্ন কিছু মতামত পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ফকিহ ও জমহুর উলামার মতে এটির বৈধতার পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষত হানাফি মাযহাব অধ্যুষিত উপমহাদেশে ইমাম আবু হানিফা'র (রহ.) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুযায়ী

শরয়ি বিধানের উপর আমল অব্যাহত থাকলে ফিতনা-ফ্যাসাদের দ্বার রুদ্ধ করার অবারিত সুযোগ পাওয়া যায়। নিম্নে ফকিহগণের এ সংক্রান্ত মতামত আলোচনা করা হলো।

ফকিহ-মুজতাহিদগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী জীবিত মুসলিম পুরুষদের উপর মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করা ফরজে কেফায়া। এ ক্ষেত্রে নামায আদায়কারীগণ সওয়াবের অধিকারী হয় এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ দায়মুক্তি লাভ করে। সাধারণত বান্দার উপর আল্লাহর হুকুম একবারই ফরজ হয়। যেভাবে অন্যান্য ফরজ ইবাদত একবারমাত্র আদায় করা বিধেয়। হজ জীবনে মাত্র একবার আদায় করতে হয়, যাকাত বছরে একবার আদায় করার বিধান রয়েছে। রোযা রমজান মাসে একবার আদায় করা ফরজ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় হলেই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হয়। এ সকল ইবাদত একাধিকবার আদায় করলে তা নফল হিসেবে গণ্য হয়। তবে জানাযার নামাযের নফল আদায়ের ব্যাপারে শরিয়তের কোনো আনুমোদন নেই। সুতরাং আমাদের হানাফি মাযহাবে একাধিকবার জানাযার নামায আদায় করার সুযোগ ও সম্ভাবনা কোনটিই নেই। কিন্তু শাফিই মাযহাবে শরিয়তের নির্দেশিত হুকুম একাধিকবার আদায় করার সুযোগ রয়েছে। এই মূলনীতির কারণে জানাযার নামায একবার আদায় করার পর পুনরায় আদায় করার ব্যাপারে ফকিহগণের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে জামাতবদ্ধভাবে একবার জানাযার নামায আদায় করার পর পুনরায় নামায পড়া মাকরূহ। জামাত ছাড়া নামায পড়া হলে দাফন করা পর্যন্ত জামাতের সাথে নামায আদায় করা মুস্তাহাব। ইমাম শাফিই (রহ.) এর মতে কোনো ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করা না হলে, তার জন্য দ্বিতীয়বার নামায আদায় করা সুন্নাত। যদিও দাফনের পরে হয়। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.) এর মতে, যে ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করা হয়নি, দাফন করার পরও ঐ ব্যক্তির নামায পড়া জায়েয।[১]

নিম্নে চার মাযহাবের আলোকে একাধিকবার জানাযার নামাযের হুকুম বর্ণনা করা হলো,

---

[১] আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ), খ. ১, পৃ. ৪৬৭।

মালিকি মাযহাবের অন্যতম ইমাম ইব্‌ন আবদুর বার (৩৬৮-৪৬৩) বলেন,

مَنْ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ عَلَى جِنَازَةٍ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا فَمُبَاحٌ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ خَيْرًا لَمْ يَحْظُرْهُ اللهُ وَلَا رَسُولُهُ وَلَا اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ (وَقَدْ) قَالَ اللهُ تَعَالَى وَافْعَلُوا الْخَيْرَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ نَسْخُهُ وَلَا اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ فَمَنْ فَعَلَ فَغَيْرُ حَرِجٍ وَلَا مُعَنَّفٍ بَلْ هُوَ فِي حِلٍّ وَسَعَةٍ وَأَجْرٍ جَزِيلٍ إِنْ شَاءَ اللهُ

“জানাযার নামায একবার আদায় করার পর অথবা কবরে দাফন করার পর পুনরায় আদায় করা মুবাহ। কেননা এটি একটি উত্তম কাজ। এ বিষয়ে আল্লাহ ও তার রসুলের পক্ষ থেকে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি এবং নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের আলেমদের ঐকমত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর আল্লাহ তায়ালা কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তিকে সমাহিত করার পর কবরে নামায আদায় করেছেন। এটি মানসুখ হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই। এ ধরনের কাজে অসুবিধার কিছু নেই। এটি নিন্দনীয় কর্মের অন্তর্ভুক্তও নয়। বরং একটি বৈধ ও জায়েয আমল। শরিয়তে যার যথেষ্ট সুযোগ ও অনুমোদন রয়েছে। এ কাজের জন্য অনেক সওয়াব আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ”।[১]

একাধিকবার জানাযার নামায আদায় করার ব্যাপারে হাম্বলি মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম ইব্‌ন কুদামা আল মাকদিসি’র (৫৪১-৬২০হি.) অভিমত প্রণিধানযোগ্য।

من صلى على الجنازة مرة فلا يسن له إعادة الصلاة عليها، أما من أدرك الجنازة فمن لم يصل عليها فله أن يصلي عليها في جماعة أو فرادى

“মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায একবার আদায় করার পর পুনরায় জানাযা পড়া সুন্নাহসম্মত নয়। কিন্তু যে ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করা হয়নি, তার জন্য

---

[১] আবু উমার য়ুসুফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল বার, *আল তামহিদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাআনি ওয়াল আসানিদ*, সম্পাদনা: মুস্তাফা ইব্‌ন আহমদ আলাভি, ও মুহাম্মদ আবদুল কাবির, (মরক্কো: ওয়াযারাতু উমুমিল আওকাফ ওয়াশ শুউন আল ইসলামিয়্যাহ, ১৩৮৭ হি.), খ. ৬, পৃ. ২৭৮।

জামাতবদ্ধ হোক বা একাকী হোক দ্বিতীয়বার নামায পড়া জায়েয”।[১]

একাধিকবার জানাযার নামায আদায় করার ব্যাপারে হাম্বলি মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়া (৬৬১-৭২৮ হি.) বলেন,

وأما اذا صلى هو على الجنازة ، ثم صلى عليها غيره : فهل له ان يعيدها مع الطائفة الثانية ؟ فيه وجهان في مذهب أحمد ، قيل : لايعيدها ، قالوا : لأن الثانية نفل ، وصلاة الجنازة لا يتنفل بها . وقيل : بل يعيدها ، وهو الصحيح ، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على قبر منبود صلى معه من كان صلى عليها اولا ، وإعادة صلاة الجنازة من جنس اعادة الفريضة ، فتشرع حيث شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

“একাধিক জানাযার ব্যাপারে হাম্বলি মাযহাবে দু’টি মত পাওয়া যায়। প্রথম মত হলো, জামাতবদ্ধভাবে জানাযার নামায দ্বিতীয়বার পড়া যাবে না। কেননা দ্বিতীয়বারের এই নামায নফল হিসেবে ধর্তব্য হবে। অথচ নফল হিসেবে জানাযার নামায আদায় করার কোনো বিধান নেই। এ মাযহাবের দ্বিতীয় বিশুদ্ধ মতটি হলো, জানাযার নামায পুনরায় আদায় করার অনুমোদন রয়েছে। কেননা সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক একবার জানাযা আদায় করে দাফনকৃত একটি কবরে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার নামায আদায় করেছেন। এতে প্রথমবার নামায আদায়কারী সাহাবিগণও অংশ নিয়েছিলেন। সালাতুল জানাযা এমন এক প্রকার নামায, যা পুনরায় আদায় করা বৈধ। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুমোদনের কারণে এটি অনুমোদিত বলে গণ্য হবে”[২]।

হানাফি মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম আলাউদ্দিন কাসানি (মৃ.৫৮৭ হি.) বলেন,

وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً لَا جَمَاعَةً وَلَا وُحْدَانًا عِنْدَنَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ صَلَّوْا عَلَيْهَا أَجَانِبَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْأَوْلِيَاءِ، ثُمَّ حَضَرَ الْوَلِيُّ فَحِينَئِذٍ لَهُ أَنْ يُعِيدَهَا

---

[১] মাকদিসি, মুয়াফ্‌ফাকুদ্দিন, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন কুদামা, *আল মুগনি*, (কায়রো: মাকতাবাহ আল কাহিরা, ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৮২।

[২] ইব্‌ন তাইমিয়া, তাকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ ইব্‌ন আবদুল হালিম, *মাজমু’উল ফাতাওয়া*, সম্পাদনা: আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ, (মদিনা মুনাওয়ারা: মাজমাউল মালিক ফাহদ, ১৪১৬ হি./ ১৯৯৫ খ্রি.), খ.২৩, পৃ. ৩৮৭।

"মৃত ব্যক্তির উপর জামাতবদ্ধ হোক বা একাকী হোক, শুধুমাত্র একবার জানাযার নামায পড়া বিধেয়। মৃত ব্যক্তির অভিভাবক নামায অদায় না করে থাকলে, তার জন্য দ্বিতীয়বার জানাযার নামায পড়া জায়েয"।[১]

ফিকহে হানাফির বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে, মৃত ব্যক্তির একাধিক সন্তান থাকলে তাদের মধ্য হতে প্রাপ্তবয়স্ক কোনো ছেলে যদি জানাযার নামায আদায় করে অথবা কোন ছেলের সম্মতিতে জানাযার নামায আদায় হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে অন্য ছেলেদের জন্য পুনরায় জানাযা আদায় করার সুযোগ থাকবে না। নিম্নে কুরআন সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের আমলের আলোকে এ সংক্রান্ত দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো,

সাহাবায়ে কেরামের যুগে একাধিকবার জানাযা আদায় করার কোনো নিয়ম প্রচলিত ছিল না। এ বিষয়ে ইব্ন উমার (রাদি.) থেকে নাফে (রহ.) বর্ণনা করেন,

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى جِنَازَةٍ وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا دَعَا وَانْصَرَفَ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ

"আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাদি.) জানাযার নামায আদায় করতে গিয়ে যদি দেখতেন যে, মৃত ব্যক্তির জানাযা একবার আদায় হয়ে গেছে, তখন তিনি দোয়া করে ফিরে আসতেন। দ্বিতীয়বার নামায আদায় করতেন না"।[২]

বিখ্যাত তাবিই ইবরাহিম নাখায়ি (৪৭-৯৬ হি.) একাধিকবার জানাযার নামায আদায় করতে নিষেধ করতেন মর্মে ইব্ন আবি শাইবা একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হাসান বসরি (২১-১১০ হি.) থেকে আবু হুররা বর্ণনা করেন,

عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُبِقَ بِالْجَنَازَةِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَجْلِسُ أَوْ يَنْصَرِفُ

"তাবিই হাসান বসরি মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় হয়ে যাওয়ার পর,

---

[১] কাসানি, আলাউদ্দিন আবু বকর ইব্ন মাসউদ, *বাদায়ি'উস সানায়ি' ফি তারতিবিশ শারায়ি'*, (কায়রো: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩১১।

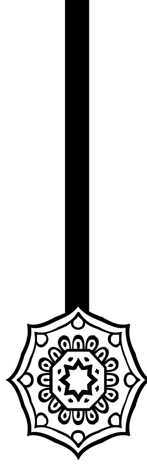
[২] সানআনি, আবদুর রায্যাক আবু বকর ইব্ন হুমাম ইব্ন নাফে আল হিময়ারি, *মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক*, সম্পাদনা, হাবিবুর রহমান আল আজমি, (ভারত: আল মাজলিসুল ইলমি, দ্বিতীয় সংস্করণ), খ. ৩, পৃ. ৫১৯, হাদিস নং- ৬৫৪৫।

তার জন্য ইসতেগফার করার লক্ষ্যে বসতেন অথবা ফিরে আসতেন"।[১]

বর্তমান সময়ে একাধিক জানাযা মৃত ব্যক্তির সামাজিক প্রভাব ও মর্যাদার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামি শরিয়তের বিধি-বিধান অনেকে যশ-খ্যাতি ও ফ্যাশন-জৌলুশ হিসেবেও আদায় করছে। নাম-যশ যেখানে মূখ্য, সেখানে আলিম-উলামার ভূমিকা অনেকটাই গৌণ। আজ থেকে কয়েক দশক পূর্বেও আমাদের সমাজে একাধিক জানাযার ব্যাপক প্রচলন ছিল না। শরিয়তের বিধি বিধান নিজের খাহেশ ও মর্জি মতো আদায় করার একটি প্রবণতা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়। কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির এ ধরনের কার্যকলাপ মুসলিম সমাজে বিরূপ প্রভাব ফেলে। আবার অনেকে হানাফি মাযহাবের অনুসারী দাবি করেও মতাদর্শের প্রচার ও স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ভিন্ন মাযহাব মতো আমল করার চেষ্টা করে। এভাবেই মুসলিম সমাজের সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভ্রান্তির বিস্তার ঘটে। ইসলামি শরিয়তে অনেক আমলের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সুন্নাহর বিধান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান হলো, যে সমাজে যে সুন্নাহ চলমান আছে, সে অনুযায়ী আমল করা। এক্ষেত্রে ভিন্ন মাযহাবের আমল চালু করার সুযোগ ইসলামে অনুমোদিত নয়। সম্প্রতি উচ্চস্বরে সূরা ফাতিহা পাঠ করে জানাযার নামায আদায় করা সংক্রান্ত একটি বিতর্ক ডালপালা বিস্তার করছে। মুসলিম উম্মাহকে বহুধাবিভক্ত করার দূরভিসন্ধি এর নেপথ্যে সক্রিয় রয়েছে। ইসলামি শরিয়তে উম্মাহর ঐক্য মূখ্যবিষয় ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ । উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট কারার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।



[১] ইব্ন আবি শাইবা, আবু বকর আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহিম, *মুসান্নাফ*, সম্পাদনা: কামাল য়ুসুফ আল হুত, (রিয়াদ: মাকতাবা আল রুশদ, ১৪০৯ হি.), খ.৩, পৃ. ৪২, হাদিস নং- ১১৯৪৭।



আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বিয়ের অধিকার

বিয়ে একটি শাশ্বত ইবাদত ও সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন। আবহমান কালের সামাজিক রীতি ও নারী-পুরুষের সম্প্রীতির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। মানবসৃষ্টির সূচনাকাল থেকে এর প্রচলন। প্রথম মানব আদম (আ.) এর সঙ্গে হাওয়া (আ.) এর সর্বপ্রথম বিয়ে সম্পাদিত হয় বেহেশতের আদিনিবাসে। মৃত্যুর পর বান্দার আমলের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেলেও নারী-পুরুষের পারস্পরিক বিয়ে-শাদি বেহেশতেও অব্যাহত থাকবে। বিয়ে নবি-রসূলদের সর্বজনীন সুন্নাত। আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ'য় বিয়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিষদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বিয়ের সংজ্ঞা

ইসলামি শরিয়তে বিয়ের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইনায়া গ্রন্থ প্রণেতা বলেন,

عَقْدٌ وُضِعَ لِتَمْلِيْكِ مَنَافِعِ الْبُضْعِ

'নারীর যৌনাঙ্গ দ্বারা উপকার লাভ করার নিমিত্তে কৃত চুক্তি হলো বিয়ে।'[১]

বিয়ের রুকন বা ফরজ দুইটি। ইজাব ও কবুল। (প্রস্তাব ও প্রস্তাব গ্রহণ)। বিয়ের শর্ত হলো, দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী সাক্ষী বর্তমান থাকা। বিয়ের সময় মাহর নির্ধারণ করা না হলেও স্বামীর ওপর মাহরে মিসিল[২] ওয়াজিব হবে। বিয়েতে খুতবা পড়া সুন্নাত।

বিয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও সুন্নাহ'র বিভিন্ন বর্ণনা থেকে বিয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। বিয়ের উল্লেখযোগ্য উপকারিতার মধ্যে রয়েছে,

১. মানবজাতির বংশধারা সচল রাখা
২. নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন করা
৩. বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা
৪. আত্মার প্রশান্তি
৫. মাতৃত্ব ও পিতৃত্বচাহিদার বাস্তবায়ন
৬. দারিদ্র্য বিমোচন

বিয়ের বয়স

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিয়ের বয়সের আইনি অনুমতি ছেলেদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১৫ থেকে সর্বোচ্চ ২২ এবং মেয়েদের জন্য সর্বনিম্ন ১৪ থেকে সর্বোচ্চ ১৯। তবে সৌদি আরব ও ইয়েমেনে বিয়ের জন্য কোন বয়সসীমা নির্ধারিত নেই। ছেলেদের বয়স বেশি থাকার কারণ হলো মানব প্রজাতিতে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের পরিণত হতে দুই এক বছর বেশি সময় লাগে। অনেক দেশে মেডিকেল পরীক্ষায় প্রমাণিত বয়ঃসন্ধিকালকেই বিয়ের বয়স হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ দেশেই বিয়ের জন্য বাবা-মায়ের অনুমতির প্রয়োজন হয়। তবে ইন্দোনেশিয়া ও জর্দানসহ বেশ কিছু দেশে বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে নির্ধারিত

---

[১] আল বাবরতি, আবু আবদিল্লাহ আকমালুদ্দিন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল ইনায়া শরহুল হিদায়া*, দারুল ফিকর, (বৈরুত: তা/বি), খ. ৩, পৃ. ১৮৭।

[২] কোনো নারীর নিজ বংশের নারীদের বিয়ের সময় যে পরিমাণ মাহর নির্ধারণ করা হয়, তার সমপরিমাণ মাহরকে মাহরে মিসিল বলে।

বয়সের নিচেও বিয়ে করা যায়। বাংলাদেশে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর এবং ছেলেদের জন্য ২১ বছর। ২০১৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বিয়ের বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৮ এবং মেয়েদের জন্য ১৬ বছর অনুমোদন দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে পরবর্তীতে তা বাতিল করা হয়।

বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বে নারী-পুরুষের বয়োঃপ্রাপ্তি ও বিয়ের স্বতন্ত্র বয়স নির্ধারণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬০ খ্রি. নারীদের বিয়ের বয়স ছিল ২০ এবং পুরুষের ক্ষেত্রে ২৩ বছর। ১৯৯৭ খ্রি. নারীর ক্ষেত্রে ২৫ ও পুরুষের ক্ষেত্রে ২৭ বছর নির্ধারিত হয়। ইউরোপের দেশ ফ্রান্সে পুরুষের ১৮ এবং নারীর ১৫ বছর নির্ধারিত রয়েছে। আরব-আমিরাতে পুরুষের বয়স ১৮ বছর আর নারীর বয়ষ ১৬ বছর। সিরিয়ায় পুরুষের ১৮ এবং নারীর ১৭ হলেও পুরুষের জন্য ১৫ এবং নারীর জন্য ১৩ বছর বয়সে বিয়ে করার অনুমোদন রয়েছে। যেসব দেশে বিয়ের বয়সসীমা নির্ধারিত সেসব দেশে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে নারী-পুরুষের বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মেও বিয়ের নির্দিষ্ট বয়স নির্ধারিত রয়েছে। রোমান আইনে পুরুষের বিয়ের বয়স হলো ১৪ আর নারীর বয়স ১২ বছর। ইহুদি ধর্মে পুরুষের বয়স ১৩ আর নারীর ১২ বছর। হযরত মারয়াম (আ.) ১৪ বছর বয়সে গর্ভবতী হওয়ার কারণে খ্রিস্টানগণ এ বয়স নির্ধারণ করেছে।

নারী-পুরুষের বয়োঃপ্রাপ্তি ও সরকার নির্ধারিত বয়সের পূর্বে বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে বাল্য বিয়ে বা বাল্যকালীন বিয়ে বলে বলে।

বাল্যকাল কাকে বলে?

ফিকহ শাস্ত্রের বিশ্বকোষ আল মাওসুআতুল ফিকহিয়া কিতাবে বালক-বালিকার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

هُوَ وَصْفٌ يَلْحَقُ بِالْإِنْسَانِ مُنْذُ مَوْلِدِهِ إِلَى بُلُوْغِهِ الْـحُلُمَ

“জন্ম থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত মানুষের ওপর যে সকল অবস্থা বিরাজ করে তাকে বাল্যকাল বলে।”[১]

[১] আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা আল কুয়েতিয়্যাহ, ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়া, (কুয়েত: দারুস সালাসিল, ১৪২৯ খ্রি.) খ. ২৭, পৃ. ২০।

সুতরাং বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর কোনো মানুষ বালক-বালিকা থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের এক পর্যায়ে ঋতুবতী হওয়ার সময়কে নারীর বয়ঃসন্ধিকাল বলে।

বাল্যবিয়ে কি?

সাধারণ অর্থে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ বাল্য অবস্থায় নারী-পুরুষের যে বিয়ে হয় তাকে বাল্যবিয়ে বলে। আমাদের দেশে নারীর ক্ষেত্রে এ পরিভাষাটির প্রয়োগ বহুলপ্রচলিত। চিকিৎসা ও আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ঋতুবতী হওয়ার পূর্বে নারীর বিয়ে হওয়াকে বাল্যবিয়ে বলে। বিভিন্ন দেশের আবহাওয়াভেদে নারীরা ৯-১৬ অথবা ১১-১২ বছর বয়সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয়। উপর্যুক্ত সময়ের মধ্যে নারী-পুরুষের শারীরিক ও মানসিক কোনো পরিবর্তন দেখা না গেলে এবং ১৫ বছর বয়সে পদার্পন করলে ইসলামি শরিয়তে ওই ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক বলে ধর্তব্য হয়।

বাল্যবিয়ের কুফল

বিভিন্ন দেশে বাল্যবিয়ে নিরুৎসাহিত ও নিষিদ্ধ করার পেছনে অনেক কারণ বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি কারণ প্রদত্ত হলো:

১.আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রমাণ করে ১৮ বছর বয়সের পূর্বে কোনো নারীর বিয়ে হলে সে শারীরিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যার সম্মুখীন হয় শারীরিক ক্ষেত্রে। এ সময়ে নারীর শরীর গর্ভধারণের উপযোগী হয় না এবং গর্ভস্থ সন্তান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

২.এ বয়সে বিয়ে হলে মানসিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয়। স্বামী সংসারের চাপের মুখে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারে না বলে দিন দিন মানসিকভাবে বিকারগ্রস্থ হয়।

৩.শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে উন্নতি করার সময়ে স্বামী-সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে নারীরা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

৪.অপরিণত বয়সে অনেক দায়-দায়িত্ব নিজ কাঁধে বহন করার কারণে নারীর জীবন দুর্বিসহ হয়।

উপযুক্ত বয়সে বিয়ের সুফল ও বিলম্বিত বিয়ের কুফল

পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ১৮ বছরের আগে নারীর জন্য বিয়ে নিষিদ্ধ

করা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল ও মুসলিম দেশের জন্য কখনো যুক্তিযুক্ত নয়। ইউরোপ আমেরিকায় ধর্মের কোনো বালাই নেই। নৈতিকতা এখানে গৌণ বিষয়। যেসব কারণে ইসলাম উপযুক্ত বয়সে বিয়ে করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে,

১. নৈতিক চরিত্রের সুরক্ষা। একমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই যৌন চাহিদা মিটিয়ে নারী-পুরুষ মানবীয় চরিত্র অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। বিলম্বিত বিয়ের কারণে নারী-পুরুষের ওপর শয়তান কুমন্ত্রণা দেওয়ার সুযোগ পায় এবং অপকর্মে লিপ্ত করে।

২. উপযুক্ত সময়ে বিয়ের কারণে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিয়ামতের দিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উম্মতের সংখ্যাধিক্যের কারণে অন্যান্য নবি-রসূলের ওপর অহংকার করবেন। তদুপরি এর মাধ্যমে মুসলমানের জনশক্তিও বৃদ্ধি পায়।

৩. নারীর পুনঃপুনঃ গর্ভধারণ একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। আর এতে বাধাপ্রদান প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ। প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে তার প্রতিশোধ অনিবার্য।

৪. বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষ স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পায় এবং পিতা-মাতার ওপর আর্থিক চাপ কমে।

৫. বাল্যবিয়ে নারীর জন্য ক্ষতিকর হওয়ার বিষয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান একমত নয়। আমেরিকার Texas প্রদেশের Parkland Hospital-এর চিকিৎসাবিজ্ঞানী Satin বিলম্বিত বিয়ের প্রতি নারী-পুরুষের অনীহার অনেক ক্ষতিকর দিক বর্ণনা করেছেন।

৬. চিকিৎসা বিজ্ঞান আরও প্রমাণ করেছে যে, বিলম্বিত বিয়ের কারণে নারীদের এক প্রকার জরায়ুপ্রদাহ ও ব্রেস্ট স্ফীতির মতো বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় তা গর্ভপাতের কারণ হয়। মার্কিন বিজ্ঞানী Hawen এর মতে ৩৫ বছরের পর গর্ভধারণ করলে গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকে। অনেক সময় তারা মৃত সন্তানও প্রসব করে।

ইসলামের প্রতিটি বিধান বিজ্ঞানসম্মত

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অত্যাধুনিক যুগে ইসলামের প্রতিটি বিধান বিজ্ঞানসম্মত বলে

প্রমাণিত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা যতই সমৃদ্ধ হচ্ছে, ইসলামের প্রতিটি বিধানের বিজ্ঞানময়তা প্রমাণ করা ততই সহজতর হচ্ছে। অনেক চিকিৎসা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বাল্যবিয়ে ক্ষতিকর প্রমাণিত হলেও অনেকের গবেষণায় তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে এবং নতুন নতুন তথ্য বেরিয়ে আসছে। যাদের গবেষণায় বাল্যবিয়ে ক্ষতিকর বিবেচিত হয়েছে তা চূড়ান্ত গবেষণা নয়। ভবিষ্যতের নিত্য-নতুন গবেষণা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বৈধ ঘোষিত এ বিধান বিজ্ঞানসম্মত বলে বিবেচিত হবে।

উপযুক্ত সময়ে বিয়ে প্রসঙ্গে কুরআন-সুন্নাহর গুরুত্বারোপ

কুআন ও সুন্নাহয় প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর নারী পুরুষকে বিয়ের প্রতি উৎসাহিত করা করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ﴾

"তোমরা অবিবাহিত মহিলা এবং নেককার দাস-দাসীদের বিয়ের ব্যবস্থা করো। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাদের অভাব মোচন করে দেবেন"।[১]

এখানে الْأَيَامَىٰ শব্দটি কুমারী ও বিধবা সকলের ক্ষেত্রে প্রজোয্য।

﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ﴾

"তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হবার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিনমাস। আর যাদের এখনো ঋতুস্রাব হয়নি তাদেরও ইদ্দতকাল হবে তিনমাস"।[২]

এ আয়তে ঋতুবতী হয়নি এমন নারীদের বিয়ের পর তাদের ইদ্দতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যা দ্বারা তাদের বিয়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়। কারণ বিয়ে না হলে ইদ্দত পালনের কোনো প্রশ্ন আসে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[১] আল কুরআন, ২৪;৩২।
[২] আল কুরআন, ৬৫;৪।

ইরশাদ করেন,

يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ؛ فإنَّه له وِجَاءٌ.

"হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ে করার শক্তি আছে তারা যেনো বিয়ে করে। কেননা এটি দৃষ্টিশক্তি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে। যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, তারা যেনো রোযা রাখে। কেননা এটি যৌন উত্তেজনা নিবারণে সহায়ক"।[১]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন,

ثلاثةٌ حقٌّ على اللهِ عونُهُم: المُجاهدُ في سبيلِ اللهِ والمُكاتِبُ الَّذي يريدُ الأداءَ، والنَّاكحُ الَّذي يريدُ العفافَ

"তিনজন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর উপর কর্তব্য। ১. আল্লাহর পথের মুজাহিদ, ২. যে পাওনা আদায় করতে চায়, ৩. যে পাপ থেকে বাঁচার জন্য বিয়ে করতে চায়"।[২]

তিরমিযি শরিফে বর্ণিত আছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলিকে (রাদি.) উপদেশ দিয়ে বলেন,

يا عليُّ، ثلاثٌ لا تؤخِّرْها: الصَّلاةُ إذا آنَت والجِنازةُ إذا حضَرَت والأيِّمُ إذا وجدَت لها كُفُؤًا

"হে আলি! ৩টি কাজে বিলম্ব করো না। ১. যখন নামাযের সময় হয়ে যায় ২. যখন জানাযা উপস্থিত হয় ৩. অবিবাহিত মহিলার যখন উপযুক্ত পাত্র পওয়া যায়"।[৩]

---

[১] মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরি, সহিহ মুসলিম, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়া আল তুরাসিল আরবি), খ. ১, পৃ. ১০১৮, হাদীস: ৩ (১৪০০)

[২] তিরমিযি, মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন সাওরা, সুনানু তিরমিযি, (বৈরুত: দারুল গারবিল ইসলামি, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৮৪, হাদিস: ১৬৫৫।

[৩] তিরমিযি, মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন সাওরা, *সুনানু তিরমিযি*,(বৈরুত: দারুল গারবিল ইসলামি, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ٢২০, হাদিস নং- ٢٧٨٨।

নামাযের যেভাবে মুস্তাহাব, হারাম ও মাকরুহ সময় আছে, তেমনিভাবে বিয়েরও উপযুক্ত ও অনুপযু[3] সময় আছে। অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে বৈধ হলেও তার উপযুক্ত সময় হলো বয়ঃসন্ধিকাল। এ সময়ে বিয়ে না করলে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে বিলম্বিত বিয়ে হারাম অথবা মকরুহ হবে।

বাল্যবিয়ে ও ইসলাম

ইহুদি-খ্রিস্টানপ্রভাবিত পশ্চিমা বিশ্বের অনুকরণে বাংলাদেশ সরকারও নারীর বিয়ের বয়স ১৮ বছর নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বিয়ের বয়স ১৬ বছর করার প্রস্তাব করলেও তা অনেকের মনঃপুত হয়নি বিধায় গৃহীত হয়নি। এ দৃষ্টিকোণে ১৮ বছরের পূর্বে কোনো নারীর বিয়ে হওয়া একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। দীর্ঘদিন যাবৎ এ ব্যাপারে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে আসলেও বেশ কিছুদিন যাবৎ এ ধরণের বিয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। অভিভাবক হিসেবে কনের মাতা-পিতাকে শাস্তিস্বরূপ জেলে পুরছে ।

ইসলামি শরিয়ত বিয়ের নির্দিষ্ট বয়স নির্ধারণ করেনি, বরং অধিকাংশ ফকিহ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেও নারীর-পুরুষের বিয়ের বৈধতার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা নকল করেছেন। এ বিষয়ে সহিহ বুখারি শরিফের বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য:

> قال البخاري في صحيحه: بَابِ بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ: وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: [وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا وَقَالَ مُغِيْرَةُ: احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً»، وَبُلُوغُ النِّسَاءِ فِي الْـحَيْضِ، لِقَوْلِهِ [وَالّٰئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ] إِلَىٰ قَوْلِهِ [أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] وَقَالَ الْـحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً، بِنْتَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِيْنَ سَنَةً
>
> “ইমাম বুখারি (রহ.) অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকার বিয়ে বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদও কায়েম করেছেন। পরিচ্ছেদটি নিম্নরূপ: بَابِ بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ (অপ্রাপ্ত বয়সে সন্তানের বিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে)”।[১]

---

[১] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, *সহিহ আল বুখারি*, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪), খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৭৭।

অপ্রাপ্তবয়সে নারী-পুরুষের বিয়ে জায়েয হলেও তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের (সহবাস) ব্যাপরে ইসলামের বিধান হলো,

قال النووي: أَمَّا وَقْتُ زِفَافِ الصَّغِيْرَةِ الْـمُزَوَّجَةِ وَالدُّخُوْلُ بِهَا فَإِنِ اتَّفَقَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ عَلَىٰ شَيْءٍ لَا ضَرَرَ فِيْهِ عَلَى الصَّغِيْرَةِ عُمِلَ بِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَا، فَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُوْ عُبَيْدٍ تُجْبَرُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ دُوْنَ غَيْرِهَا، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ حَدُّ ذَلِكَ أَنْ تُطِيْقَ الْـجِمَاعَ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِهِنَّ وَلَا يُضْبَطُ بِسِنٍّ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ

"ইমাম নববি (রহ.) বলেন, যদি স্বামী ও বিবাহিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক মহিলার অভিভাবকের সম্মতির ভিত্তিতে সাক্ষাৎ হয় তাহলে জায়েয। আর উভয়পক্ষ একমত না হলে বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, স্ত্রী সহবাসের উপযুক্ত না হলে এ বিধান কার্যকর হবে। আর যদি সহবাসের উপযুক্ত হয়, তাহলে তাকে বাধা দেয়া জায়েয হবে না। এখানে বয়স কোনো বাধা হতে পারে না"।[১]

ইমাম ইবনে নুজাইম (রহ.) হানাফি মাযহাবের অভিমত ব্য³ করতে গিয়ে আল বাহরুর রায়িক কিতাবে বলেন, হানাফি মাযহাবের আলিমদের মধ্যে এ বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে, একদল আলিমের মতে অপ্রাপ্তবয়সে বিয়ে হলেও বালিগ না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা যাবে না। আর একদল আলিম বলেন, স্ত্রীর বয়স নয় বছর হলে জায়েয হবে। এ ব্যাপারে আরেকটি অভিমত হলো, নয় বছর না হয়েও হৃষ্ট-পুষ্ট, স্বাস্থ্যবান ও সহবাসের উপযোগী হলে তা বৈধ হবে।

ফতওয়া আলমগিরি কিতাবে বর্ণিত আছে,

وَإِنْ كَانَتْ نَحِيْفَةً مَهْزُوْلَةً لَا تُطِيْقُ الْـجِمَاعَ وَيُخَافُ عَلَيْهَا الْـمَرَضُ لَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَّدْخُلَ بِهَا، وَإِنْ كَبُرَ سِنُّهَا وَهُوَ الصَّحِيْحُ

"যদি স্ত্রী দুর্বল ও অসুস্থ হয়, তাহলে প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তার সঙ্গে সহবাস করা

[১] নববি, আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দিন য়াহয়া ইব্ন শরফ, *আল মিনহাজ শারহু সহিহ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, (বৈরুত: দারু ইহয়া আল তুরাসিল আরবি, ১৩৯২ হি.), খ. ৯, পৃ. ২০৬।

জায়েয হবে না"।[১]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশাকে (রাদি.) ছয় বছর বয়সে বিয়ে করার পর তিন বছর পর্যন্ত স্ত্রীসুলভ সাক্ষাতে বিলম্ব করার পেছনে মূল কারণ এটিই।

ইসলামে বাল্যবিয়ে স্বীকৃত ও বৈধ

এ বিষয়ে ইসলামের ইতিহাসে কোনো আলিমের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়নি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বাল্যবয়সে বিয়ে করে তার বাস্তব প্রমাণ দেখিয়েছেন। তিনি হয়রত আয়িশাকে (রাদি.) ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাদি.) ব্যতীত কোনো কুমারী মেয়েকে বিয়ে করেননি। বিয়ের সময় হযরত আয়িশা (রাদি.) কুমারী হওয়ার পাশাপাশি অপ্রাপ্তবয়স্কও ছিলেন। সম্ভবত বাল্যবিয়ের বৈধতা প্রমাণের জন্য তিনি হযরত আয়িশাকে (রাদি.) বিয়ে করেছিলেন। সহিহ বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ، وَبَنَىٰ بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ

"হযরত আয়িশা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশাকে (রাদি.) ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেন এবং নয় বছর বয়সে তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত করেন"।[২]

ফতহুল বারি কিতাবে ইমাম বগভি (রহ.) এর উক্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে দোলনা থেকেও কণ্যাকে বিয়ে দেওয়া জায়েয। সাহাবায়ে কেরাম কোনো প্রকার মতবিরোধ ছাড়াই বাল্যবিয়ে সম্পাদন করেছেন। মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ও ইব্ন সা'দ রচিত তাবাকাত কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত আলি (রাদি.) নিজ কণ্যা কুলসুমকে হযরত উমারকে (রাদি.) বাল্যকালে বিয়ে দেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় তাদের সন্তানও ভূমিষ্ট হয়।

---

[১] বালাখি, মোল্লা নিযাম উদ্দীন, *আল-ফত্ওয়ালা আল-হিন্দিয়া* , (বৈরুত: দারুল ফিক্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১০ হি.), খ. ১, পৃ. ২৮৭।

[২] বুখারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল, সহিহ আল বুখারি, (বাংলাদেশ: মুয়াসসাসাহ আল ইসলামিয়া, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪), খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ১৭, হাদিস নং- ৫১৩৪।

ইসলাম বাল্যবিয়ে নিরুৎসাহিত করে

ইসলাম দেশ ও জাতির স্বার্থে এমন কিছু বিধান জারি করেছে, যা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রয়োজনের মুহূর্তে ব্যবহার্য। বহুবিয়ে এবং বাল্যবিয়ে এর মধ্যে অন্যতম। ইসলাম একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে কিন্তু উৎসাহিত করেনি। তেমনিভাবে প্রয়োজনের মুহূর্তে বাল্যবিয়ের অনুমোদন দিয়েছে; উৎসাহ প্রদান করেননি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশাকে (রাদি.) অপ্রাপ্তবয়সে বিয়ে করে বাল্যবিয়ের বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু নিজ কণ্যাকে অপ্রাপ্তবয়সে বিয়ে না দিয়ে বাল্যবিয়ে নিরুৎসাহিত করেছেন। এ বিষয়ে নিম্নের হাদিস প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ فَاطِمَةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ

“হযরত বুরাইদা (রাদি.) থেকে বর্ণিত, হযরত আবু বকর (রাদি.) ও হযরত উমার (রাদি.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ফাতিমাকে (রাদি.) বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। রসূল (সা.) বললেন, ‘ফাতিমা এখনো ছোট।’ পরবর্তীতে হযরত আলি (রাদি.) প্রস্তাব দিলে তার সঙ্গে বিয়ে দেন”।[১]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কণ্যা ফাতিমাকে অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে না দিয়ে এবং পরিণত বয়সে হযরত আলি (রাদি.) এর সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে বাল্যবিয়ে নিরুৎসাহিত করেছেন। এখানে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধানের প্রতিও দিক নির্দেশনা রয়েছে। কেননা বয়স্ক হযরত আবু বকর (রাদি.) ও হযরত উমার (রাদি.) এর সঙ্গে হযরত ফাতিমা (রাদি.)-এর বয়সের ভারসাম্য ছিল না। পক্ষান্তরে যুবক হযরত আলী (রাদি.) এর সঙ্গে হযরত ফাতিমা (রাদি.) এর বয়সের যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়।

وسن فاطمة حين تزوجت كما قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» كان سنها يوم تزويجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصفا وكانت سن على إحدىٰ وعشرين

---

[১] নাসায়ি, আবু আবদির রহমান আহমদ ইব্ন শু‘আইব ইব্ন আলি আল খোরাসানি, *সুনানু নাসায়ি*, সম্পাদনা: আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, হালাব: (মাকতাবা আল-মাতবুয়া-আল ইসলামিয়া, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৬২, হাদিস নং- ৩২২১।

سنة وخمسة أشهر

"ইব্ন আবদুল বার আল ইসতিয়াব কিতাবে বর্ণনা করেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আলি (রাদি.) এর সঙ্গে হযরত ফাতিমাকে (রাদি.) বিয়ে দেন তখন হযরত ফাতিমা (রাদি.) এর বয়স ছিল পনের বছর সাড়ে পাঁচ মাস। আর হযরত আলি (রাদি.) এর বয়স ছিল ২১ বছর ৫ মাস।"[১]



[১] ইব্ন আবদিল বার, আবু য়ূসুফ উমার ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ, *আল ইসতি'আব ফি মা'রিফাতিল আসহাব*, (বৈরুতঃ দারুল জাইল, ১৯৯২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৮৯৩।

লেখক পরিচিতি

ড. আবিদুর রহমান তালুকদার, চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী উপজেলার জুলধা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯৭১ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আলহাজ্ব মাওলানা আলি আহমদ (রহ.) ছিলেন অসাধারণ গুণাবলিসম্পন্ন একজন বুজুর্গ আলিম। ভারতের প্রসিদ্ধ দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করার পর দেশে নানাবিধ দীনি খেদমত আঞ্জাম দেন এবং ১৯৮২ খ্রি. ইন্তেকাল করেন। তিনি অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসল ও দয়ালু লোক ছিলেন। তার ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে স্বীয় ছোট ভাই ফজল আহমদ শোকাহত হয়ে ইন্তেকাল করেন এবং দুই ভাই এক জানাযায় সমাহিত হন।

আবিদুর রহমান তালুকদার স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন। তিনি চট্টগ্রামের দারুল উলুম আলিয়া থেকে প্রথম শ্রেণিতে কামিল পাশ করেন। পরবর্তীতে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৯৫ খ্রি. বি.এ (অনার্স) সহ প্রথম শ্রেণিতে (দ্বিতীয় স্থান) এমএ. পাশ করেন। তিনি ২০১৫ খ্রি. সাদার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে ডাবল মাস্টার্স করেন এবং ২০২২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিলসহ পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

লেখক ১৯৯৭ খ্রি. হাছনদণ্ডী এম. রহমান সিনিয়র মাদরাসায় উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন এবং চট্টগ্রামের সৈয়দ শাহ রোডে অবস্থিত আলহাজ মফজল আলি জামে মসজিদে খতিব হিসেবে নিয়োজিত আছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি লেখালেখি ও গবেষণায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলছেন। জাতীয়-স্থানীয় পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন সাময়িকীতে নিয়মিত লেখালেখি করেন। তিনি অনেক মৌলিক ও অনুবাদগ্রন্থের প্রণেতা। চট্টগ্রামের ইসলামি ভাবধারার লেখকদের একমাত্র সংগঠন 'জাগৃতি লেখক ফোরাম' এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

লেখকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে, ‘ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর অলৌকিক গুণাবলি ও হানাফি মাযহাব এর অপরূপ বৈশিষ্ট্য’, ‘ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশ ও ফিতনার যুগে ঈমান রক্ষার উপায়’, ‘আনন্দ ভূবনে আত্মার অভিযাত্রা’, ‘কাসাসুন নাবিইয়িন’, ‘নাসিরুদ্দিন আলবানি’র হাদিস গবেষণা: একটি পর্যালোচনা’ ও ‘নূরুল ঈযাহ’ ইত্যাদি।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল কুরআনুল কারিম

২. হাদিস শাস্ত্রের বিশুদ্ধ ছয়টি কিতাব, বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযি ও ইব্ন মাজা

৩. মুয়াত্তা, মালিক ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক ইব্ন আমির আল আসবাহি, সম্পাদনা: ফুয়াদ আবদুল বাকি, (বৈরুত: দারু ইহয়া আল তুরাসিল আরবি, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খ্রি.)

৪. মুসনাদ, আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল, (রিয়াদ: মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, ১৪২১ হি./ ২০০১ খ্রি.)

৫. সুনানু দারিমি, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, (সৌদি আরব: দারুল মুগনি লিন নাশরি ওয়াত তাওযি', ১৪১২ হি./২০০০ খ্রি.)

৬. বাইহাকি, আহমদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলি ইব্ন মুসা, আল সুনান আল কুবরা, (বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.)

৭. বাইহাকি, আহমদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলি ইব্ন মুসা, আল দা'ওয়াতুল কাবির, সম্পাদনা: বদ্র ইবন আবদুল্লাহ আল বদ্র, (কুয়েত: গারাস লিন নাশরি ওয়াত তাওযি, ২০০৯ খ্রি.)

৮. সুনানু দারা কুতনি, আবুল হাসান আলি ইব্ন উমার আল বাগদাদি, (বৈরুত, মুয়াসসাসাহ আল রিসালা, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি), খ. ২, পৃ. ৪২২, হাদিস নং- ১৮০০।

৯. আল মু'জামুল কাবির, আবুল কাসিম সুলাইমান ইব্ন আহমদ ইব্ন আইয়ুব তাবরানি, (কায়রো: মাকতাবাহ ইব্ন তায়মিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.)

১০. শু'আবুল ঈমান, আবু বকর আহমদ ইব্ন হোসাইন ইব্ন আলি আল বাইহাকি, (রিয়াদ: মাকতাবাহ আল রুশদ: সম্পাদনা: আহমদ নাদাভি, সাহিবুদ দার আল সালাফিয়্যাহ, মুম্বাই)

১১. মুসান্নাফ, আবু বকর আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহিম ইব্ন আবি শাইবা, সম্পাদনা: কামাল য়ুসুফ আল হুত, (রিয়াদ: মাকতাবা আল রুশদ, ১৪০৯ হি.)

১২. সহিহ ইবনু হিব্বান, আবু হাতিম মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান, (বৈরুত: মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হি.)

১৩. আল তিব আল নাবাভি, আবু নুআইম আহমদ ইব্ন আবদিল্লাহ ইসফাহানি, (বৈরুত: দারু ইব্ন হাযম, ২০০৬ খ্রি.)

১৪. মুসনাদ, আবু বকর আহমদ ইব্ন আমর আল বায্যায, (মদিনা মুনাওয়ারাহ: মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, প্রথম সংস্করণ, ২০০৯খ্রি.)

১৫. আল মুসতাদরাক আলা আস সহিহাইন, হাকিম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ নিসাপুরি, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১১ হি.)

১৬. মুসান্নাফ, আবদুর রায্যাক আবু বকর ইব্ন হুমাম ইব্ন নাফে আল হিময়ারি আল সানআনি, সম্পাদনা, হাবিবুর রহমান আল আজমি, (ভারত: আল মাজলিসুল ইলমি, দ্বিতীয় সংস্করণ)

১৭. শরহুস সুন্নাহ, আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইব্ন মাসউদ আল ফার্‌রা আল বগভি, স্পাদনা: শুআইবুল আরনাউত, (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.)

১৮. আল ফিতান, নাইম ইব্ন হাম্মাদ, সম্পাদনা: সামির আমিন আল যুহাইরি, (কায়রো: মাকতাবাহ আল তাওহিদ, ১৪১২ হি.)

১৯. মুসনাদ আশ শিহাব, কাযি আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন সালামা আল কুযা'য়ি, (বৈরুত: মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, ১৯৮৬/১৪০৭, দ্বিতীয় সংস্করণ)

২০. আল আকিদাতুত তাহাভিয়্যাহ, আবু জা'ফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামা আল তাহাভি, (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামি, টীকা: নাসিরুদ্দিন আলবানি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৪ হি.)

২১. জামি'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবি বকর আল কুরতুবি, (সউদি আরব: দারু ইবনিল জাউযি, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হি.)

২২. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, আবুল ফিদা ইসমাইল ইব্ন উমার ইব্ন কাসির, (কায়রো: দারুল ফিকর, ১৪০৭ হি./ ১৯৮৬ খ্রি.)

২৩. তাফসিরুল কুরআনিল কারিম, আবুল ফিদা ইসমাইল ইব্ন উমার ইব্ন কাসির, (রিয়াদ:দারু তাইয়িবা, দ্বিতীয় সং্করণ, ১৪২০ হি.)
২৪. আল বায়ান ফি তাভিলিল কুরআন, আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্ন জারির আল তাবারি, (বৈরুতঃ মুয়াসসাসাহ আল রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.)
২৫. আল জামি' লি আহকামিল কুরআন, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবি বকর আল কুরতুবি, (কায়রোঃ দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি.)
২৬. আকামুল কুরআন, আহমদ ইব্ন আলি আল রাযি আল জাসসাস, (বৈরুতঃ দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবি, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৫ হি.)
২৭. বাহরুল উলুম, ফকিহ আবুল লাইস নাসার ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহিম সামারকন্দি,
২৮. আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন, জালালুদ্দিন আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর আল সুয়ূতি, (মিসরঃ আল হাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ আল আম্মাহ, ১৩৯৪ হি.)
২৯. আল তাফসিরাতুল আহমদিয়্যাহ, মোল্লা জিয়ুন, শাইখ আহমদ ইব্ন আবি সাঈদ, (ভারত:মাকতাবাহ আল শিরকাহ, ১৯০৪ খ্রি.)
৩০. ফতহুল বারি, আহমদ ইব্ন আলি ইব্ন হাজার আসকালানি, (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৯ হি.)
৩১. আল দুরার আল কামিনাহ, আহমদ ইব্ন আলি ইব্ন মুহাম্মদ, ইব্ন হাজার আসকালানি, (হায়দারাবাদঃ মজলিসু দায়িরাতুল মা'আরিফ আল উসমানিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯২ হি.)
৩২. আল মিনহাজ শারহু সহিহ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দিন য়াহয়া ইব্ন শরফ আল নবভি, (বৈরুতঃ দারু ইহয়া আল তুরাসিল আরবি, ১৩৯২ হি.)
৩৩. শারহু সহিহ আল বুখারি লি-ইব্ন বাত্তাল, আবুল হাসান আলি ইব্ন খালাফ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন বাত্তাল, তাহকিক: আবু তামিম য়াসির ইব্ন ইবরাহিম, (রিয়াদঃ মাকতাবাহ আল রুশদ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.)
৩৪. ইব্ন কুতাইবা, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল মাজিদ, তাভিলু মুখতালাফিল হাদিস, (বৈরুত:আল মাকতাবুল ইসলামি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৯)

৩৫. আল তামহিদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাআনি ওয়াল আসানিদ, আবু উমার য়ুসুফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল বার, সম্পাদনা: মুস্তাফা ইব্ন আহমদ আলাভি, ও মুহাম্মদ আবদুল কাবির, (মরক্কো: ওয়াযারাতু উমুমিল আওকাফ ওয়াশ শুউন আল ইসলামিয়্যাহ, ১৩৮৭ হি.)

৩৬. নুযহাতুল ফুদালা তাহযিবু সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, শামসুদ্দিন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল যাহাবি, (জিদ্দা:দারুল আন্দালুস আল খাজারা, তা/বি.)

৩৭. আল ইসতি'আব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, আবু য়ূসুফ উমার ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল বার, (বৈরুত: দারুল জাইল, ১৯৯২ খ্রি.)

৩৮. আল সিরাতুন নাবাভিয়্যাহ ওয়া আল তারিখুল ইসলামি, আবদুশ শাফি মুহাম্মদ আবদুল লতিফ, (কায়রো: দারুস সালাম, ১৪২৮ হি.)

৩৯. শরহু আল মুঈদ ফি আদাবিল মুফিদ ওয়াল মুসতাফিদ, আবদুল বাসিত আল দিমাশকি,

৪০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,   শামসুদ্দিন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল যাহাবি, (কায়রো: দারুল হাদিস, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৭ হি.)

৪১. উসদুল গাবা, ইয্যুদ্দিন, আবুল হাসান আলি ইবন আবিল কারাম ইবনুল আসির, (বৈরুত: দারুল ফিক্র, ১৪০৯ হি./ ১৯৮৯ খ্রি.)

৪২. তারিখু বাগদাদ, খতিব বাগদাদি, আবু বকর আহমদ ইব্ন আলি, (বৈরুত: দারুল গারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৪১২)

৪৩. আল মুয়াফাকাত, ইবরাহিম ইব্ন মুসা ইব্ন মুহাম্মদ আল শাতিবি, সম্পাদনা: আবু উবাইদা মাশহুর, (কায়রো: দারু ইব্ন আফ্ফান, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.)

৪৪. মাকারিমুল আখলাক, আবুল কাসিম সোলাইমান ইব্ন আহমদ ইব্ন আইয়ুব আল তাবরানি, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৯ হি.)

৪৫. বাহজাতুল মাজালিস, ইব্ন আবদিল বার, আবু য়ুসুফ উমার ইব্ন আবদুল্লাহ, http://www.alwaraq.net

৪৬. দারউদ দু'ফ আন হাদিসি মান আশিকা ওয়া কাতামা ওয়া আফ্ফা, আহমদ ইব্ন সিদ্দিক আল গুমারি, (কায়রো: দারুল মুসতাফা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২)

৪৭. আল মুগনি, মুয়াফ্ফাকুদ্দিন আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ ইব্ন কুদামা আল মাকদিসি, (কায়রো: মাকতাবাহ আল কাহিরা, ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খ্রি.)
৪৮. মাজমু'উল ফাতাওয়া, ইব্ন তাইমিয়া, তাকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ ইব্ন আবদুল হালিম, সম্পাদনা: আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ, (মদিনা মুনাওয়ারা: মাজমাউল মালিক ফাহদ, ১৪১৬ হি./ ১৯৯৫ খ্রি.)
৪৯. বাদায়ি'উস সানায়ি' ফি তারতিবিশ শারায়ি', আলাউদ্দিন আবু বকর ইব্ন মাসউদ, আল কাসানি, (কায়রো: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.)
৫০. আল মাসালিহ আল মুরসালাহ, মুহাম্মদ আমিন ইব্ন মুহাম্মদ আল মুখতার আল শানকিতি, (মদিনা মুনাওয়ারা: জামিয়া ইসলামিয়া, ১৪১০ হি.)
৫১. মাজমুয়াতুর রাসায়িল ওয়াল মাসায়িল, ইব্ন তাইমিয়া, (কায়রো: লাজনাতুত তুরাসিল আরবি ,তা/বি)
৫২. আল-ফত্ওয়ালা আল-হিন্দিয়া মোল্লা নিযাম উদ্দীন আল বালাখি, (বৈরুত: দারুল ফিক্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১০ হি.)
৫৩. আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা আল কুয়েতিয়্যাহ, ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়া, (কুয়েত: দারুস সালাসিল, ১৪২৯ খ্রি.)
৫৪. আল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ, আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ)
৫৫. জামিউ বায়বনিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি, আবু য়ুসুফ উমার ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদিল বার (সউদি আরব: দারু ইব্ন আল জাওযি, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৪ হি.)
৫৬. আল ইনায়া শরহুল হিদায়া, আবু আবদিল্লাহ আকমালুদ্দিন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল বাবরতি, দারুল ফিকর, (বৈরুত: তা/বি)
৫৭. আল সিরাতুন নাবাভিয়্যাহ, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, (বৈরুত: দারুল ফিকর, প্রথম সং, ১৩৯৮ হি.)
৫৮. আল রাহিকুল মাখতুম, সফিউর রহমান মুবারকপুরী, (বৈরুত: দারুল হেলাল, প্রথম সংস্করণ, তা/বি.)
৫৯. আল দাওলাতুল উমাভিয়্যাহ, আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৯ হি.)

৬০. মলফুজাতে মুহাদ্দিস কাস্মিরি, মাওলানা সাইয়িদ আহমদ রেজা বিজনুরি, (দেওবন্দঃ বায়তুল হিকমাহ, ১৪০৯ হি.)

৬১. ইসলামি আইন ও আইন বিজ্ঞান, সম্পাদনা পরিষদ, (ঢাকাঃ ই.ফা.বা, ২০১১ খ্রি.)

৬২. For exampole, the US Socil Security department speci ficaly defines an adult child as being over 18.

৬৩. Shorter Oxford english Dictonary 397(6th ed. 2007) which'first definition is " A fetus, an infant,...